লখীন্দর দিগার

গুণময় মান্না

অগ্রণী বুক ক্লাব

প্রকাশক

প্রফুল্ল রায়

অগ্রণী বুক ক্লাব

১১ শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা ৬

মুদ্রাকর :

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ম্যাগনেট প্রেস

৩৫ দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদ শিল্পী

শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

কভার ব্লক মুদ্রণ

ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও

৭২।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম মুদ্রণ : ১৩৫৭

মূল্য চার টাকা আট আনা

শ্রীসুধেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

তেরশো পঞ্চান্ন সালের সতেরোই অগ্রহায়ণ সকাল বেলা।

লাঙলের ফলার মুখে মাটি ফেড়ে উঠছে। একটা লম্বা লাইন, তার দু'পাশে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে এড়ানো মাটির ঢেলা। শুকনো বা সবুজ ঘাস, কাটা-ফসলের বুঁচি চাপা পড়ছে সেই মাটিতে। সেগুলো পচে সার হয়ে উঠবে।

'হেট-ট-টা-ট-ট হট—হেই···'

শিরা-ওটা লম্ব হাত দুটো লাঙলের বোঁটাখানাকে চেপে ধরেছে, শক্ত করে। ওই হাতের মধ্যেই আর একটা কাঠিও ধরা আছে। গোরুগুলোকে শাসন করতে হবে, পথ-নির্দেশ করতে হবে। শুধু তাই নয়, মাটিও অবাধ্য। কোথাও পেছলে যাবে ফলা, কোথাও বা বেশি পোঁতা হয়ে আটকে যাবে। তাই, আগে পিছনে টেনে, বামে ডাইনে হেলিয়ে, বা ওপরে-নিচে চাপ কমিয়ে-বাড়িয়ে সতর্ক থাকতে হয়। ভুরু কুঁকচে ওঠে।

'ও রাম, তোর শীত কাটল ?'

সারি দিয়ে চারজন কৃষক লাঙল করছে।

মাথায় ময়লা চাদর জড়ানো। সামনের দু'জনের গায়ে গামছা, তৃতীয় জন কোঁচার খুট জড়িয়েছে, আর চতুর্থ জন একটা ছেড়া পাতলা কাঁথা।

'আর অখিল মামা, ই যে শীত পড়েছে, ই কাটবেনি। কাল রেতে আবার জর এসছিল গো—'

'কুইলান খেইছ ?'

যে-উত্তর প্রায়ই শুনতে হয়, তাই রাম বললে। অনেকবার অনেক কিছু করা হয়েছে, কিছুই হয়নি।

শীতের সকালটা বিষণ্ন মনে হয়। কুয়াশা অনেকটা কেটে গিয়েছে, কিন্তু আবহাওয়া পরিষ্কার নয় মোটেই। পুবদিকে লাল-বর্ণ সূর্যের রোদ এই কুয়াশা কেটে এসে মাঠে পড়ছে ছড়িয়ে। এখনো সে আলোর বিবর্ণতা কাটেনি।

দু'টি মানুষের ধোঁয়াটে ছায়া এসে পড়ে ওদের সামনে। তাড়াতাড়ি করে হেটে এগোচ্ছেন জমির পাশের উচু আল দিয়ে ঝাঁকরার ফণীবাবু, আর শ্যামচন্দ্রবাবু। ওঁরা বাঁকায় গিয়ে বাস ধরবেন ঘাটাল যাবার।

'ফণী খুড়া দৈরী করে ফেললেন যে গো। এতখন ত কুনকাল ক্যাচকা-ফুরের মাঠ পেরি যান গো।'

ফণী খুড়ো তাকালেন। হাসলেন একটু।

'বলি, তমার শাউড়ী কি ছাড়েনি নাকি। ভর রাতটাই ধরে রেখে দিলে ?'

এবার ফণীবাবু হাসলেন ভালো করে। এ পরিহাসে যোগ দিতে হবেই। গ্রামের প্রত্যেকের সংগে প্রত্যেকের সম্বন্ধ। সে ভাব এড়ানো যায় কী করে।

'না রে বাবু। তোমার খুড়ীই ছাড়েনি রে বাবু। নাও গো বিড়ি নাও।'

তারপর আর দেরী সয় না। রাস্তার ওপরেই বিড়িটা রেখে ফণীখুড়ো চলে যান। হাতে-বোনা মাফলারটা টান করে জড়িয়ে নেন মাথার চার দিকে। তাঁর সংগীটিকে বলেন, 'বোধ হয় বেলা হয়ে গেল।'

'না, বাস্ তো আটটায়। সাড়ে আটটারটা পেলেও চলবে।'

এই তাড়াতাড়ি করার কারণ আছে। ঘাটালের ফৌজদারী কোর্টে কাজ ওঁদের। অন্তত সোমবারটা ঠিক সময়ে পৌছনো চাই।

এদিকে বিড়িটা পড়েই থাকে রাস্তার ওপর। আরো কিছুক্ষণ ওখানে পড়ে থাকবে। একদম কাজ করার পর বিশ্রাম নেবার সময় বিড়িটা খাবে ওরা। যখন খুশি যেমন তেমন করে লাঙল বন্ধ করতে পারে না ওরা। বড় জোর একটু আগেই ওরা দম নেবার জন্যে থামতে পারে, এই যা।

ফণীবাবু আর শ্যামবাবুর কথা ভাবছে ওরা। প্রত্যেক সোমবারে ওঁরা ঘাটালে যাবেন ফিরে আসবেন শনিবারে বিকেলে। বেশ আছেন ওঁরা। টাকা কড়িতো মন্দ রোজগার হয় না, তার ওপর গাঁয়ে খাতির কত ওদের। এ-অঞ্চলের মামলা মোকদ্দমা তো কম নয়। প্রত্যেক ব্যাপারে ওদের তোশামোদ করতে হবে। না করেও পারা যায় অবিশ্যি, কিন্তু মামলার তদ্বির করলে যতটা ফল পাওয়া যায় না-করলে তার আধা ফলও হয় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তো ফস্‌কে যায়।

'তা অখিল-মামা, আজকাল অদের আর খাতির নাই। উ কোর্টের লোকদিকে আর দেখতে পারেনি কেউ। ই শালা আজকাল আইন ফাইনের কুন্থ ঘাড়গদ্দান নাই। তার উব্‌রে আবার নোতন আইন হচ্ছে। আগে তবু আইনের সত্যি মিথ্যে ছিল।'

অপর দুজন কৃষকের নাম লখীন্দর আর পরাণ। লখীন্দরই এদের মধ্যে সব চেয়ে বড়। সবাই তাকে দাদা বলে ডাকে।

সে বললে, 'কুনকালে আর আদালতের সত্যমিথ্যা ছিল বাবু। সব কালেই সমান।'

এনিয়ে কথা আর এগোয় না। অন্তত, এই আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাবার মতো বিদ্যে নেই ওদের।

অখিল কিন্তু বলে, 'যাই বল তুমি লখীন্দদাদা, আমার কিন্তু উ কোটের কাজ ভাল লাগে। ভগমান ত কপালে দেয়নি, পড়াকপাল, লেখা পড়া বাবুগিরি আমাদের ভাগ্যে নাই। সেই শুভঙ্করী কষতম পাঠশালে তারপর লাঙলবাড়ি ধরেছি। আর ওই শ্যামচন্দ, উ আমার কাছে তেরিজ কচা দেখি' লিত। আর তার আজ লসিব দেখ—'

রাম তার কথা কেড়ে নিলে। 'আর ফণীবাবু কি বলে জান। সিদিন অর কাছে লাঙলের দাম আনতে গেলাম, তা উনি বললে, তরা বেশ সুখে আছু রাম। জিগাসলম তা কেমন করে হয়গো খুড়া। বলে, তরা খাটিস, তোদের মাগ ছেলে খাটে'। তার উবরে, ই খালে মাছ ধরলি, উ জলায় শাগ তুললি, কিনিস তরা ক-পয়সার জিনিস! আর আমাদের দেখ, একলা কাজের মানুষ, একগাছি ঘাসও কিন্তে হয়। কদিক সামলাই। আমার বড্ড রাগ হল বাবু, কিন্তুক কিছু বলতে পারলমনি।'

রাম তার এই রকমই এক অভিজ্ঞতার কথা বলে। 'সেদিন কেঁচকা-পুরের সিং-মশায়দের ওখেনে খাটতে গেছলম। ছোট-তরফের বাবু বলল কি জান? বলল, রাজা হবার থিকে পরাজা অনেক ভাল বাবু। থালে আর জমি সামলাবার ঠ্যালা পুয়াতে হবেনি।'

লখীন্দর এরপর কথা বলে। বাঁ দিকের গোরুটার ল্যাজটা মুড়ে দিল ও। এইবার বাঁক ফিরতে হবে।

'থালেই বল। কেউ সুখী নাই রে বাবু। আমার কথাটা যদি লাও ত বলি। তমাদের লখীন্দদাদার ত বয়স কম হলনি। ঘাটালে গেছি গো অনেকবার, মেদ্‌নিপুরটাও চক্কর দিয়ে এসেছি। এই সিদিনে একবার ঘাটাল গিছলম ভাইপোটাকে জামীন দিতে। তা সে রকমটি আর নাই। আগে মানুষ সুখী ছিল। এখন দুহাতে পয়সা লুটছে, কিন্তু আনন্দ নাই।'

'হ্যাঁ দাদা, ইটা আমিও লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এমনটা কেনে হল বল দিকিন। আমার কথাটাই ধরনা, আগে ক' পয়সাই বা পেতম—'

এ আলোচনা পুরাতন। এ ব্যাপারে সবার অভিজ্ঞতাই সমান।

লখীন্দর বলে, 'তবু ব্যাপারটা দেখ একবার। সবাই ভাবছে তার কপালটাই মন্দ, অন্য লোকে ভাল আছে।'

'কেনে এমনটা হল বল দিকিন!' রাম আবার বলে।

'হবেনি কেনে। আজকাল জাত-ব্যবসা করে কেউ। শালা বামুন বলে রইল তমার পূজা আচ্চা, শহরে যেয়ে জুতার দকান ফাঁদল। চাষা বলছে ল্যাঙলের বাঁটা ধরবনি আর। আমার কথাটা ধর থাহলে। তুমি ভাবছ রামের কাজটা ভাল, রাম ভাবছে অখিলের কাজটাই ভাল।'

রাম বললে, 'তাহলে সতীশবাবু যে বলত সব কাজই ভাল, সেটা তমারগে বলতে চাও থালে সত্যি?'

অখিল কথাটার প্রতিবাদ করে। 'উ কথাটা আমি মানতে পারবনি। তমারগে বলতে চাও, উকীল মুক্তার আর চাষীমানুষ সব এক দরের লোক। থালে পণ্ডিতে মুখ্যুতে তফাৎ নাই?'

লখীন্দর বললে, 'তা তুমি যাই বল অখিল, ই কথা আমার মনে লেয়।'

রাম উৎসাহিত হয়ে ওঠে। 'আমারও উ কথা খুব ভাল লাগে। কাজ ভগমানের ছিষ্টি, থালে ইটা বড় উটা ছোট হবে কি করে। তমাদের পাঁচজনের আশীব্বাদে দুপাচটা ধম্মকথাত শুনেছি। তুমিই বল, রামচন্দ চণ্ডালকে মিতা বলেনি?'

'তাইত। সি চণ্ডালটি যদি তার কাজটি না করত, থালে রামচন্দের কাজ চলত কি করে। আজ তুমি চাষী তমার হাল বন্দ কর দিকিন, কালকে দেশের উকীল মুক্তাররা দেখি কি খায়।' লখীন্দর বললে, আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে।

রাম বললে, 'সতীশবাবু থালে ঠিকই বলে বল।'

অখিল বললে, হ্যাঁ রাম, সতীশবাবুর খবর কি জান। অনেকদিন তেনাকে দেখিনি। সেই কবে বের্ষেকালে দেখেছিলম তেনাকে।'

'হ্যাঁ, উনি একজন ছেলার মত ছেলা। লেখাপড়া শিখেছে' বটে, দেমাকটি নাই।'

'তা উ এখন এখেনে নাই। কেউ বলে কলকেতায় গেছে চাকরী করতে, কেউ বলে, না, এখেনেই কথাও আছে। লুকি' আছে। চাষাদিকে উনি বলে, তমরা একটু জাগ। নিজেদের জিনিস বুঝে লাও। তমরা যদি না পাল্লে ত তমরা মল্লে। মেরে ফেলবে তমাদের।'—রাম বলে।

অখিল বললে, 'তা তমরা যাই বল বাবু, অর কথা আমাকে ভাল লাগেনি। আমাদিকে উ মাতি' দিতে চায়। ঢের দেখেছি, বাবা, কাজের সময় কেউ কথাও নাই। লাভের দায়ে আমরাই মরব।'

লখীন্দর বলে, 'তা মন্দ বলনি তুমি। ই কথাত অনেকদিন থিকেই শুনে এলম। আর ব্যাপারটা ত দেখছ। চাষীরা ত লড়ে দেখেনি এমন লয়, গুলি গলাও চলেছে, মানুষ মরেওছে। কিন্তু আজ ই গেল ত সে এল। আবার সি একদিন গেল ত' আর একজন, ইশালা এই রকমই চল্‌ছে। তবে, তুমি যে বললে, অখিল, অরা আমাদিকে মাতি দেয়। আর লিজেরা পালি যায়, তা ঠিক লয়। পিথিবীতে অনেক রকম মানুষ আছে ভাই, ঠগও পাবে সাচ্চাও পাবে। তা ভাই ভাল বাবুও আমি দেখেচি।'

'সে কথা লয় তুমি ঠিক বললে। কিন্তু কে সাঁচ্চা আর কে মন্দ তা তুমি বুঝ কি করে। হুঁ-হুঁ—'

'সি-কথা ঠিক। সিটে ঠিক।'

এদের মধ্যে পরাণ এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি! ও কেবল হু-হাঁ করেছে। হেসেছে নয়তো মৃদু মৃদু। ও সূর্যের দিকে তাকিয়ে বেলা দেখে বললে, এব্‌রে দম লাওগো—'

রোদ্দুর স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে। কাছে দূরে ঘাসের ওপর যে শিশির ছিলো, তার চিহ্ন নেই। ওদের শীত কেটে গেছে কখন। গরম-বোধ হচ্ছে শরীরে। হাতের পায়ের মাংস টনটন করে উঠছে, টান হয়ে পড়েছে। একটু জিরিয়ে তামাক টেনে ঠিক করে নিতে হবে।

পরাণ আগে গিয়ে উঁচু আলটায় রাস্তার ধারে বসে। কলকেতে তামাক সেজে বলে, 'কইগো লখীন্দদাদা, লাও।'

গোরুগুলো জোয়াল-কাঁধে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। যেমনটি দাঁড় করিয়ে রেখেছে ওদের। জাবর কাটছে আস্তে আস্তে।

দূরে কেঁচকাপুরের গ্রাম পেরিয়ে একসার মেয়ে-পুরুষ আসছে। মাথায় ওদের মাছের ঝাঁকা, মাছ বিক্রী করতে যাচ্ছে। ঝাঁকা মাথায় করে মেছুনীদের পথ চলবার একরকম অদ্ভুত ভংগী আছে। দুলে দুলে গমকে গমকে এগোবে ওরা। সুগঠিত তাগা-পরা হাত দুটো আগে পিছে দুলিয়ে তাল রাখবে চলার। মাথার ওপর ঝাঁকাটাকে ধরার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই, এমনিই অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।

গ্রাম শেষ হয়েছে যে তাল-দিঘীটার কাছে, সেখানে বাঁক ফিরলো ওরা। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলে লখীন্দর।

'বেলা অনেক হল গো। মেছো-মাগিরা মাচ বিক্রী করতে লিয়াচ্ছে।'

'তাই দেখি।'

হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটে। রামের বাঁয়া-গোরুটা মাটিতে মাথা নামিয়ে শিং ঘসছিলো। জোয়াল থেকে কোনো-রকম ঘাড়টা খুলে যায় ওর। আর তারপর লাঙল থেকে সরে গিয়ে একটু ইতস্তত করে; প্রথমটা কী করবে ভেবে পায় না। তারপর সোজা দৌড় দেয়। একটু দূরে গিয়ে কয়েক পাক লাফিয়ে, ল্যাজটা ওপরে তুলে, শিঙ নামিয়ে।

রাম উঠে পড়ে ছোটে। হেই-হা অঅ-হাঅঅ...'

মাথাটা খোলা পেতেই গোরুটা দৌড় দিয়েছিলো, কিন্তু ওটা যে অতদূর অমন করে ছুটতে থাকবে সেদিকে খেয়াল ছিল না। মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে চলেছে। 'শালাকে মেরে জল খাব আজ। যা-যা, ...গোভাগাড়ে যা, এ মুখো না হতে হয়।'

লখীন্দরদা সচকিত হয়ে ওঠে। 'শালা রামকে আজ ভুগাবে। পরাণ, যানারে একবার—'

পরাণ ওঠে। রামের মতো অতো জোরে নয়, তবু ছুটতে থাকে ও। গোরুটা সোজা পুব দিকে ছুটছে। রাম দক্ষিণ দিক দিয়ে, আর পরাণ উত্তর দিক দিয়ে ছুটলো।

ইতিমধ্যে মেছুনীর দলটা কাছে এসে পড়েছে। শ্রীবাস বললে দল থেকে হেঁকে, 'লখীন্দখুড়া, তামুক একটুন রেখো গো। একটু পেরি' দিয়ে এসি, কেঁচকাপুরের জলাটা পার করে দিই বাবু।'

শ্রীবাস তার স্ত্রীকে মাছ বিক্রী করতে পাঠাচ্ছে। ঝাঁকাটা বয়ে দিয়ে গেল অনেকটা। কথামতো কেঁচকাপুরের মাঠটাও পেরোল না শ্রীবাস, একটু এগিয়ে ফিরে এলো। তামাকের আকর্ষণটা টেনে নিয়ে এলো ওকে। ওর সংগে আরও একজন ফিরে এলো। সে হচ্ছে সুবাসি। ডাকসাইটে মেছুনী এ-অঞ্চলের। এখন বুড়ো হয়ে গেছে, তাই রোজ যেতে পারে না। ওর মেয়েকে পাঠায়।

'সিবাস, এস বাবু। তামুক লাও।'

'লখীন্দখুড়া, আর শরীরটা বয়নি বাবু।' শ্রীবাস বসে পড়ে তামাক টানে। চাঙ্গা করে নেয় শরীরটা। তারপর আরামের নিশ্বাস ছাড়ে, 'আঃ বাঁচালে বাবু।'

'কথা মাছ চালান দিলেরে বাবু। চন্দখানায়, লয়? তা দেশে-ঘরে কিছু বিচ্‌লে ত মাছের মুখ দেখি আমরা?

'তাহলে হক কথা বলি, খুড়া—' ধোঁয়া ছেড়ে শ্রীবাস বললে, 'গাঁয়ে পয়সা পাইনি বাবু, পষায়নি, বুঝতেই পারছ—'
'তা ঠিক, তা ঠিক।' লখীন্দর ঘাড় নাড়ে, চিন্তিতভাবে।
'হ্যাঁ খুড়া, তুমি কি ই কথা শুনেছ—' শ্রীবাস কলকেটা ফিরিয়ে দিয়ে বলে, 'গোবিন্দর মায়ের খবর শুনেছ ?'
'নারে বাবু, কী হইছে বল দিকিন্। ঝাঁকরার উদিকে অনেকদিন যাইনি বাবু। ওরা ঘন হয়ে আসে, গোবিন্দ নামটা ওদের ভয়, আশা আর শ্রদ্ধা এক সংগে উদ্রেক করে। 'গোবিন্দর খপর পাওয়া গেল কিছু ? অর মা নাকি পাগলের মত হইছে ?' 'না রে বাবু এতদিন সব ঠিক ছিল। তা আজ সকালে গোবিন্দর মা এল আমাদের ঘরে। বললে, মাছ দাও সিবাস চার পয়সার। বেত্ত আমি আর পালন করবনি। যে ছেলার মায়ের এত অপমান হয়, সে ছেলার মংগলের জন্যে আর আমি বেত্ত করবনি। তা মাছ লিয়ে গেল। লখীন্দ খুড়া কি ইসব শুন নাই কিছু ?
'না, কি হইছিল বল দিকিন ?'
'চন্দখানা থিকে পুলিস এসছিল ভোরবেলা। গোবিন্দর মাকে বলে, দে তোর ছেলাকে বার করে। কথা রেখেছু বল। আমরা খবর পেইছি রেতের বেলায় তোর ছেলা ঘরে এইছে। গোবিন্দর মা যত বলে, আমি কিছুই জানিনি, ততই অরা জুলুম করে। না, তুই জান্ধু বল। অকে ভয় দেখায়। শেষকালে রেগে গিয়ে বলে, ওগো বাবু দারগা, তমরা ছেলাকে আমার কি খুজবে ? আমি যে তার মা রইলাম আমার বেথাটা বুঝ দেকিন একবার। ভগমান যেন তাই করে, তমরা তাকে খুঁজে পাও। না হয় তার মরা মুখটাও একবার দেখাও মোরে। বাছাকে একবার দেখি। কতদিন দেখিনি বল দিকিন। বাছা, এবছর কথা চলে গেছে। দাও তমরা একবার এনে। তা

খুড়া, ই কান্নাকাটি কি পুলিসে শুনে! অরা বড় আশা করে এসেছিল বাবু। বললে, তুই মাগি ছল করছু। ঘর-দোর তন্ন তন্ন করল অরা তারপর গোবিন্দর মাকে ঘাড় ধরে বাইরে বার করে দিল পর্যন্ত।'

ওরা কেউ কথা বলে না। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে থাকে।

শ্রীবাস আবার বলে, 'ই তমাকে আমি বলে রাখলাম খুড়া। ই'টা কিন্তু ভাল হলনি গোবিন্দর মাকে অমন করে অফমানটা করা ভাল হলনি। হাজার হোক মেয়া মানুষ। চাদ্দিকে কি সব শুনতে পাই, মানুষের আর মাথার ঠিক নাই। কখন কী যে হবে বলা যায়নি গো। এই তমাদের শীরসের কথাই ধর না, গোবর্ধনের সেই জমিটা লিয়ে কী হল? ই ছাড়া আবার আসনপুরের কথাও শুনা যায় আজকাল। তাই বলছিলম, দিনকাল বড় ভাল লয়।'

লক্ষীন্দর এবারেও কিছুক্ষণ কোন কথা বলে না। তারপর শুরু করে আস্তে আস্তে, কিছু কিছু কানে আসে, সবই আসে। তেমন কিছু করে উঠতে পারিনি, জানত কাচ্চা বাচ্চা লিয়ে ঘর করি। কিন্তু ইটাও জানিগো, বাকি থাকবেনি কেউ, সবাইকেই টানবে।' অখিল কিছু বলে না। জমিতে ও নেমে যায়। পরান গোরুটাকে ধরেছে। ঠেঙিয়ে গোরুটার কিছু বাকি রাখেনি রাম। রাগে ও তখনও ফুলছে। তাই ওরাও কিছু কথা বলে না, বলতে পারে না। চুপচাপ যে যার কাজ করে চলে। গোরুগুলোকে আবার লাঙলে জুড়ে দেয়।

আজ তাহলে আসি, লক্ষীন্দখুড়া।'

'এস, বাবু।'

অনেক্ষণ পর্যন্ত লাঙলের কোঁচ কাঁচ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। দূরে বনের ওপর দিয়ে চিলগুলো চক্রাকারে ঘুরছে। মাঠে মেয়েরা শাক তুলছে কোথাও, কোথাও বা গোবর কুড়োচ্ছে, ঘুটে তৈরীর জন্যে।

একসময় রাম কাঁদতে আরম্ভ করে। হাতের লাঙলটা এদিক ওদিক বাঁকে। ঠিক রাখা যায় না।

'গোরুটাকে মেরে শেষ করে দিছি, বাবু। কিছু নাই আর।' ওর রোগা পাঁজর দুটো ওঠানামা করে। কান্নায় গলা বন্দ হয়ে যায়। 'খেতে দিতে পারিনি। তাই বোধায় উ পেটের জ্বালায় ছুটেছিল।' কান্নার বেগটা কোন রকমে দমন করে আবার বলে, 'থালেই বল। এতদিন কাজ করে দিল আমার। আজ অকে দুটা খেতে দিতে পারলমনি। উল্টে অকেই মারলম। ওহো-হো-ও—'

বুক-ফাটা কান্নামেশানো দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে আসে সজোরে।

দুই

মতি, গোবিন্দের মা, স্নান করে শিব-মন্দিরে পূজো দিতে এল। বিধবা-মানুষ, তাই সাদা-থান-কাপড় পরা। আধময়লা, ধোয়া কাপড়। মাথার রুক্ষ চুলগুলো ভিজে—পরিষ্কার বোঝা যায়। দুপয়সার লাল চিনি, আর পূজরী বামুনের এক পয়সা দক্ষিণা নিয়ে এসেছে।

মন্দিরে ঢুকবার পথে মালতী আটকাল তাকে।

'মতিপিসি, এমন সময় মাড়য় (মন্দিরে) পূজা দিতে এলে গা।'

'হা মা একটু চানজল লুব।'

মালতী সতর্ক হয়ে মতির সংগে কথা বলতে শুরু করছিলো। আজ সকালেই ও খবরটা শুনেছে। মতির হয়রানি পীড়া দিয়েছে ওকে।

'একটু দেরী করে মাড়য় যাবে, পিসি।'

'কেনে গা, কেনে এমন কথা বলছু তুই।' পরিষ্কার বোঝা যায় মানসিক যন্ত্রণা আর নৈরাশ্যে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মতি। স্নান করার পর মুখখানা কালো হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো লাল।

'মাড়য় হরি মণ্ডলকে দেখলম, পিসি। তার ভাগনিও রইচে।'

একমুহূর্ত থমকে দাঁড়াল মতি। তারপর বললে, 'ঠাকুরের শীতল লিযাচ্ছি মা, এখন রাগ ঘেন্না করতে নাই।'

মালতী অবাক হয়ে তাকায়। 'তবে যে মা শুনলম'—তারপর সংকোচ কাটিয়ে বলে, 'পিসি, তুমি নাকি আর বার করবেনি শিবের? মাছ কিনতে গেছলে খাবে বলে?'

ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে মতি। কাঁধের ওপরকার থান কাপড়টা বিস্রস্ত হয়ে পড়ে অনেকখানি। পঞ্চান্ন বৎসরের বার্ধক্য। পাঁজরটা পরিষ্কার দেখা যায়, গুনা যায় প্রত্যেকটি হাড়। সবেগে সেই হাড় কখানা ওঠা-নামা করে ভারী নিঃশ্বাসের সংগে।

মালতী মতির চেহারা আর অবস্থা দেখে অবাক হয়। এতটা সে আশংকা করেনি।

'আমার কপাল, মা, পড়া কপাল—'কোনো রকমে কথাগুলো উচ্চারণ করে মুখ ফিরিয়ে নেয় মতি। তারপর হাঁটতে শুরু করে।

অদম্য ঔৎসুক্যে অস্থির হয়ে ওঠে মালতী। সব কিছু জানবার জন্যে বুকের ভেতরটা কেমন কেমন করে। অথচ এখন আটকানো যায় না মতিকে। তাই বলে, 'আমি ই বড়-গাছটার তলায় রইলম, পিসি, তুমি ফিরে এলে আমাকে বলবে।'

মন্দিরে ঢুকে পূজার সামগ্রী নামিয়ে রেখে হাত জোড় করে বসে মতি। বসে বসে পূজো দেখে।

ভেতরে প্রচণ্ড উদ্বেগ থাকলে যা হয়, মালতীর সমস্ত চাঞ্চল্য প্রশান্ত হয়ে আসে। যেন একটি একাগ্র আকাঙ্খা সমস্ত চোখ মুখ ছাপিয়ে ঠাকুরের পদ-প্রান্ত পর্যন্ত পৌছায়। এক সময় এই প্রশান্তি বাঁধ ভাঙে। মতি মন্দিরের মেঝের উপর পড়ে চোখ দুটো ঠাকুরের দিকে তুলে ধরে। সমস্ত শরীরটা আবেগে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

'হে বাবা শীলানন্দ, আমাকে বাবা লও তুমি। ই পাপীকে আর কেনে রেখেছ তুমি। গোবিন্দকে ভালয় রেখ বাবা, তাকে আর আমি দেখতে চাইনি। তাকে তমার ছিচরণে থান দাও।' কোন কথাই পরিষ্কার উচ্ছারণ হয় না, জড়িয়ে জড়িয়ে কেটে কেটে মতি বলে। চরম আত্ম-সমর্পণ যেমন করে হয়, নিজেকে আর পারি-পার্শ্বিককে ভুলে যায় মালতী। মন্দিরে আর সব যাত্রীদের সম্বন্ধে

কোন চেতনাই ওর নেই। ওর সম্বন্ধে তারা কী বলাবলি করছিলো, তাও শুন্‌তে পেলো না মতি।

'ছি ছি, মাগীর আবার সঙ দেখ বেটার জন্তে দরদ একবারে উত্‌লি উঠ্‌ছে। উসব লোক দেখানি চঙ—' হরি মণ্ডল বল্‌লে ভাগনীকে উদ্দেশ করে।

আরোগ্য কামনায় মন্দিরের একটা দিকে ওরা বসেছিলো। ওরাও পূজো দিতে এসেছে। আজ পাচ-বছর হল ওর ভাগ্‌নী অম্লশূলে ভুগছে। তারা অস্থির হয়ে ওঠে।

'মামা, ই যাত্রা আমি আর বাঁচলমনি—'

এক সময় মেঝে থেকে উঠে পূজরী ঠাকুরের কাছে স্নান জল বিল্বপত্র নেয় মতি। আজকে ওর ঠাকুরের ব্রত শেষ হল। এক মাস নিয়ম করে রয়েছে মতি, ছেলের কল্যাণ কামনা করে। ছেলেকে একটিবার দেখবার আকাঙ্খা ওর দিন রাত্রির স্বপ্ন হয়ে আছে।

সেই ছেলের উপর অসহ্য রাগে ক্ষেপে গিয়েছিলো মতি। বলেছিলো, মাছ খেয়ে তার ব্রত ভঙ্গ করবে। যে ছেলের জন্তে মাকে এত অপমান সহ্য করতে হয়, তার জন্তে আবার ব্রত!

মালতী, মতির সংগে ওর প্রায় বাড়ি পর্যন্ত এলো। ওর বাডি এপাড়ায় নয়, তবু কী এক সম্পর্কে মতিকে পিসি বলে ডাকে। মতিদের বাড়ি প্রায়ই আসত! কিছুদিন নানা কারণে মালতী আসতে পারেনি। গোবিন্দর সংগে ওর জানাশোনা নাই বল্লেই চলে। কবে মাত্র ও দুএকটা কথা বলেছে।

'দেখ পিসি, আমার মনে লিচে গোবিন্দার (গোবিন্দদার) ই কাজ ভাল হচ্ছেনি। তুমি মা এমন করে কষ্ট পাচ্চ, তমার অফমানের শেষ নাই, আর তিনি কি করছে সেই জানে। বলি মাকে ত আগে দেখতে হয়, তারপর অন্ত কাজ।'

অনেকক্ষণ চুপ চাপ এক সংগে হাঁটবার পর এক সময় মালতী আস্তে আস্তে বলে। সরু সরু আলপথ দিয়ে হেঁটে চলেছে ওরা। রোদ্দুর ওদের চারপাশে মাঠের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে। শীতটা কিন্তু বেশি বলে এ-রোদে ওদের শরীর গরম হচ্ছে না। মালতী পেছনে ছিল। মতির ক্লান্ত পা, আর ঝুঁকে পড়া চেহারা দেখে ওর বুকের ভেতরটা কেমন মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে ওঠে। মালতী নিজে চিরদুঃখিনী মেয়ে। কিন্তু মতির এই কষ্ট সওয়া যায় না।

মালতী আরও কি বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু মতি ওকে বললে, 'উ কথা আমিও আগে ভাবতম—' অসাধারণ শান্ত হয়ে এসেছে ওর কণ্ঠস্বর, ধীরে ধীরে একটি একটি করে উচ্চারণ করে মতি, 'দেখ মা, আমার নিজের দুঃখের কথা ভাবতম আমি। কিন্তু ভেবে দেখ মা। আর গোবিন্দ, সে কি সুখটা পেলে? অমন সনার চাঁদ ছেলে আমার, এই বয়সে না পেলে ইস্তিরি—' হঠাৎ মতির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, 'ভালই করেছে গোবিন্দ। ই বউকে খুন করে ভালই করেছে। গোবিন্দর মত ছেলেকে তোর মনে লাগলনি। ছিঃ ছিঃ, একটু পরে বললে, 'কিন্তু বৌকে আমি গাল দিইনে মা। যেমন জন্ম তেমন তার ফল হবে ত'। কিন্তু লোকে সে কথা বুঝ্‌লনি। সবাই গোবিন্দকে খুনে বলবে ই আমি সহ্য করতে পারবনি, পারবনি—'

কেঁদে ফেলল মতি। ওর গতি মন্থর হয়ে আসে। আধখোলা পিঠটা পর্যন্ত কান্নার কাঁপুনি দেখা যায়।

'না মা, উ কথা বলে নি! গোবিন্দাকে কেউ ত নিন্দা করেনি। সবাই ত সুখ্যাত করে। গোবিন্দা যে খারাপ করছে সে কথা কেউ বলবেনি, কিন্তু বাবু ভাল কাজ করবি ত, মাকে ত দেখবি। তা না করে ভাল কাজ করলি ত কি হল—'

মতি প্রতিবাদ করে। 'উ কথা আমার মনে লেগ্রনি মা। আমার সুখটাই

আমি দেখছিলম এতদিন, কিন্তু তার সুখটার কথা ত মনে করিনি। বাছা যে আমার ঘর দুয়ার ছেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার নিচ্চয় কুচ্ছু ব্যাপার আছে, মা। আমরা মুখ্যু মানুষ কি বুঝব।

মালতী কথাটা চিন্তা করছিলো। বল্লে, 'সে কথা তুমি ঠিক বলেছ, পিসি। নিজের কথা চিন্তা করলেই দুঃখু বাড়ে। আমার দুঃখু, আমার কষ্ট—এই করলে দুঃখু আরও বাড়ে বটে।'

'তবে, জান মা—' এমনিতেই মতির গলা অত্যন্ত কাহিল হয়ে এসেছিলো। তার ওপর ও আরো আস্তে আস্তে বলতে শুরু করায় পেছন থেকে মালতী শুনতে পাচ্ছিলো না। ও মতির পাশে এগিয়ে এল।

'সতীশকে জান, মা। তমাদের পাড়ার মণ্ডলদের সতীশ। সে আমার বাছার মতই লুকি' আছে। ত সে দুদিন এসেছিল আমার কাছে রাত্রে। বললে, গোবিন্দর সংগে আমার একবার দেখা করি দাও। ত উ বলে, সে হবেনি। অরা কি কষ্টে আছে। কতদিন খেতে পায়, কতদিন পায়নি, রাত্রে গাছ তলায় বনের মধ্যে কাটিছে অনেক দিন—ত সে কি দুঃখে আছে।' তারপর কথা আটকে যায়, যে কথাটা অনবরতই অনুভব করছে মানুষ, সে কথাটা বলে কী করে।

কথায় কথায় মতির বাড়ি পর্যন্ত চলে এসেছে মালতী। মতি বলে, 'আয়, দেখে যা স্বচক্ষে দেখে যা, সিপাই কি করেছে দেখে যা—'

এ প্রলোভন ছাড়া যায় না। মতি না ডাকলেও মালতী নিজেই দেখে যেত। ভিতরে ঢুকে কিন্তু ক্ষুণ্ণ হল মালতী। এমন বিশেষ কিছু করেছে বলে তো ওর মনে হয় না। দুটি মাত্র মাটির কুঁড়ে। একটা ঘরে হাঁড়ি-কুড়ি বাসনপত্র, আর একটা ঘরে ওদের মা-ছেলের শোবার জায়গা। বড় একটা পুরানো আমলের তক্তাপোশ, ঘরটার অর্ধেকের বেশি ঘিরেছে সেইটেই। এই তক্তাপোশেই গোবিন্দ থাকত।

তুটো ঘরেই ওরা খোঁজ করেছে। বাসন-কোসন বাক্সপত্র নেড়েছে মাত্র। এ-ঘরে বিছানাপত্র টেনেটুনে দেখেছে, ভাঙ্গা টিনের তোরঙ্গটা থেকে কাপড় গুলো বের করে দেখেছে এই যা। কেবলমাত্র একটা জিনিস নষ্ট করেছে ওরা, গোবিন্দের মাথায় দেওয়া বালিশটাকে ছিঁড়ে ভেতরটা দেখেছে।
এক এক করে সব দেখালো মতি। সব বললে। মালতী কিন্তু আশ্চর্য হল ওর সব পরিবর্তন দেখে। কিছুক্ষণ আগে কী না শান্ত ছিল মতি, কিন্তু এখন যেন ক্রোধে ও লাল হয়ে উঠেছে।
'আমার ই অনেক কষ্টে গড়া সংসার। তরা সবাই মিলে তা নষ্ট করবি কেনে? আমার ছেলেটা ত' ওই জন্নেই গেল, তোদের পাঁচ জনের জন্নেই ত সে পাগল হল। তা দেখ, আমার কাপড়-চুপুড়ে হাত দিবে কেন অরা। আমার এ্যাতে অপমান হয়নি? আমার ঘরকে কেনে এস্‌বে অরা? তুই মা দেখুনি, তুহাতে করে দারগা আমার গোবিন্দর বালিশটা ছিঁড়ে ফেল্‌লে। বাছাকে কাছে পেলে অরা কি রাখ্‌ত, মেরে ফেলত। তা আমি তখন আর মানুষ নাই, আমার তখন কি ইচ্ছা হচ্ছিল জান মা, অদের ঝাঁটা মারি, ছাই দি অদের মুয়ে, অদের কদাল দিয়ে কাটি, বঁটি দিয়ে কাটি—'
তুটি হাত শক্ত হয়ে ওঠে, বঁটি দিয়ে কাটবার মত ভংগি করে মতি সমস্ত শরীরটা ওর কাঠ হয়ে গেছে। থর থর করে কাঁপ্‌ছে ও। কী যেন বলতে চায়, চোখ তুটো ঘুরচে।
ভয় পেয়ে গেল মালতী। তবু সাহস করে ওর হাত ধরে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে অবাক হল মালতী।
'ই কি পিসি, জরে যে গা ভাজা-খলা হইছে গো—'
বিছানার ওপর জোর করে শুইয়ে দিলো মতিকে।
তারপর একটানা তুঘণ্টা ধরে মাথায় জলঢালা জলখাওয়ানো পাখা করা ইত্যাদির পর জর একটু কমে।

২

'না মা, ই তুমি ঠিক করছনি মা। আমি যেতে পারলেই ভাল।'

'সে কি পিসি, উকথা বোবোনি। উকথা বলতে নাই। আমি এখন চললম, জানত মাষ্টর-বৌকে দেখতে হয়, তার একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে এসব আবার। রাত্রে থাকতে হয় না কি দেখ্ব।'

মালতী এক রকম স্বাধীন মেয়ে। ওর ভাত-কাপড় ও নিজেই রোজগার করে। কারও সংগে কোনদিন জড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু মাষ্টার-বউকে আশ্চর্য রকমে ভালবেসে ফেলেছে ও, তার ভালবাসাও চায় মালতী।

'তমার মাথার কাছে জল রইল পিসি তেষ্টা পেলে খেও।'

মতির বাড়ি থেকে মালতী যখন বেরোল তখন সূর্যের আলো নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। শোয়ানো ধানঢাকা মাঠ, কলাইশুটির বনে ফড়িং লাফাচ্ছে। অসহ্য ক্ষিদেয় ওর পেটে মোচড় দিল একটা। মালতী তাড়াতাড়ি পা চালালো।

তিন

মতি শিব মন্দির থেকে চলে গেল, সাবিত্রীর দিকে একবার ফিরেও তাকাল না, একটা মানুষ যে চোখের সামনে জলজ্যান্ত বসে রয়েছে সেদিকে খেয়ালও নাই—এইটেই সবচেয়ে লাগল সাবিত্রীর। নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করল সাবিত্রী।

মতির এই অবজ্ঞা ওকে পুরনো কথা স্মরণ করিয়ে দেয়: একদিন ওই মেয়েকেই এসে সাবিত্রীর হাতে পায়ে ধরতে হয়েছিলো। সে গোবিন্দর বিয়ের সময়। 'গরীবকে মেয়ে দিলে মা চিরদিন মনে রাখব। এই তোমাদের দয়া মা'—তা সেদিনের কথা কী ওর মনে নেই? অমন নির্লজ্জ হয় কী করে ওরা?

আর তাছাড়া দোষটা কার বেশি? সাবিত্রীর চিন্তাধারা এগোয়, স্বীকার করলুম আমার বোন একটা ন্যায় অন্যায় করে ফেলেছে, তা তোমার ছেলে যে তাকে খুন করে ফেললে সেটা বুঝি দোষ হলনি? পিতিজ্ঞে করে ফেললে, মুখ দেখবেনি আমাদের। তা আজকে সে দেমাক রইল কোথা?

মতি প্রতিজ্ঞা রাখতে পারেনি, তাই নিজের কাছেই গেল সে ছোট হয়ে। এইটেও কিন্তু সান্ত্বনা হতে পারে না সাবিত্রীর কাছে। কেন জানি না, সাবিত্রীর কেবলই মনে হতে লাগল, ওকে আজ মতি আপমান করল। আর এ অপমানের ধরনটা নেহাৎই নতুন।

এক সময় সাবিত্রী মুখ খোলে, 'মামা এ অপমান অসহ্য।'

সাবিত্রীর কপালে আর কানের পাশটিতে গালের ওপর ভু-একগাছি চুল এসে পড়েছে। এত শীতেও ঘাম-ঘাম মনে হয়। ডান হাতটা হাঁটুর ওপর রাখা ছিলো, আঙুলগুলো যেন কাঁপে। হরি বলে, 'সবই দেখলম মা, কিন্তু কি আর বলব বল। ই শালা এদের বাড় বেড়েই চলেছে। কতদিন আমি বাবাজীকে বললম তা বাবাজী শুনলনি। আগুন ত আছে মা, চিরকাল বেঁচে থাকতে কেউ আসেনি। আগুনে পুড়বেনি এমন কেউ নাই। তা বাবাজী শুনলনি। আমাদের কটা কথাই বা উনি শুনে মা, বলে, অত মাথা গরম করলে কাজ চলেনি। তা আমি আর কী করব বল। তুমি যদি পারত একবার নিজেই বোলো মা।

এত সব কথা বলার প্রয়োজন ছিল না, সাবিত্রী এমনিতেই ক্রুদ্ধ হয়ে আছে। অদ্ভুত ভাবে ঠোঁট বাঁকিয়ে বললে সে—সে ঠোঁট বাঁকানিতে বোঝা যায় না ঠিক বিদ্রূপ না হতাশা মেশানো আছে—'হ্যাঃ, আমার দিকে উনি আবার ফিরে তাকান। মরে যাচ্ছি, মামা, মরে যাচ্ছি —আজকাল আবার কথা বলেননি। হ্যাঁ আমাকেই সব করতে হয়, আমিই ওর বিহিত করব—'

স্বামীর অনাদরে সাবিত্রী মরিয়া হয়ে গেছে। অসুস্থ বলে একটুতেই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে সাবিত্রী। ক্রমাগত ভুগে ভুগে ওর দেহ মনের জোর এতটুকু নেই।

'ওর চুল ছিঁড়ে, সর্বনাশীর বুকে লাথি মারতে পারলে,······আমি মারবই—'

মেঝে থেকে খানিকটা উঠতে গিয়েই মাথা ঘুরে পড়ে যায় সাবিত্রী। চার দিক যেন অন্ধকার হয়ে আসে। ডান হাতটা বার দুই মুষ্টিবদ্ধ হয়, আবার খোলে, শেষে বদ্ধ হয়েই থাকে।

হরি সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। চীৎকার করে ওঠে জল জল বলে।

সাবিত্রীর শেষের কথাগুলো জোর এবং তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিলো। স্বাস্থ্য নেই বলে ওর কণ্ঠস্বর এমনিই কর্কশ হয়ে উঠেছে, তার ওপর ক্রোধে তা আরও বিকৃত! স্বভাবতই মন্দিরে অন্যান্য লোকেরা আকৃষ্ট হয়। পূজরী ঠাকুরও ছুটে আসেন। একটা ছোটখাট গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। যা সাধারণত হয়ে থাকে, কেউ জল আনে, কেউ বাতাস দেয়। অত্যধিক তাড়াতাড়িতে বাধাও পায় এরা। তবু কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য ফিরে আসে।
সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। সাবিত্রী বড়মানুষ বলে তার এই রকম শারীরিক বিপর্যয়ে প্রত্যেকেই যেন বেদনা পায়। জিজ্ঞাসাবাদ চলে, 'হ্যাগা, কী জন্যে এমন হইছিল?' প্রথম থেকেই চেঁচাচ্ছিল ওরা, 'কেনে এমন হল গা?' আর, সঠিক করে কেউ কিছু বলতে পারল না বলে, কারুরই জিজ্ঞাসার শেষ হয় না, কাজেই গোলমাল বাড়তেই থাকে। 'আহা, মায়ের আমার শরীলে কিছু নাই—'
'এত বেলা পর্যন্ত উপাস দিচ্ছেরে বাবু, এমনটি হবেনি?'
পূজরী ঠাকুর ওদের বাইরে বের করে দেন। 'বলি, বাবু তোমাদের ত জ্ঞানগম্যি আছে। কে কোথা মাঠে-ঘাটে বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে যখন খুশি যেমন তেমন পায়ে মন্দিরে ঢুকলেই হল? যাও যাও সব, মন্দির পবিত্র জায়গা—যাও, যাও—'
এতক্ষণ পর হরি কথা বলে, পূজরী ঠাকুরের সংগে ওদের ধমকায়, 'বেরো বলছি এখেন থেকে, বেরো সব—'
সাবিত্রীর মূর্চ্ছা দেখে হরি কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলো। এই সব মূর্চ্ছা যাওয়া, কান্না-কাটি ও সইতে পারে না। কোথাও হরিবোল দিয়ে মড়া শ্মশানে নিয়ে গেলে ঘরে থেকেই ওর বুকের ভেতরটা কেমন করে। ঠিক বমি হবার আগে যেমনটি হয়, মনে হয় যেন সব কিছু গলা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে।

আর সেই সময় বকাবকি, তক্কা-তক্কি করলে যদি বা ওর সে ঝোঁকটা কাটে। তাই ও চেঁচায়, 'ছোটলোকের বাচ্চারা, যা সব বেরিয়ে যা—'
ক্রমে ক্রমে ওর চোখের পিটপিটুনি ভাবটা কমে আসে। মুখের ওপর হাসি হাসি সতেজ ভাবটা ফিরে আসে ওর।
'দেখলেন ত দাদা-ঠাকুর, আজকাল ছোটলোক বেটাগুলার কি রকম আস্পদ্দা হইচে, ঠাকুর-দেবতা ছোট বড় ওরা মানে কিছু—'
পূজরী ঠাকুর তখনও বলছিলেন, 'মন্দিরে পবিত্র হয়ে ঢুকতে হয়। যাও সব এখান থেকে তোমরা—' বলে শেষ লোকটিকে পর্যন্ত বের করে দিয়ে এলেন, অন্য সময় এসো এখন, সন্ধ্যার সময় শীতল দেবো তখন এসো—'
পরে হরির কাছে এসে বললে, 'মন্দিরে গালাগাল দিতে নাই, বুঝলে ভাই।' পরে সাবিত্রীর কাছে এসে বসে বলে, তুমি একটু বস মা, আমি চট করে যাই পূজোটা সেরে দিই। ঠাকুরের কাছে রাগ ঘেন্না করেছিলে মা, তাই এমনটি হল মা—'
নিজের ওপর খোঁচাটা কোনোরকমে সহ্য করেছিল হরি, কিন্তু এখন সুযোগ পেয়ে বলে, 'একটু ভেবেচিন্তে কথা বলবেন ঠাকুর, কাকে কী বলছেন মনে রাখবেন—'
'সব আমি রেখেছি, মণ্ডলের পো। আপনারা সম্মানীয় লোক, সেটা সত্যি। কিন্তু ঠাকুর ত সবার উপরে, তাকে ত মান্যি করা চাই-'
সাবিত্রী এক রকম করে তাকায়, একবার পূজরী ঠাকুরের দিকে, আর একবার হরি মণ্ডলের দিকে। হরি আর কিছু বলে না, পূজো করতে যায়।
অনেকক্ষণ কেউ কিছু আর বলে না।
সাবিত্রীর চেহারাটা ছোট্ট একটা মেয়ের মতো দেখাচ্ছে। শীতের

বাতাস এসে ওর লাল-পেড়ে পাটের শাড়ীটাকে একটু নাড়াচাড়া করে, ঠিক যেখানটা ঘাড়ের কাছে, পিছনে ফেলা চুলের ওপর বেড় দিয়েছে ও। ডান হাতটাকে শক্ত মসৃণ মেঝের ওপর রেখেছে সাবিত্রী, সমস্ত শরীরের ভারটা যেন এই রোগা কাঠির মতো হাতটার ওপরেই রয়েছে। একটু পেছনেই ওর দেয়াল, কিন্তু সরে গিয়ে যে একটু ঠেশ দেবে, তার সামর্থ্য নেই। কেবল সামনে মেঝের ওপর একটা কালো মতো দাগের ওপর আলতো করে তাকিয়ে থাকে ও।

হরি মণ্ডল গুম হয়ে যায়। নেহাত ভাগ্নীকে কিছু বলতে পারে না তাই। যে গোরু দুধ দেয় তার দুটো লাথিও সহ্য করতে হয়, একথা জানে হরি। তাছাড়া, হরির নিজের যে অনেকগুলি দুর্বলতা আছে তার জন্যে এই ভাগনীটি ছাড়া চলে না।

হরি কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না; এক একবার ওর মনে হচ্ছিলো, মন্দির ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু এই অবস্থায় সাবিত্রীকে ছেড়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না, অন্তত, সাবিত্রী কী ভাববে সেই ভয়ে ও চুপচাপ থাকে। কিন্তু ওকে রেহাই দেয় নবীন। ও মন্দিরে ঢুকে বলে, 'কী গো খুড়ো কি হইছে শুনলম। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলম, তা—'সাবিত্রীকে কী নামে ডাকবে ও ভেবে পায় না। অনেকদিন থেকেই সাবিত্রীর সংগে দেখা করবার ইচ্ছে ছিলো নবীনের, ওর অনুগ্রহ পাবার ইচ্ছেয়। আজকে হঠাৎ পেয়ে ও হতবুদ্ধির মতো হয়ে পড়ে—'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলম, তা, এই গোলমালের কথা শুনলম। দিদিঠাকরুণের কী হইছে বল দিকিন খুড়া। গোবিন্দ মিত্তিরের মা নাকি কী বলেছে শুনলম, সবাই সে কথা বলছে, তাই ছুটে এলম বাবু, মাগির আস্পদ্দা ত কম লয় ?

আসলে এখানে আসারই ইচ্ছে ছিলো নবীনের। কিন্তু কি ছলে যে দেখা করবে তা ভেবেই পায়নি, হঠাৎ এই রকম একটা কারণ খুজে পাওয়াতে ওর ভালই হয়েছে। কিন্তু বানিয়ে বলতে হয়েছে, সে

চেতনা ওর সারা চোখে-মুখে। তাছাড়া গোবিন্দ মিস্তিরের মাকে মাগি' বলে সম্বোধন করায় কেমন লজ্জায় একটু কাঁচুমাচু হয়ে পড়ে। ওর বয়েস কম বলে এসব ব্যাপারে ও অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি এখনো।

তবু হার স্বীকার করার ছেলে নয় ও। ওর সমান বয়েসের ছোকরাদের কাছে গর্ব করে বেড়ায় 'জানুরে ভাই, আমি হরি মণ্ডলের সাকরেদ, আমাকে ঘাঁটাস নি।'

আর, নবীনের ওপর হরি মণ্ডলের অনুগ্রহ একটু আছেই। তাই, নবীনকে পেয়ে হরি একটু খুশিই হয়। অন্তত সাবিত্রীর সংগে কোন কথা না বলতে পারার যে অস্বস্তি, সেটুকুর হাত থেকে তো রেহাই পাওয়া যাবে। তাছাড়া, সাবিত্রীর সংগে আলাপ করিয়ে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো হরি। বাড়িতে তো সম্ভব নয়, কাজেই নবীন যে বুদ্ধি করে এখানে এসেছে ঠিক সময়, তাতে ওর বুদ্ধির তারিফ করে হরি। কিন্তু সাবিত্রী যে রকম মুস্‌ড়ে রয়েছে, তাতে যে সাবিত্রীর মুখ খোলাতে পারবে, সে সম্বন্ধে সংশয় কাটে না।

সমস্ত শুনে নবীন লাফিয়ে ওঠে, 'বল কি খুড়া; গোবিন্দর মাএর এই রকম দেমাক হইছে ? আমি থাকলে পিটিয়ে ঢিট করে দিতমনি।'

এরপর হরি মণ্ডল আর সাবিত্রীর দিকে তাকালো নবীন। কিন্তু ওরা কেউ কিছু বলল না দেখে, একটু দমে গেল ও। কিন্তু তবুও বললে 'এ কিরকম হল গো, খুড়ো ? দিদিঠাকরুণকে এরকম অপমানটা করলে, আর তুমি কিছু বললেনি ? পারলেনি মাগিকে মেরে থাল খিঁচে দিতে ?

'তুমি বোস দিকিন নবীন—'

আসলে নবীন যে তার দেওয়া বিবরণটা ভালো করে শোনেইনি, নিজের খেয়ালেই আছে তা বুঝ্‌তে পারে হরি। তাই বলে 'ঠিক তা নয়গো নবীন-খুড়ো। গোবিন্দর মা ত কোন কথা বলেনি, কিছুই

করেনি, তবু দেমাক দেখিয়ে গেছে। কিছু করার উপায়টি ছিলনি, তা না হলে এই শর্মা কি ছেড়ে কথা কইত'—সাবিত্রীর দিকে একবার তাকায় হরি, 'তাছাড়া মেয়েমানুষ বলে—'

'মেয়ে মানুষ-টানুস আবার কি।' জোর গলায় বলে নবীন, 'মেয়ে মানুষ কি কম শয়তান হয় মনে করেছ, খুড়ো ?'

মেয়ে মানুষ যে কম শয়তান হয় না, পুরুষের চেয়ে তাদের শয়তানিটা বেশিই, একথা হরিই শিখিয়েছে নবীনকে। তাই, হরি খুশি হবে এই ভেবে কথাটা বলল নবীন। এই প্রসঙ্গে কথাটার কোন দামই নেই, কারণ, মেয়ে মানুষের দোহাই দিয়ে হরি কথা বলেছিলো সাবিত্রীকে খুশি করতে। তখন যে সাবিত্রী মতির ওপর চটে গিয়েছিলো আর তা সত্ত্বেও মতিকে হরি কিছুই বলেনি,--সেই দোষ স্খালন করাই ওর ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু হরি সাবিত্রীকে খুশি করতে চায়, আর নবীনও চায়। কিন্তু হরিকেও খুশি করা ওর উদ্দেশ্য বলে, ওদের প্রত্যেকেরই কথা উল্টোপাল্টা হয়ে পড়ে। তাই চুপ করে থাকে হরি।

নবীনের অস্বস্তি বাড়ে। ও পরিষ্কার বুঝতে পারছে, ঠিক মতো কথা ও বলতে পারছে না। অথচ সাবিত্রীর কাছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতেই হবে, তাই কথা ও বলেই চলে। অন্তত দু একটা বেঠিক কথা বলার পর সেগুলো তো শুধরে নেওয়া চাই।

'আর গোবিন্দর মা যে অমন করবেই তা ত জানা কথা খুড়া—' এতক্ষণে নবীনের কণ্ঠস্বরের উত্তেজনা কমে আসে। 'যে মেয়ে খুনে-ছেলে পেটে ধরে, সে আবার মানুষ নাকি। তাছাড়া ছোটলোক নিয়ে ওদের কারবার। গোবিন্দের নাম কি ভদ্দলোকে করে কোথাও ? ডম-পড়ায় যাও, সেখানে পাবে, বাগ্দি পাড়ায় পাবে, আর অরা ত খুনে ডাকাতের দল, পাড়ায় মানুষ ঢুকলেই শাসায়—'

এ অভিজ্ঞতা নবীনের আছে। ওর ব্যবহারের জন্যে অনেকেই বলেছে ওর ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবে। কথার গতি ঠিক কোনদিকে চলেছে এখনো বুঝ্‌তে পারে না নবীন। ও যেন অন্ধকারে হাতড়েই চলেছে।

'রাস্তায় বেরিয়েই গোবিন্দর মাকে দেখলম, খুড়া। মালতীকেও দেখলম বাবু। গোবিন্দর মায়ের সংগে যাচ্ছে। যদি আগে থেকে ব্যাপারটা জানতম, ত তুকথা শুনিয়ে দিতম।' হরিকেই উল্লেখ করে বলা হয়েছে কথাটা। মালতীর কথা সাবিত্রীর কাছে ওঠে একথা হরি চায় না। একবার নিজেই অসতর্ক অবস্থায় মালতীর নাম করে ফেলে অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু নবীন যখন কথাটা বলেই ফেলেছে, তখন মোড়-ফেরাবার চেষ্টা করে হরি।

'তা হলেই বলো, নবীন-খুড়া। তখন গোবিন্দর মাকে দুটা কথা শুনানো বা অন্য কিছু করা কি ঠিক হত? মালতী মেয়েকে ত তুমি জান, চেঁচিয়ে লোক জড় করে ফেল্‌ত।'

নবীন বলে, 'হ্যাঁ, তাহলে সব করত, লোকগুলাকে আমি ভয় করি আর কি।'

তুমি ওদের চিনিনি খুড়া, তাই বলছ। বেটারা মুখে যাই বলুক, সব বেটা বদমাইস। এইত বাবু, তুমি কিছু আগে বললে ডোম-বাগ্দিদের কথা। মাঠে-ঘাটে এই সব লোকদের বিশ্বাস কোরোনি কখনও—'

'তাইলে তুমি বলতে চাও, রাস্তা-ঘাটে ওদের ভয় করে চল্‌তে হবে। ওই ছোট লোকদের বাড় বেড়েই চল্‌বে?'

'তা কি হয়। কিন্তু এই ঘটনাটার কথা কি বাবাজীর কানে উঠ্‌বেনি, বলতে চাও?' হরির ইচ্ছে, ওদের শাস্তিটাও নিজে নয়; এমন একজন নিক যার শক্তি আছে। তাই ও পরামর্শ দিয়েছিলো সাবিত্রীকে ওদের ঘর জ্বালিয়ে দিতে। কিন্তু নিজে যাতে না জড়িয়ে পড়ে, সে-দিকে ও খুব সতর্ক। 'আমরা তো নগণ্য মানুষ, নবীন, আমরা কি করব—'

কথাটার ইংগিত নবীন গ্রহণ করে, 'হ্যাঁ, দিদি-ঠাকুরণ, আপনারা ছাড়া এ ছোট লোকদের ঢিট কে করবে। আপনারা যখনই ডাকবেন, আমরা ছুটে যাব। কিন্তু আপনারা না থাকলে আমরা কি করব। আর, ওই ব্যাটারা আপনাদের আমাদের কি কম জ্বালাচ্ছে—ব্যাটারা যেন দেশশুদ্ধ গিলে খেতে চায়—'

হঠাৎ কি হল বোঝা যায় না; সাবিত্রী বলে ওঠে, 'চুপ কর তোমরা। ওসব কথা বোলোনি—ভয় করে আমার।'

কেমন যেন কাতর দেখায় ওকে।

যাকে কথা বলাবার জন্যে এত কাণ্ড, শেষকালে সেই এমন করবে ওরা আশংকা করেনি। সাবিত্রী যে এতক্ষণ ওদের কোন কথাই পছন্দ করেনি, তা এক মুহূর্তেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ওরা মুসড়ে পড়ে। একবার আস্তে আস্তে চোখ তুলে সাবিত্রীর দিকে তাকায়।

এখনও সেই কালো দাগটার দিকে তাকিয়ে আছে সাবিত্রী। ওর কী হয়েছে, কে জানে। মাঝে মাঝে ও এমনই চুপ করে থাকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত। মনে হয় যেন ওর প্রাণ নেই। ওর চোখ দুটো বড় বড় দেখায়, এক ফোঁটা রক্ত নেই ওর শরীরে। মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে ওঠে। মন্দিরে লোকজন নেই। সবাই চলে গেছে একে একে। শুধু ওরা তিন জন, আর ভিতরে পূজরী ঠাকুর। সাবিত্রীর দিকে তাকিয়ে ওদেরও যেন ভয় ভয় করে। মনে হয়, বুকের ভেতর আর কোন জোর নাই।

এই সময় পূজরী-ঠাকুর আসেন পূজা সেরে। স্নানজল, বিল্বপত্র ভোগের সন্দেশ সাবিত্রীর হাতে দেন।

'ভক্তি করে খেয়ো, মা-ঠাকরুণ, আরোগ্য ভগবানের হাতে। মনে আনন্দ রেখো মা, আনন্দের বড় জিনিস নাই। দুদিনের জন্যে এসেছি আমরা এই সংসারে ঘৃণা, ক্রোধ করতে নাই। মানুষের

রোগ হয় মা মনে, মন শুদ্ধ হলেই সব হবে। কোন রোগের বালাই থাকবে না।'

সাবিত্রী পূজারী ঠাকুরের পায়ের ধুলো নিলে।

'বাবা, আমি যে যজ্ঞির কথা বলেছিলম, সেটা মনে রয়েছে, বাবা ?'

'হ্যাঁ, মা, তা মনে আছে বই কি। আরোগ্য কামনা করে তুমি ঘৃতাহুতি দেবে মা, তা মনে নাই। যে দিন ডাকবে, সেই দিনেই যাব। ওগো মণ্ডলের পো, স্নানজল নাও, নাও গো নবীন। আমার কিছু দোষ নাওনি তো, মণ্ডলের পো ?'

সাবিত্রীকে অনেকটা প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। বল্লে, 'মামা ওনাকে তো তোমার একবার বলতে হয়। তারপর একদিন বাবাঠাকুরকে ডেকে নিলেই চলবে।' কথাটাকে লুফে নিলে হরি। সাবিত্রী অসন্তুষ্ট হয়েছে এ আশংকা ছিলো তার মনে; তাই এই কথায় সে-ভাবটা কাটে।

'নিশ্চয়ই, মা, তা বলব বই কি। আর বাবাজী আমার কথা কি ঠেলতে পারবে ? তুমি কোন ভাবনা কোরনি, আমি সব ঠিক করে দুব।'

মন্দির থেকে ওরা যখন বেরল, তখন বেশ খানিকটা বেলা হয়েছে। প্রায় দুপুরের কাছাকাছি। দূরে একদল সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষ বোঝা মাথায় বাঁশি বাজিয়ে গান গেয়ে সার বেঁধে চলেছে। সাবিত্রী সে দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। ওর সেই একটানা বিষণ্ণতা আর কাটছে না।

চার

লখীন্দররা গ্রামে ঢুকে অবাক হয়ে গেল। কেঁচকাপুরের মাঠে লাঙল করতে করতে ওরা শুনেছিলো, ঝাঁকরার গোবিন্দ মিত্রের বাড়িতে পুলিস তল্লাস করেছে। ঘটনাটা দুঃখের হলেও এমন কিছু নয়, কারণ প্রায়ই তো পুলিস আসে, কখনও রাত্রে, কখনও দিনের বেলায়। আর গোবিন্দ মিত্র তো বহুদিন হল আত্ম-গোপন করে আছে। কাজেই, মাঝে মাঝে পুলিস আসবেই, একথা সবাই জানে। কিন্তু এমনটা যে হবে সেটা ধারণার অতীত। সমস্ত আমধেড়ে আর শ্যাওড়া এই দুটো গ্রাম তল্লাস করেছে ওরা। প্রত্যেকটি বাড়ি, একটি কুটীরও বাদ দেয়নি। গ্রামকে গ্রাম তল্লাস করা বহুদিন ওরা দেখেনি, তাই হঠাৎ এই কড়াকড়ির কোনো হদিস পায় না ওরা। কেউ সঠিক খবর দিতে পারে না। কেউ বলে, লক্ষ্মণ সাঁতরাকে ধরবার জন্যে এসেছিল, কেউ বলে চারজন নতুন লোক কোথা থেকে এসে এখানে লুকিয়ে রয়েছে, তাদেরকে ধরবার জন্যে। কেউ বলে ভালো হয়েছে, কেউ বলে, এটা ভালো হচ্ছে না।

এ ছাড়া নানারকম অভিযোগ অনুযোগ আছে। পুলিস তল্লাসী সম্বন্ধে নানাজনের বিভিন্ন রকম মন্তব্য। এর মধ্যে দুঃখের-বেদনার কাহিনী রয়েছে, হাসবার মতো কাহিনীর অভাবও নাই। কিন্তু সব চেয়ে মর্ম-বিদারক একটি ঘটনা: রামের স্ত্রীর ওপর দুজন পুলিস পাশবিক অত্যাচার করেছে।

এর বাড়া অত্যাচার নাই। অন্ততো, মানুষকে একসংগে এতখানি

নত করে না আর কোনো অত্যাচারই। মানুষ এতদিন পর্যন্ত যে অন্তরের সম্পদ গড়ে তুলেছে, সেটাকে ফুটো বেলুনের মতো চুপসে দেওয়ার মতো ব্যাপার এটা।

বোবা-বেদনা শুধু গুমরে ওঠে, 'হ্যাঁ ?'

'তা নয় ? পুরুষ মানুষ কেউ ঘরে ছিল ? ইচ্ছামত ঘরে ঢুকে পড়ে, বাধা দিবার কেউ আছে ?'

'মেয়া-মানুষ, দুটা পুরুষ যদি ধরে ত কি করবে বল—'

'অরও দোষ আছে বৈ কি, উ মেয়ের ? নালে এত লোকের ঘরে পুলিস এল, তা সেখানে কি মেয়া-মানুষ ছিলনি ? উ মেয়া গোল করতে পারলনি ?'

'বাবা, বলুকি গো। অদের দেখেই ত আমার ছাতির জল নাই, তা রা-কাড়বি কি করে ?' ঘটনাটা চাপা পড়ে যায় তাড়াতাড়ি। অন্য প্রসংগ এসে পড়ে।

'বলি লোক খুঁজতে এসবি ত, ভাতের হাঁড়ি দেখবি কেনে ? হাঁড়ির মধ্যে কি লোক লুকি' আছে ?'

'মুখপড়ারা কি আর খুঁজে বেটে ? শুধু গঁপ পাকায় মিছে।'

'হাঁ গো, পিসি, ঠিক বলছ তুমি, অকে আবার খুঁজা বলে ? শুধু লাঠিএ করে ইদিক-উদিক লেড়ে দিলে।'

প্রায় সমস্ত খবর মেয়েদের মুখে শুনতে হয়। পুরুষেরা তো কেউ-ই ছিল না। যেমন ভয় পেয়েছিলো ওরা, তেমনি সেই ভয় সম্বন্ধে গর্বও করে। দিদি, আমি ত এক কলসী জল খাই, তারপর আমার ধাত এসে। মা গো, মা—'

পুরুষদের মধ্যেও কথা ওঠে কিছু কিছু। 'যদি বেরতম আমরা লাঠি লিয়ে, থালে শালাদের দেখি দিতম একবার।'

লখীন্দররা চারজনে এগোয়। একটি কথা বলে না ওরা। আগে

পরাণ, তারপর লখীন্দর, তার পেছনে অখিল, সব শেষে রাম। কেউ রামের দিকে একবার ফিরেও তাকাতে সাহস পায় না। এক সময় রাস্তার বাঁকে দল থেকে লখীন্দরকে ভাগ্‌তে হয়। বলে, "ভাই রাম, তমাকে কি আর বলব ভাই। ভগমান কিছু বলার রাখেনি। ত মাথা ঠাণ্ডা রাখবে, দাদা, সব সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখবে। উপরে ভগমান আছে।' একটু পরে বলে, 'গোরুগুলোকে একটুন আহার দি আগে, তারপর তমার ওখেনে যাব ভাই।'

পরাণও চলে যায়। যথাসাধ্য সান্ত্বনার কথা বলে যায় সে। অখিল কিন্তু লাঙল-বলদ সমেত স্যাওড়ায় ওর বাড়ি পর্যন্ত আসে।

এমনিতে কেউ কোথাও ছিল না। কিন্তু রাম পাড়ায় ঢুকবার সংগে সংগেই ওর বাড়ির দিকে লোক ছুটে আসে।

'রাম, কি আর বলব ভাই—'

'রামরে তোর কপাল ভেঙেছে রাম—'

সকলেই জোর গলায় নানারকম করে ওকে কথাটা শোনাতে চায়। রাম ওদের ভিড় ঠেলে ওর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। কাঁচের দেয়ালওয়ালা দু'খানা ঘর, খড় দিয়ে চাল ছাওয়া। গাছের ছোট ছোট ডাল পালা দিয়ে ঘরের চারদিকে বেড়া দেওয়া হয়েছে। তাই মাঝখানটায় উঠোনের মতো। রাম গিয়ে গরুগুলোকে খুঁটিতে বাঁধে, লাঙল-জোয়াল যথাস্থানে রাখে। এতক্ষণ কারো মুখের দিকে রাম তাকায়নি, কিন্তু এখন একবার তাকায়। মুখে বোধ হয় একটু হাসি আছে, হতবুদ্ধির হাসি। পান খাওয়া লাল সামনের দাঁত দুটো একটু বেরিয়ে পড়ে। তারপর ওদের উঠোনে গিয়ে বসে পড়ে, কিছু বলে না।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে উঠোনে, তারপর হাত-পা এলিয়ে শুয়ে পড়ে। কি হল, কি হল পাশাপাশি জড়ো হওয়া লোকগুলি ছুটে আসে!

'জর হইচে গো, জর হইছে। কাঁপছে দেখছনি—'

যে কৌতূহল নিয়ে লোকগুলি এসেছিলো, তার কিছুই হল না দেখে ওরা নিরাশ হয়। তার পর আস্তে আস্তে ওরা সরে যায়।

অসহ্য যন্ত্রণায় রাম ছটফট করে। মাথাটা যেন ওর ছিড়ে পড়বে। ওর যখন চেতনা হবার মত অবস্থা হল, তখন লখীন্দর ওর পাশে বসে আছে। ওর স্ত্রী জল এনে ওর মুখে দিলো একটু।

লখীন্দর বললে, 'আজ তুমি কষ্ট পেলে খুব, ভাই। এখন একটুন কিছু খাও। মাথা ঠাণ্ডা রাখবে ভাই। ঠাণ্ডা মাথা হল গে তমার বড়-দাদা-- -' বলে ও চলে গেল।

জরটা ছাড়তেই উঠে বসল রাম। গোরুগুলোকে খেতে দিলে। এই প্রথম খিদের খোঁচা পেল রাম, পেটটা ওর মোচড় দিল। বউ দক্ষবালা উঠোনটায় দাঁড়িয়ে আছে, মাথা আলগা, মুখটা খোলা। গোরুটা কেমন করে খাচ্ছে সেদিকে তাকিয়ে ছিল ও। 'ভাত রেঁধেছু?' ম্যালেরিয়া জরে ওরা ভাত বন্ধ করে না সাধারণত। খেটে খাওয়ায় সবই চলে। রামের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে বউটা। মনে হয়, কখনও যেন কোন কথা বলেনি ও। শোনেও নি। আজন্ম বোবা ও। তারপর আস্তে আস্তে গিয়ে ভাত এনে দেয়, জামবাটিতে করে।

রাম কোনদিকে তাকায় না, এক নিঃশ্বাসে শেষ করে। এত ক্ষিদে পেয়েছিলো ওর যে কোন কিছু চিন্তা করার অবসর ওর ছিল না। অবিশ্যি, কেমন একঘেয়ে তীব্র এই খিদে, খাবার সংগে পাঁচটা কথা-বার্তা, একটু যত্ন-আত্তি—সব মিলে যে আনন্দ দেয়, সেটা নেই। আঁচাবার পর কি করবে রাম ভেবে পেলো না। একটা কিছু কাজ করতে পারলে ওর একটু শান্তি হতো। কিন্তু কিছু নেই, এমন কি চিন্তাও নেই যেন। এতখানি শুষে নিয়েছে ওকে। জর থেকে উঠে ভাত খাওয়াতে শরীরটা অত্যন্ত নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

'দুটি ভাত দিবি, গা ? অ বউ, বড় বউ ?—'
রামের সৎমা পাশের বাড়ি থেকে আসে। প্রায় পংগু, অসুখে-বিসুখে কম বয়সেই চোখ কানের ক্ষমতা হারিয়েছে। চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা, ড্যাবা ড্যাবা ঘোলাটে চোখ থেকে বিচুটি কাটে। দু-মাস হবে আগে কাচা ত্যানা একটা কোমরে বেড়-দেওয়া। 'দুটি ভাত দে, দক্ষবউ—আমাদের রান্না হয়নি—'
ওর ছেলের আর বউয়ের দিন রাত ঝগড়া, কান্নাকাটি, বুড়িকে কোন দিন খেতে দেয়, কোনদিন দেয় না। বউ প্রায় সব সময়ই চেঁচিয়ে পাড়া মাতায়, কাঁদে, অভিসম্পাত করে।
দক্ষ-বউ দুটি ভাত এনে দেয়, 'নিজের বউকে মাগতে পারনি ? তা পরের খেতে তমার লজ্জা করেনি গা ?'
এমন কি রামের কানেও কথাটা ঠেকে। পারল ওকথা বলতে দক্ষবালা ? তার সৎমাকে অমন কথা বল্‌তে পার্‌ল ?—আর তাছাড়া আজই ওর এই অবস্থা হয়েছে ? পর মুহূর্তেই ওর মনে পড়ে আশ্চর্য খুতখুতে তার বউ, একটা কুটো এদিক-ওদিক হয় না।
মানুষ এতো ছোট হয় কেন ?
'নিজের বউ যদি মানুষ হত মা, থালে কি আমার ই অবস্থা ? কপাল মা, কপাল—'
আশ্চর্য লোভের সংগে চিবোচ্ছে ভাতগুলো—ক্ষুধা-মেটানোর আরাম এত বিশ্রী কেন ? ওপরের ঠোঁটটা সামনের দিকে ঝুকে পড়েছে। চোখগুলো পিটপিট করছে কেবলই।
রাম চুপ করে বসে থাকে। আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে আসে, মনে হয় ও যেন এখনি মরে যাবে। মস্তিষ্ক নিস্তেজ হয়ে এসেছে।
আস্তে আস্তে উঠে আসে। বউটা বাঁশের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে

আছে, চোখে মুখে ওর কিছুই নেই। ও কি আজন্ম বোবা? কিন্তু এই বিকেলেও তো সংমাকে অমন ঝাঁকরেছে। রাম চিন্তা করে না। কাছে গিয়ে বউকে চেপে ধরে। শক্ত-সমর্থ ডাগর-ডোগর বউ তার। পাক দিয়ে দিয়ে রামের হাত দুটা ওর শরীরে বসে।

মাঠে কাজ করতে গিয়েছিলো লখীন্দর। আজও কেঁচকাপুরেই গিয়েছিলো। সেদিন অখিলের জমিতে বদ্‌লা দেবার দিন ছিল, কিন্তু আজ অন্যজনের কাজ, তার জন্যে মজুরী আছে।

অতি সহজে গ্রহণ করেছে রাম তার স্ত্রীকে। এই জন্যে তৃপ্তি পাচ্ছে না পাড়ার অন্যান্য লোক।

'শালা বউটার গায়ে একটা হাতও তুলেনি, অন্যজন হলে খিঁচে ফেলত—' রোগা মতো একজন বললে। মুখে তার বসন্তের দাগ, পান-দোক্তার একটা পুরু স্তর তার দাঁতের ওপর

'কি করবে বল, বউটার কি দোষ, বউটার যদি দোষ নাই, থালে তাকে মেরে কি হবে—তবে মেয়েটা নষ্ট হয়ে গেল—' বেঁটে কাটখোট্টা ধরনের একজন লোক বললে, 'উসব নষ্ট-ফষ্ট আমি বুঝি না বাবু, আজকাল উসব নাই। একটা মাগকে বাদ দিয়ে আর একটা মাগ ঘরে আনবে, এমন বাপের বেটা আজকাল ক'জন আছে শালা, উজন্যে বিয়াই হয়নি কত জনের। ইছাড়া, কুন ঘরে মেয়াছেলের দুন্নাম নাই বল, কে বুকে হাত দিয়ে বলবো তার ভিটায় পাপ ঢুকেনি?'

লখীন্দর কথাটা শুনেছে। কথাটা সত্যি বলে মানে সে। পাপ ঢুকেছে প্রত্যেকটি ঘরে, কোনো ঘরটি বাদ নেই। মা-মাসি-বোন, স্ত্রী-কন্যা, কে কার কথা শোনে। কিন্তু পুরুষদের পাপের সীমা নাই। তারা মদ খায়, মিথ্যা কথা বলে, পর-স্ত্রী আর বার নারী না গেছে এমন

লোক হয় ত মিলবেই না। সমস্ত আমধেড়ে গ্রামটা, এটাতো শুধু মজুর-চাষীদের গ্রাম, এর পাশাপাশি গ্রামও তাই, বিশেষ করে দক্ষিণে। আড়াই হাজার তিন হাজার লোকের বাস, তা এরা কেমন যেন শুকিয়ে গেছে।

সেদিন রামের বাড়িতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল লখীন্দর। জ্বরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, আর পাড়ার লোকেরা তাই দেখ্‌ছে হাঁ-করে। ছেলে-ছোকরা নেই এমন নয়, কিন্তু যারা বয়স্ক মেয়ে-পুরুষ তারা একটুও জল পর্যন্ত এগিয়ে দেয়নি। আর, হয়তো, দরকার হতে পারে কোন কিছু করার, তাই, অত বড় একটা প্রলোভন ছেড়েও চলে এসেছে। মেয়ে-সংক্রান্ত এই ব্যাপার, গ্রামের লোকের কাছে এটা কত বড় প্রলোভন, সে তো লখীন্দর জানে। সে লোভ পর্যন্ত ওরা যখন ছেড়ে চলে যায়, কোন কিছু করার ভয়ে, তখন মানুষ কতখানি ছোট হয়েছে।

একান্ন বছর বয়েস হয়েছে লখীন্দরের। কোনদিন এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায়নি। নিজের আনন্দে দুঃখে এক রকম করে কাটিয়ে দিয়েছে। কখনও কারো অসুখে-বিসুখে আপদে-বিপদে, শ্মশানযাত্রার সময় ডাক পড়লে না বলেনি। বলেছে, পরস্পর দেখতে হবে বৈকি বিপদ-আপদে। কার দুঃখু-কষ্ট নাই বল?

কিন্তু গেল যুদ্ধের পর থেকে মানুষ যেন কেমন হয়ে গেছে। অভাব অনটন কোনকালে না ছিল, কিন্তু মানুষ আগের মত আর নাই। আজকাল মানুষের মাথার ঠিক নাই। মানুষের মনুষ্যত্ব নেই।

লখীন্দর ঠিক বুঝ্‌তে পারে না, কিন্তু ওর বুকের ভেতরটা কেমন টনটন করে। আগে এমনটি হত না। ও আজকাল আর মড়া-পোড়াতে যায় না, ডাক এলে বলে, শরীরটা ভাল নাই বাবু। নয়তো ওর বড় ছেলে সুধীরকে পাঠিয়ে দেয়। প্রথমটা ভীষণ আপত্তি করবে

সুধীর, চেঁচিয়ে দুপা আছড়ে সমস্ত বাড়িটাকে কাঁপিয়ে তুলবে, তারপর আস্তে আস্তে চলে যাবে। লখীন্দর অনেক সময় বলেছে, 'ওরে, যা যা, মিত্যু হল মাহাশান্তি; সেটা দেখে আয়। শ্মশান মাহা পবিত্ত জাগা—' কিন্তু আজকাল মরা-মানুষের মুখেও শান্তি দেখেনি, দাঁত-মুখ খিঁচিয়েই মরে আজকাল মানুষ। ও জানত মৃত্যুতে যন্ত্রণার 'নিবিত্তি' হয়, কিন্তু মৃত্যুতে যন্ত্রণার শেষ নাই। তাই বীভৎস দেখতে হয় মরা-মানুষের মুখ। ভয় পায় না ও, কিন্তু কেমন আশা-ভঙ্গের বেদনা অনুভব করে লখীন্দর। মানুষ তাহলে সে যা ভাবত তা নয়।

সন্ধ্যে বেলা কেরোসিনের ডিবে জ্বেলে ওপরে যায় লখীন্দর, সোজা তিনতলায়। এ অঞ্চলে তারই ঘর তিনতলা। সবার ওপরের তলাতেই যায়, গিয়ে রামায়ণখানা খুলে বসে।

ওপর থেকে ডাক দেয়, 'ওরে টুকি আয়, বই শুনবি আয়, অধীরকেও নিয়ে আয়রে—'

বড় ছেলে সুধীর কোথায় যেন বেরিয়েছিল। সে হাঁকাহাঁকি শুরু করে দিলে, 'ওরে টুকি, যা, পুঁথি শুনগে যা। পুণ্যি হবে। আধীরেটা আবার ঘুমি' পড়েছে। এই হতভাগা, ঘুমাচ্ছু কেনে, উঠ। সন্ধ্যে বেলা আবার ঘুমায়—'

ওই এক ছেলে, একদিনও ওকে পুঁথি শোনাতে পারেনি লখীন্দর। যেদিন জোর করে বসিয়েছে, সেদিন দু'লাইন শোনবার পরই ঘুমিয়ে পড়েছে ও। টুকি কিন্তু তৎক্ষণাৎ ছুটে আসে! বছর বারো বয়সের মেয়ে, কিন্তু কী আগ্রহ নিয়ে শুনবে ও পুঁথি। প্রত্যেকটি ঘটনা ওর মুখস্থ, আশ্চর্য ওর স্মৃতি-শক্তি। লখীন্দর অনেকবার ভেবেছে, মেয়েটাকে একটু লেখা-পড়া শেখাবে, কিন্তু, সুধীর হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, 'বিবি হবে মেয়ে, ভাল, ভাল।'

আর অধীরকে পাঠশালায় দেওয়া হয়েছে, গঙ্গা-মাষ্টারের পাঠশালায়। ভাই বোনে এসে বসে, দুদিকে দুজন। টুকি ডান-দিকে, আর অধীর একেবারে বাঁ-হাটুর ধারে। হাটুতে ওর বুক ঠেকেছে, মাটির ওপর রাখা লখীন্দরের বাঁ-হাতটা ধরে অধীর। লখীন্দর সুর করে করে পড়ছে, আর অধীর তাই দেখছে কেবলই। ও কেবল বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সুবিধের জন্য, এক সময় কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে অধীর। লখীন্দরের দাড়িটা ওঠা নামা করে, কখনও কখনও কোন একটা শব্দ বুঝতে না পেরে ঝুকে পড়ে, তখন লখীন্দরের বুকের চুল লাগে অধীরের মুখের ওপর।

রামের বনবাস পড়ছিল লখীন্দর। এই পালাটা সব চেয়ে বেশি ভালো লাগে লখীন্দরের। রামের কথা নয়, দশরথের কি দুঃখ, কি বেদনা। বৃদ্ধ শেষকালটায় একেবারে চুপ করে ছিলেন, মূর্চ্ছা ভাঙেনি তাঁর। আর, তাঁর নিজের লোভের জন্যই তো এই ঘটনা ঘটেছিলো, কাকেই বা দোষ দিতে পারতেন তিনি ?

হঠাৎ লখীন্দরের সুর ছাড়িয়ে পাড়া থেকে গান ভেসে আসে একটা। একটা চীৎকার।

লখীন্দর পড়া বন্ধ করে। টকীর গান গাইছে পাড়ার ছোকরারা ভালোবাসার লোক বুক ভেঙে দিয়েছে, তার জন্য কাঁদুনির অন্ত নাই, এ জীবন আর রাখা যায় কী করে। এ গান অনেকবার শুনেছে লখীন্দর। এই ধরনের আরো অনেক গান। ছেলেরা এই টকী দেখার জন্যে পাগল! কোনরকমে হাতে যদি পয়সা জুটল কয়েক আনার তো ওরা ছুটল চন্দ্রকোণায়। বিকেল বেলা পান চিবোতে চিবোতে; গেঞ্জি গায়ে কারো কারো হাফসার্ট পাঞ্জাবি, অধিকাংশের মুখেই বিড়ি, নয় সিগারেট। কী আনন্দ পায় ওরা, তার জন্যে এত হাল্কা হয়ে গেছে ওরা!

লখীন্দর দীর্ঘ নিঃনিশ্বাস ফেলে।

সেদিন সুবাসি মেছুনীও এই কথা বলেছিলো। 'লখীন্দ, তুমি বাবু ঠিক বলেছ, চন্দখানায় যদি মাছ ছালান না দি' ত গাঁয়ের লোকরা দুটা খেয়ে বাঁচে। কিন্তু বাবু পয়সা হয়নি। ই ছাড়া চাল হইচে মেছুনীদের। তারা টৌকী দেখবে, বাস তেল মাখবে চুলে—দু'টা গয়না পরবে। সেই মেছুনীর গল্প জানত, বাবা, এক ভদ্দলোক দু'আঙুলে দুটা আংটি পরে জিগাস ছিল, কত করে দাম গো, কত করে দাম? তা সেই মেছুনীর ছিল ছ-ভরি সনার অনন্ত, তা উ বললে কনুইটা ভদ্দলোকের নাকের কাছে লেড়ে লেড়ে, দশ আনা সের গো, দশ আনা সের। ত আমরা হলম সেই মেছুনী।' বলে সুবাসি হেসেছিল।

অধীরটা ঘুমিয়ে পড়েছে কোলে মাথা রেখে। লখীন্দর আস্তে নামিয়ে দিল। টুকিও ঢুলতে শুরু করেছিলো। বললে, 'লে ঘুমা।'

আলোটা নিবিয়ে দিয়ে বসে রইল লখীন্দর। ওর ঘরটা সব চেয়ে উঁচু বলে, প্রায় সমস্ত গ্রামটা দেখা যায়। এ বাড়ি তৈরী করেছে লখীন্দরের বাবা, তার সংগে খেটেছে লখীন্দর। দেয়াল দেওয়া থেকে ছাওয়া অবধি নিজেদের পরিশ্রম করা। মজুর লাগিয়েছিলো খুব কম। আর তেতলায় এখানে বসে থাকতে ভীষণ আনন্দ পায় লখীন্দর। এখানে বসে সমস্ত গ্রামটাকে দেখা যায়।

সমস্ত গ্রামটা ঘুমোচ্ছে। ভোরবেলা উঠবে সবাই ধড়মড় করে। অধিকাংশই এখানকার মজুর। ওরা সব চলে যাবে, দূর দূর গ্রামে মুনিষ খাটতে—ঝুড়ি কোদাল হাতে, কারো হাতে তাড়া লাঠি, লাঙল-বাড়ি, হেলে-বলদ তাড়িয়ে নিয়ে যাবে কেউ। সেই সন্ধ্যে হয়হয় ফিরে আসবে। মাঝখানে একবার ছুটি। তা এদের মধ্যে আনন্দটা কোথায়? তাহলে তারা 'টৌকী' দেখতে যাবে না কেন?

হঠাৎ লখীন্দরের মনে পড়ে ওর দুটি ঘুমন্ত ছেলে মেয়ের কথা! ওরাও যদি এমন হয়?
দেশলাই দিয়ে আলোটা আবার জ্বালাল লখীন্দর। অধীরের মুখখানা আশ্চর্য নরম, টুকির মুখখানা কেমন বিষণ্ন মনে হয়।
ধুলোয় সারা গা-হাত-পা ভরা। একটা ময়লা প্যাণ্ট পরে আছে অধীর আর টুকি পরেছে একটা ছোট শাড়ি। আশ্চর্য সবল ওদের মুখ। লখীন্দর অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। ও আশ্বস্ত হয়।
ওর মনে পড়ে দশরথের কথা। দশরথের মৃত্যু কষ্টের মধ্য দিয়ে হয়নি। তাঁর সমস্ত লোভের উপরে রামচন্দ্র ছিলেন, পিতৃসত্য পালনের জন্যে তিনি বনে গিয়েছিলেন। এমন সরল আর খাঁটি মানুষ কি আর হতে পারে? এমন সম্ভাবনা দেখতে পেলে মরেও আনন্দ। কোথায় সেই সত্য!
লখীন্দর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে।

পাঁচ

তারপরের দিন রাত্রে সুধীর আর লখীন্দর খেতে বসেছিলো। কথায় কথায় গ্রামের তল্লাসীর প্রসংগ ওঠে। সুধীর বিরক্ত হয় লখীন্দরের ওপর, 'উসব লিয়ে তুমি কেনে মাথা ঘামাচ্ছ। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়নো কেনে বাবু। কার কি হল গেল সে দিকে না দেখে নিজের চরকায় তেল দিলেই ভাল হয়।'

বছর তেইশ বয়েস হবে সুধীরের। আশ্চর্য শক্ত গড়ন ওর, তবু মুখখানা সুন্দর, ওর মায়ের মত কোমল। তাই কেমন মায়া হয় ওর দিকে তাকালে। জোর করে কিছু বলতে পারে না।

'তাই বলে তুমি পাড়া-পিতিবাসীর দুঃখ কষ্ট দেখবেনি রে বাবু? এক জনের দুঃখ-কষ্ট হলে আর একজনকে দেখতে হবে বৈ কি।'

'ওই, ওই—' সজোরে চেঁচিয়ে ওঠে সুধীর, 'ওই জন্যেই তোমার ঘুম হচ্ছেনি। পরের ভাবনা ভাবতে গেলে নিজের ভাবনা ছাড়তে হয়—'

লখীন্দর মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকায়। এমন জ্ঞান বৃদ্ধের মতো জোর করে কথা বলে কী করে! কোন কিছুর সম্বন্ধে অত তাড়াতাড়ি মাথা ঠিক করে কী করে। কথা যেন ওকে কোথায়ও আটকায় না। কিন্তু লখীন্দরের তা হয় না, কিছুতেই ও নিঃসংশয় একটা কথা বলতে পারবে না জোর দিয়ে। আর লখীন্দরের সংগে কথা বলার সময় সুধীরই উপদেশ দেবে, বিরক্ত হবে অথচ প্রত্যেকটা কথাই শান্তভাবে বলবে লখীন্দর। আপাতত সেটা ভীরুতা বলেই মনে হয়।

তমার গে ধর, আমরা ঘরে ছিলমনি, ত অরা এসে যে ঘর দুয়ার উলটি-পালটি দেখবে, তার কি বলবে তুমি।'

সুধীর তখন সেই মাত্র এক থামাল ভাত তুলেছে মুখে, বাঁ-হাতটা মাটির ওপর দিয়ে সামনের দিকে ঝুকে পড়েছে। লখীন্দর একবার বাঁকা করে তাকিয়ে দেখে নিলো। তারপর বলে, 'যদি তুমি বল, পুলিসের দরকার, অরা এসবে বৈকি, ত বিনা দোষে লাথ মারবে কেনে। মানুষের ত সম্মান বলে জিনিস আছে। তমাকে বলি বাবু, আমার ত বয়স হল, ত পুলিসের তল্লাসী আমি দেখেছি। পঞ্চাশ সালে একবাঁর তল্লাসী হইছিল ই গাঁয়ে, আমার ঘরেও হইছিল। সে কথা ত তমার মনে থাকার কথা। এমন কি হইছিল? তমার মায়ের বার হবার দেরী হইছিল, তা অকে কি বলেছিল, সে তুমি ভুলে যাওনি। মেয়া মানুষের একটা সম্মান আছে ত!'

সুধীর তখনও চুপ করে খাচ্ছে। লখীন্দর মনে করলে, বুঝিবা তার কথাটা ওর মনে ধরেছে তাই ও আশান্বিত হয়ে বলে 'অরা আবার ভাব দেখায় কি রকম জান, যেমন আমাদিকে কত কিপা করেছে—তা ই তুমি সহ্য কর কি করে।'

এক গ্লাস জল শেষ করল সুধীর। তারপর ফেটে পড়ে, 'উ সব আমি বুঝিনি বাবু। পুলিসের দরকার থাকবে ত অরা এসবে। আমাদের ঘর এসে যা দরকার তাদের তা দেখবে বৈ কি। আমি এই বুঝি—'

পাশে একটু দূরে অধীর ঘুমাচ্ছিল, সুধীরের চেঁচানোতে ঘুম ভেঙে উঠে পড়ে সে, কাঁচা ঘুম ভেঙেছে বলে কাঁদতে থাকে। রান্নাঘর থেকে সুধীরের মা চেঁচায়, 'বলি অমন চিল্লিমিল্লি করছ কেনে, আমার ছ্যারা উঠে পড়ল। তমরা এব্‌রে কাজ দেখ আমার—'

লখীন্দর বিব্রত হয়। 'আঃ, সুধীর, অত চেঁচাও কেনে, লোকে শুনে কি বলবে—'

সুধীর নিজেও একটু অপ্রতিভ বোধ করছিলো, কিন্তু লোকে কি বলবে—এ কথার উল্লেখে ও আরো গলা বাড়িয়ে দেয়।

'আমি চিল্লাব, একশবার চিল্লাব। কুন শালা কি বলবে আমাকে?'

লখীন্দর চুপ করে থাকে।

লখীন্দর ভেবে পায় না, কেমন করে ওদের বোঝাবে। আজকালকার মানুষ হয়েছে এই। অসভ্য হলে অন্যে কেউ কিছু যদি নাই বলে, তাহলেও সেটা কি তোদের লজ্জা নয়। বাবার কাছে 'শালা' কথাটা উচ্চারণ করতে নেই, একথা কতবার লখীন্দর শিখিয়েছে ওকে, কিন্তু কিছুতেই ও শিখবে না। নিজের কষ্ট নয়, ছেলেটার জন্যে বেদনা বোধ করে লখীন্দর।

আলোটা নিবিয়ে তেতলার ঘরটাতে শুতে যাচ্ছিল লখীন্দর, এমন সময় সুধীর শুতে এল। পাশাপাশি দুটো বিছানা, তেলাইয়ের ওপর কাঁথা বিছানো। তার ওপর শুয়ে, আর একটা কাঁথা টেনে দিলো সুধীর। ওদের একটা মাত্র লেপ, সে লেপটা এখন লখীন্দর গায়ে দেয়। একবার লখীন্দর ওটা সুধীরকে দিয়েছিলো, তা সুধীর বলেছিল, 'বাবা, তুমি বুড়া মানুষ, ইটা তুমি গায়ে দিবেনি, আর আমি গায়ে দুব? আমার বলে কঁছার খুট গায়ে দিলে শীতের বাবা পালাবে।' তা এমনটি কেন হয় না সুধীর সব সময়?

সুধীর প্রথমে সমস্ত শরীর মুখ চাপা দিয়ে দিলে। তারপর কিছুক্ষণ পরে উসখুস করতে লাগল। তারপর বিছানার ওপর ওঠে বসল।

'কি রে, কিছু বলবি?' আদর করে ডাকবার সময় লখীন্দর সুধীরকে তুই বলে ফেলে।

'বাবা, পুলিস যে লোকগুলোকে ধরবে বলে এসেছিল, অ যদি এমন না করে থালে ধরবে কি করে? কখন যে তারা গাঁয়ে এসবে, কথা থাকবে, সে ত পুলিস জানবেনি, ত' সমস্ত গাঁটা ঘিরে দেখতে হবে

বৈ কি। তখন দু'একটা অপমান যদি হয় ত হবে, তাতে আমার গায়ে মাখলে চলবে কি করে—'

'সুধীর তাহলে কথাটা ভেবে দেখেছে! হ্যাঁ, দেখতেই হবে, ভেবে দেখবে না কেন, একদিন না একদিন ভাবতেই হবে।

'দেখ সুধীর, আমি ত সেটি বলছিনি যে পুলিস ঘরে এসবেনি। কিন্তু যদি লোকজনকে অপমান করে, তাদিকে হীনছিন করে, তাহলে পুলিসকেই লোকে শত্রু ভাববে। এই যে লোকগুলাকে ধরবে বলে অরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, ত তাদের মধ্যে ভাল লোক নাই সে কথা ত লয়। লোকে লিচ্চয় ওই লোকগুলোকে ভালবাসে, তাই। তা নালে অরাই ধরি দিত। তা লোককে বুঝি' দিতে হয় যে, ই কাজটা যে তমরা করছ, তা ভাল হচ্ছেনি—'

'ফফউস—' অদ্ভুত একটা তাচ্ছিল্যের শব্দ করে সুধীর। 'তাইত করছে এরা। তুমি ত বলনি লোক নিশ্চয় ভালবাসে ওই ফেরারী লোক-গুলোকে ত তুমি ত জান, অন্তত জন পঞ্চাশ লোক পুলিসের সংগে ছিল। তারা ই গাঁয়েরই লোক। থালেই বল, তুমি কার কথা বলবে?'

ঠিক জায়গায় আঘাত দিয়েছে সুধীর। কিন্তু এমন করে ভাবে কেন ও, লখীন্দর ভাবছিল, এর চেয়ে বড় লজ্জার কথা আর কি আছে। নিজের নাক কাটলে গর্ব করার কী আছে!

'গাঁয়ের লোকের কথা আর বলনি। অদের আবার মান অফমান, সুধীর বলে চলল, 'এই রাম দিগারের কথা ধর। বেটা বউটাকে লিয়ে ঘর-কন্না করছে। গল্পটা শুন একবার—কত বড় অফমান উ মেয়াটার, আর রামের, তা তর সইলনি, গলগল গিলল, তার রাঁধা ভাত—এদের আর ছাতির জোর আছে—'

এর প্রত্যেকটি কথা সত্য। একথা জানে লখীন্দর। কিন্তু ওদের

হীনতা কি বেদনার জিনিস নয়? কত ছোট হলে তবে রাম এ অপমান বোধ করতেই পারে না। তাছাড়া মেয়েটার কি গতি হত, তাকে তাড়ালে। কী যে হত সে ত লখীন্দর জানে। কিন্তু এসব ব্যাপারে সুধীরের সংগে তর্ক করা বৃথা সে ত সম্পূর্ণ অন্য দিক দিয়ে চিন্তা করবে।

'দূর দূর, অদের কথা আবার ভাবে মানুষ—নিজে ঠিক থাক বাবা, থালেই আনন্দ পাবে। বলে, নিজের লাগি গুছ বাত, থালে থাবে দুধ ভাত—'

কাঁথাটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ে সুধীর। ওর যেদিকে লখীন্দর তার উল্টো দিকে পাশ ফিরে শোয়।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে লখীন্দর। তারপর বলে, 'দেখ সুধীর, তুমি যা বলছ তা সত্যি। সবাই ত আর সমান মানুষ লয় বাবা। হাতের পাঁচটা আঙুল কি সমান। তা মানুষকে ছোট মনে করতে নাই, মানুষকে নীচ বলতে নাই, তালে মানুষ ছোট হবে নীচ হবে। মানুষের যদি তুমি ভাল না কত্তে পার. ত তাকে ঠাট্টা পরিহাস করনি। মানুষ সব ভগবান। তমার বাপের এই কথা মনে কর।'

কি বলতে হবে, ঠিক বুঝতে না পেরে বাবার দোহাই দিয়ে বলে লখীন্দর। ছেলেটার জন্যে তার ব্যথার অন্ত নাই। কিন্তু কেউ যদি না বোঝো তা হলে সে কি করবে। তার যথাসাধ্য সে বলছে এই মাত্র। সুধীর কিন্তু তখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুধীরকে এই নিয়ে আর কিছু বলেনি লখীন্দর, কিন্তু কেবলই কথাটা তার মনে ফিরে ফিরে আসে। সে কেবলই চেষ্টা করে যাতে এই সব চিন্তা তার না আসে। কিন্তু রামের কথা তার ছেলের কথা কেবল মনে হয়, আর সেই সংগে সমস্ত গাঁয়ের কথা, তার বাইরে লোক জনের কথা মনে হয়। আর মনের অস্বস্তি ক্রমাগত বেড়ে চলে।

একদিন সন্ধ্যে বেলা সে ঝাঁকরার শিব মন্দিরে গিয়ে হাজির হয়। ঠাকুরকে প্রণাম করা তার উদ্দেশ্য, কিন্তু পূজরী-ঠাকুরের কাছে দুটো কথা শোনারও ইচ্ছে আছে! এই লোকটির কথা তাকে অদ্ভুত সান্ত্বনা দেয়। পূজরী ঠাকুর রামায়ণের ব্যাখ্যা করে তাকে শোনান। রামকৃষ্ণদেবের কথা বলেন, বিবেকানন্দের কথা, গান্ধীজীর কথা। বলেন, আমাদের দেশ ঠাকুর দেবতার দেশ; দেবতাকে আমরা ভালবাসিনে, তাই আমাদের এই অবস্থা আজকাল। দেবতাকে ভালবাসলে মানুষ নিজেই দেবতা হয়ে উঠ্‌বে।

কত জ্ঞানের কথা যে উনি বলেন, তা লখীন্দর ঠিক বুঝ্‌তে পারে না। কিন্তু অনেক কথা যেন তার অভিজ্ঞতার সংগে মিলে যায়। বলেন, গীতায় ভগবান কি বলেছেন, জানো লখীন্দর, নিজেকে না ভুললে ভগবানের কাছে যাওয়া যায় না। আর অপরের সেবার দ্বারাই সেই অহং-ভাব নষ্ট হয়। তাই মানুষের সেবাই ধর্ম। বিবেকানন্দ বলেছেন, নরনারায়ণের সেবা—

একথা শুনে লখীন্দর বলেছিলো, 'হ্যাঁ, উ কথা আমার মনে লেয়। লরনারায়ণের সেবাই ভাল, আর দেখেন বাবাঠাকুর, লোকের উবগার করে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তার মতন আর আনন্দ নাই।

মন্দিরে পৌঁছে প্রণাম করে এক পাশে বসে রইল লখীন্দর। তখন মন্ত্র পড়ে পূজো করছেন ভট্টাচার্যঠাকুর কৃষ্ণ ভট্টাচার্য। এতো সুন্দর করে মন্ত্রোচ্চারণ করেন উনি, লখীন্দর কিছু বোঝে না, কিন্তু কেমন এক সুর গিয়ে তার বুকে লাগে, তার মন উচ্চ-ভাবে পরিপূর্ণ করে তোলে। কি জানি কেন, তার দেখা ঘর-দুয়ার, মাঠ-ঘাট সব উৎসবের দিনের আনন্দে ভরা মনে হয়। লখীন্দর সে সময় নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখে।

পূজো শেষ করে নিত্যকার কাজ করেন ভট্টাচার্য ঠাকুর। যারা

এসেছিলো পূজো দেখতে, তাদেরকে ঠাকুরের প্রসাদ দেন, প্রত্যেককে কুশল জিজ্ঞাসা করেন। যথাসাধ্য সাহায্য করেন তিনি, দরকার হলে, সারারাত্রি গিয়ে বসে থাকেন পীড়িতের পাশে, যাবেন শ্মশান যাত্রায়।

পূজরী ঠাকুরকে এই জন্যই এত ভাল লাগে সবারই। লখীন্দরের ইচ্ছে হয় প্রত্যেক দিনই ওই ঠাকুরের পায়ের ধুলো নেয়। কিন্তু নানা কাজের ভিড়ে আসতে পারে না। তাছাড়া, অমন এক জ্ঞানী লোকের কাছে রোজ আসতে বিব্রত বোধ করে লখীন্দর। কারণ, এলেই তো সে নানা রকম প্রশ্ন করবে, আর তার সেই প্রশ্নের জন্য ওকে কষ্ট দিতে চায় না লখীন্দর। পূজরী ঠাকুরের কাজ শেষ হয়। কার বাড়িতে যেন ধানের মরাই ধ্বসে গেছে, গত দিনের রাত্রের বৃষ্টিতে। তো বেচারী লোক পাচ্ছে না সেগুলো গোছ করার। তাছাড়া রাখবেই বা কোথায়? ওর নিজের ঘর তো ফুটো, যে-রকম আকাশের অবস্থা, তাতে আবার যে বৃষ্টি হবে না, সে কথা কে বলতে পারে। পাশের বাড়ির একজনের মরাইটা খালি আছে, তো সেই খানেই রাখতে বললেন পূজরী-ঠাকুর। 'চলো হে, আমি যাচ্ছি, তোমার সব বন্দোবস্ত করে দেবো। ক মণই বা ধান? পাঁচশ?' তবে বেশ, আর একজনকে ডাকো তুমি তো আছ, আর আমি— এই তিন জনেই যথেষ্ট।'

লখীন্দরকে বললে, 'কি লখীন্দর তোমার পাড়ার খবর সব ভাল?'

লখীন্দর একটু হাসে, 'দাদা ঠাকুর, আপনার কাছে এলম, দুটা জ্ঞানের কথা শুনব বলে। তা আপুনি ত কথা যাবেন, তবে আজকে থাক—'

'সে কি কথা, জানত ভাই, কথা নিয়েই ব্রাহ্মণের কারবার—ব্রাহ্মণ তো জ্ঞান আহরণ করবে, আর সেকথা অন্যকে জানাবে—আমি না বলতে পারি? তুমি একটু বসো, আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসি।

তুমি তো জানো, ঠাকুরের প্রসাদ খেয়েই আমি রাত কাটাই। তা খেতে খেতে কথা বলা যাবে—'

লখীন্দর কৃতার্থ হল।

পূজরী ঠাকুর এলে পরে বললে, 'ঠাকুর, ইটা আমি বুঝতে পারছিনি—মানুষ ছোট বলে কি তার অফমান করতে হবে?'

'কেন একথা বলছ?'

'এই যে পুলিস-তল্লাসী হল, তার কথা বলছি ঠাদাঠাকুর। পুলিস। গাঁয়ের লোকের বড় অসম্মান করেছে। গোপী দিগারকে জানেন আপুনি, তা অমন বুড়ো মানুষ। হাঁপানি রোগ, ঘরের কণ থিকে লড়তে পারেনি। বলেছিল, আমার কাছে কিছু নাই-টাই বাবু, আমার অসুখ, আমি লড়তে পারবনি, তা আমাকে পেত্যয় কর। তা অকে দুজন পুলিস ধরে বার করে দিল। বুড়া মানুষটাকে টেনে বার করে দিল। আর পত্যেক কথায় গাল দিল—পত্যেক ঘরে পত্যেক লোকটাকে। তা আমার ছেলা বলে কি জানেন, বলে ছোট লোক, ত অদের এই ফলই ভাল। তা ঠাকুর, কে ছোট লোক কে বড় লোক তা আমি বুঝব কি করে। মানুষের বাইরটাই কি সব। তাছাড়া, ছোটকে কি অফমান করতে আছে?'

বেশ কিছুক্ষণ প্রশান্তমুখে লখীন্দরের দিকে তাকিয়ে রইল ভট্যাচার্য ঠাকুর। তারপর বললে, 'তোমার হৃদয় খুব বড় লখীন্দর। এমন কথা তো কেউ বলেনি। তুমি ঠিকই বলেছ লখীন্দর, মানুষ ছোট হয়ে গেছে, আর এই পুলিস, চৌকীদার, সরকার-সুবেদার এরা মানুষকে ছোট করে দিচ্ছে, তাকে মাথা তুলতে দিচ্ছে না। কিন্তু তুমি যে বললে, জোর দেখালে দু ঘা মারলে, তাতে মানুষ ছোট হল, তা নয়, মানুষ ছোট হচ্ছে অন্ত দিক দিয়ে। শীরষের সিংহ মশায়কে জান, লখীন্দর, সেবারে তিনি ডোমপাড়ায় একটা ভোজ দিলেন, আর

গাজনের খরচটা দিলেন, তাতেই সব সমস্যা জল হয়ে গেল, অত বড় বিদ্রোহটা, তা থেমে গেল। তারপর ধর, এই সেবারের ইউনিয়ন বোর্ডের ভোট। তা আমরা বললম, ওরে, তোরা নিজেরা দাঁড়া, তা টাকা পেয়ে ছেড়ে দিল—বিক্রী করে দিলে ভোট। জানো লখীন্দর, মানুষ আজকাল লোভী হয়েছে—আর লোভ হলে মানুষ হয় পরনির্ভর, নিজের ওপর আর আস্থা থাকে না, তখন শুধু ভিক্ষে করে মানুষ, আজ ইস্কুল দাও, কাল জলের কল দাও, পরশু রাস্তা মেরামত করে দাও—এতে কে ছোট হয়, মানুষ নিজেই ছোট হচ্ছে—'

বিনীত মনোযোগী ছাত্রের মত শুনছে লখীন্দর। কখনও ওর মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌ছে অল্প একটু, কখনো অর্ধোচ্চারণ করছে, 'হ্যাঁ, ঠিক—,' কখনও বা ঘাড় নেড়ে সমর্থন করছে। কোনখানটায় না বুঝতে পারলে সতর্ক হয়ে উঠ্‌ছে ওর চোখ মুখ, ইন্দ্রিয়গুলি।

'দাদাঠাকুর, এ আপুনি ঠিক বলেছেন। মানুষ আজকাল এই লোভেই স্বার্থপর হয়ে গেছে। শুধু নিজের কথা ভাবে অরা; কারো কথা শুনতে চায়নি, তারা মরে গেলেও ফিরে দেখবেনি। লখীন্দরের চোখের সামনে হয়তো তখন ওর ছেলে সুধীরের মুখ ভাসছে, হয়তো বা সেদিন রামের বাড়িতে কৌতূহলের বশে যারা এসেছিলো, তাদের কিছু করবার ভয়ে পালানোর কথা মনে পড়েছে! হয়তো অন্যান্য কত জিনিস তার মনে ভিড় করে আসছে, কে জানে।

ঠাকুরমশাই বললেন, 'ঠিক তাই, লখীন্দর। মানুষ স্বার্থপর হয়েছে বলেই সে মিথ্যাবাদী হয়েছে। সেবারে শ্যামগঞ্জের দক্ষিণপাড়ার ভাঙা বাঁধটা সারাবার জন্যে আমি বললাম, এপাড়ার সবাই তোমরা এস, বিকেলে একবার করে লাগলে এ হপ্তায় ঠিক হয়ে যাবে। বললে, দাদাঠাকুর এই পুন্নিমেটা যাক, তারপর আমরা সবাই আছি। তা প্রতিপদ বাদ দিয়ে দ্বিতীয়ার দিন ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে আমি গেলাম,

একজন জনপ্রাণী নেই, ডেকে হেঁকে জন তিনেক বেরোল। তা মনে কোরো না লখীন্দর মিথ্যে শুধু এদিক দিয়ে ঢুকেছে। তুমি একজন কৃষককে দেখ; নিজের ক্ষমতার বড়াই করতে ছাড়বে না। বলবে, আমি এটা পারি, ওটা পারি, দরকার হলে বাড়িতে অভ্যাগতের জন্তে একদিন পঁচিশ টাকার খাওয়া খরচ করবে ধার করে, মামলা করে ফতুর হবে তাই নিয়ে গর্ব করে বেড়াবে। আজকাল তো আর তাও নাই, যে দু'পয়সা আনে, তাতে তো সংসার চলে না—তা এ হচ্ছে মিথ্যার চূড়ান্ত। যেখানে তোমার ক্ষমতা নেই, সেখানে ক্ষমতা দেখাতে যাওয়া।'

অনেকক্ষণ একদিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল লখীন্দর। মুখ দেখে বোঝা যায় না, ওর ভেতরে কোন প্রতিক্রিয়া চল্‌ছে। এক সময় কিন্তু ও আস্তে আস্তে বলে, 'দাদাঠাকুর, ইসব কথা শুনলে পরাণটায় কষ্ট হয়।'

'ঠিক বলেছ, লখীন্দর। মানুষের দৈন্ত দেখ্‌লে প্রাণে কষ্ট হয়। তবে তোমায় বলে রাখি ভাই এই বেদনা থেকেই দেখো এই কষ্টের লাঘব হবে। মানুষকে ভাল না বাসলে মানুষকে মানুষ করা যায় না, এই কথা মনে রেখো—'

লখীন্দর আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তার পর বলে, 'কিন্তু কেনে এমনটা হল বলেন দেখি, ঠাকুর। কেনে এমনটা হল—'

ভট্টাচার্য ঠাকুর লখীন্দরের মুখের দিকে তাকালেন, এমন প্রশ্ন তো চাষীদের মুখ থেকে বেরোবার কথা নয়। লখীন্দর নিচু দিকে চোখ করে চেয়ে আছে, প্রশ্নের জবাবটা সে যেন শুধু তাঁর কাছ থেকে শুনতে চায় না, নিজের অন্তরের মধ্য থেকে খুঁজে বের করতে চায়।

ভট্টাচার্য বলেন, ইংরেজের জন্তে এমন হয়েছে লখীন্দর, ইংরেজ রাজত্বের জন্তে।'

লখীন্দর মুখ তুলে দাদাঠাকুরের দিকে তাকাল, একটি বুদ্ধিমান ছাত্রের জিজ্ঞাসায় ভরা ওর চোখ।

ভট্টাচার্য এক মুহূর্ত ইতস্তত করলে, এত কথা তো লখীন্দরের বোঝবার নয়। কিন্তু লখীন্দরের তীব্র কৌতূহল তার দ্বিধা কাটায়।

'ইংরেজ আমাদের দেশে কল এনেছে, কাপড়ের কল, চিনির কল —এই কলে মানুষ তৈরী হচ্ছে আজকাল। সব কলের পুতুল। মানুষ যেদিন হাতের তৈরী জিনিস ছেড়ে দিয়ে যন্ত্রের উপর নির্ভর করলে সেদিন থেকেই তার দাসত্ব।'

'কিন্তু দাদাঠাকুর, ইংরাজ ত চলে গেছে। তার ত রাজত্বি আর নাই।'

'তার বিষ আছে ভাই। সব মানুষ আজ গাঁ ছেড়ে শহরে যেতে চায়। তারা যাত্রা গান শুনবে না, টকী দেখবে। তারা পায়ে হাঁটবে না, রেলে চড়বে, তারা তাঁত ছেড়েছে কলের কাপড় পরবে বলে। তা ইংরেজ সব দিয়েগেছে। চাষী মানুষ আজ পয়সা চিনেছে। আর এই পয়সার লোভ সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে, তাই পয়সার জন্তে ভাই ভাইয়ের গলায় ছুরি বসায়। এই যে বড় বড় যুদ্ধ হয়ে গেল, অ শুধু ওই পয়সার লোভে।'

'হ্যাঁ?' এত কথা তলিয়ে বুঝবার নয় লখীন্দরের। অতদূর বুদ্ধিও পৌঁছোয় না। শুধু বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

'এর থেকে রক্ষা পাবার একটিমাত্র পথ আছে। মানুষকে স্বাবলম্বী হতে হবে, আর সত্য বলতে হবে।'

লখীন্দর তেমনি মনোযোগ দিয়ে শুনছে। কথাগুলো যেন গিলছে ও।

দাদাঠাকুর বুঝতে পারেন না লখীন্দর কি ভাবে কথাগুলো নিচ্ছে। কতখানি বুঝ্‌তে পারছে ও। কিন্তু কথাটা যখন একবার উঠেছে, তখন শেষ করতেই হবে। তাই বলে, 'এই যে তুমি পুলিসের দন্তের কথা বললে, তা এতো অপমান নয়, যদি তোমরা হাসি মুখে তা সহ্য করতে পারো। তেমন ক্ষমতা চাই। অত্যাচারীকে তো অত্যাচার দিয়ে ঠেকানো যায় না। শিবকে নীলকণ্ঠ বলে কেন জানো লখীন্দর? শিব নিজের লোভ থেকে যে বিষ উঠেছিল, তা পান করে সহ্য করেছিলেন। তা এর চেয়ে সত্য আর মহৎ কি আছে। অপমানকে হজম করেই মানুষ বড় হবে, তাতে অপমানের শেষ হবে লখীন্দর। অপমান না থাকলে আপমান যারা করে তারাও থাকবে না, যারা অপমান পায় তারাও থাকবে না।'

ধীরে ধীরে লখীন্দরের মুখের টান হওয়ার ভাবটা খানিকটে ঢিলে হয়ে আসে। ও বলে, আমার একটা কথা মনে পড়ছে, দাদাঠাকুর। বাবা আমার ছিল মাটির মানুষ—পাঁচ-জনের পাঁচটা ভাল কাজ করত, তা তাকে ভালবাসত খুব শীরিষের সিংমশায়রা। কিন্তু বলত, তোদিকে আমি ইটা দিলম, সিটা দিলম, তা, বাবা কিছুটি বলত নি। আমাদের কাছে কিন্তু বলত বাবা, কে কাকে দেয় বাবা, যিনি দিবার মালিক, তিনি দিবে—তা একদিন বাবাকে লাথি মারল বাবু, কি একটা হইছিল। বাবুদের শত্তুর ছিল রায়েরা তানরা বললে তুই মামলা কর, মান-লষ্টের মামলা। বাবা বললে. আমার মান আমার কাছে। ত অনেক লোক অনেক কথা বললে, তা বাবা শুনলে নি। শেষে বাবু নিজে একদিন বাবাকে ডেকে বললে, আমার দোষ হইছে, কিছু মনে লিসনি। তা বাবার জিত হল—'

ইতিমধ্যে ভট্টাচার্য-ঠাকুরের খাওয়া হয়ে এসেছিলো।' উনি তাড়াতাড়ি

বাঁচিয়ে নিলেন। বললেন, 'চল লখীন্দর, আমাকেও তো অনেকটা তোমাদের ওদিকে যেতে হবে এক সংগেই যাই—'

রাস্তায় নামতে বাইরের বাতাস লেগে মাথাটা হাল্কা মনে হয় লখীন্দরের। আগে আগে লণ্ঠন নিয়ে ভট্টাচার্য ঠাকুর চলেছেন। সেই আলোটার দিকে তাকিয়ে আছে লখীন্দর। বৃষ্টিতে অল্প একটু ভেজা আছে মাটির কাঁচা পথ। সে পথের দুপাশে অন্ধকার। মাঠ পেরিয়ে দূরে বনের মধ্যে দু একটা আলো দেখা যায়। গ্রামের আলো।

কিছুক্ষণ পরে ওদের পূর্বপ্রসংগ ফিরে আসে। এবারে পুলিস যাদের খোঁজে এসেছিলো, তাদের কথা ওঠে।

'জানো লখীন্দর, সেদিন ধানগাছিয়ার অজয়বাবুর স্ত্রী এসেছিলেন মন্দিরে। সংগে তার মামা হরি মণ্ডল ছিলো। তা ওরা গোবিন্দ মিস্ত্রিরদের খুনে বললে। ওই এক হতভাগ্য জীব—সব সময়ে ভয়ে ভয়ে আছে—' ঠাকুর মশায় হেসে ফেললেন হো হো করে, 'হরি মণ্ডল বলে, রাস্তা ঘাটে বেরোতে ভয় হয় ওদের। তা ওদের অবস্থাটা ভেবে দেখ। অথচ ওদেরকেই লোকে ভয় করে।'

লখীন্দর বললে, 'হ্যাঁ? গোবিন্দ মিস্ত্রিরকে থালে ওরা খুনে বললে? গোবিন্দ ছোকরা কিন্তু ভাল।'

ভট্টাচার্যের শেষের কথাগুলো তা হলে শোনেনি লখীন্দর। গোবিন্দর কথাটাই ওকে আকৃষ্ট করেছে বেশি। দাদাঠাকুর তাই বলেন, 'হ্যাঁ, তাইত বললে। আমিও গোবিন্দকে দোষ দিই, লখীন্দর। মানুষ কতখানি দুর্বল হলে যে অন্যকে খুন করে তা তুমি জান না ভাই। মানুষ নিজেকে অবিশ্বাস না করলে কাকেও খুন করতে পারে না। গোবিন্দ তার স্ত্রীকে হত্যা করে নিজের অযোগ্যতারই পরিচয় দিয়েছে।'

গোবিন্দকে ভালবাসত লখীন্দর। বহু কাল আগে গোবিন্দ যখন ছোট ছিল, তখন তাকে দেখেছিলো সে। তার মুখটা সে এখন ঠিক মনে করতে পারে না। কিন্তু গোবিন্দ বিদেশে পড়তে গিয়েছে, তার উন্নতি হয়েছে একথা সে শুনেছিল। একথা শুনে আনন্দ পেত সে। তাই দাদাঠাকুরের এই কথা তাকে কষ্ট দিল।

'দাদাঠাকুর, গোবিন্দরা কি বলে না বলে কুন্থু দিন আমি শুনি নি। কিন্তু গোবিন্দকে লোকে ভালবাসে। নিশ্চয় থালে সে এমন কিছু করে, যাতে লোকে ভালবাসে। তা আমি শুনেছি, অর ইস্ত্রি এমন এক কাজ করেছিল, যে গোবিন্দ আর অর অন্য লোক ধরা পড়ত। তা এটা কি তার উচিত হইচে—'

'লখীন্দর, আমি স্বীকার করলম তার স্ত্রী বিশ্বাস-ঘাতকের মত কাজ করেছে। আমিও জানি না তার স্ত্রী কি করেছিল। কিন্তু মানুষ ভুল করবেই, সেটা তার বুদ্ধির দোষ। কিন্তু তার হৃদয় বদলাতে পারে। মানুষকে খুন করা সোজা, কিন্তু তাকে বদলানো বড় কঠিন।'

লখীন্দর দেরী না করে বলে, 'তাই যদি গোবিন্দ তার ইস্তিরীকে কিছু না বলত, থালে অতগুলিন লোক মারা পড়ত দাদাঠাকুর।'

ভট্টাচার্য গতি মন্থর করেন, ইতিমধ্যে লখীন্দর কিছুটা এগিয়ে আসে। তার পর ওরা পাশাপাশি চলতে থাকে।

'তুমি. কষ্ট সহ্য করার কথা বলছ লখীন্দর, কিন্তু এতে পরিণামে ভালই হত। মানুষকে অবিশ্বাস করার পাপ থেকে রক্ষা পেত গোবিন্দ, আর শুধু গোবিন্দ কেন, গোবিন্দর হাতে যত লোক আছে সবাই।'

লখীন্দর চুপ করে থাকে, কিছুই বলতে পারে না। নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে একথা সত্যি কি না।

ভট্টাচার্য বলে চলেন, 'তাছাড়া জান লখীন্দর, কোনো রকম খুনজখম

আমি পছন্দ করি না। যে কোন কারণেই হোক, খুন করতে নেই। বাঁচতে দিয়েই তবে বাঁচা যায়, আর যদি খুন-জখম করা হয়, তাহলে সে খুন ঘরেই ফিরে আসে। এই নিয়ে কত যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়ে গেল, আর যারা হারল তারাও গেল, যারা জিতল তারাও গেল—'

এসব অভিজ্ঞতা নেই লখীন্দরের। ও বলতে পারে না কিছুই। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলে, 'দাদাঠাকুর, এসব কথা আমি কবেও শুনিনি, আমি বুঝতেও পারছিনি ঠিক মতন। ভেবে দেখবখন, যদি একটুন বুঝতে পারি।'

সেদিন সমস্ত রাত্রি ঘুমোতে পারল না লখীন্দর।

এত কথা একসংগে চিন্তা করার অভ্যাস ওর নয়, তাই মনে হতে থাকে মাথার শিরাগুলো হয়তো ছিঁড়ে যাবে। গরম, দপদপ করছে শিরাগুলো। পাশেই সুধীর ঘুমোচ্ছে। নিঃশ্বাস উঠ্ছে-পড়ছে তালে তালে। নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোচ্ছে ও, লখীন্দর ওকে না জাগিয়ে উঠে জল খেল। কিন্তু কিছুতেই ওর ঘুম আসে না। 'হুঁ? ঠিক ত, না, ই হবে কি করে—'

মানুষ কি অতখানি হতে পারবে, কাকে কি বলবে তুমি। না, অমন করে চিন্তা করতে পারে না লখীন্দর। রামকে মনে হয় অনেক দূরের মানুষ, সবাই মনে হয় সরে যাচ্ছে তার কাছ থেকে। তারপর একসময় ওর চোখের কাছে অতি ফাঁকা মনে হয়! যতদূর দৃষ্টি চলে।...

সকালে উঠে হাতমুখ ধুয়ে ফেলল লখীন্দর। অতি পরিচিত জগত তার সামনে। পুব দিকটার মাঠে শীতের রোদ্দুর শিশিরের ওপর পড়ে ঝলমল করছে। লখীন্দর গোয়ালে গিয়ে গোরুগুলোকে খুলল।

মনে হয়, কালকের ঘটনাটা কিছুই নয়। এমনই বা কি!

ছয়

গ্রামে পুলিসের তল্লাসী ব্যাপারটা যে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিলো, তা ক্রমশ থিতিয়ে আসে। এই রকম ঘটনা আজকাল প্রায়ই হয়। প্রত্যেকবারই খুব জোর উত্তেজনা হয় প্রথমটা।

গল্পগুজব আলাপ-আলোচনা সব জায়গায় চল্‌তে থাকে। তারপর যেইকে সেই। অবশ্য, যেবারে ওরা একটু বেশি আহত হয়, বা তল্লাসীর অভিনবত্ব থাকে, সেবারে আলোড়নটা একটু দীর্ঘস্থায়ী হয়।

কিন্তু এই ঘটনাটা নিয়ে লখীন্দরের ওপর একটা ঝড় বয়ে গেল। তার সমগ্র অস্তিত্বটা এমনভাবে নাড়া খেল যে, সে যেমন করে হোক তার সমস্ত মানসিক প্রতিক্রিয়াটা ঝেড়ে-মুছে ফেলতে চাইল।

অনেকবারই তো পুলিস-তল্লাসী বা হানা এ-অঞ্চলে হয়ে গেছে, কম-বেশি লখীন্দর নাড়াও খেয়েছে। সাধারণত, তাদের মতো লোকেরা যে-রকম আলোচনা করে থাকে, সেও ঠিক সেই রকম করে সবার সংগে যোগ দিত: পুলিসের দোষ না গ্রামবাসীর দোষ, যারা পালিয়ে বেড়ায় তারাই এর জন্যে দায়ী না তারাই হচ্ছে সাধারণ এবং গরীবের মা-বাপ। তারাই তো প্রাণ দিয়ে দেশকে বাঁচায়—ইত্যাদি নানা ধরনের আলোচনা।

কিন্তু এবারের জিজ্ঞাসা এসব ছাড়িয়ে অনেক তলায় তলিয়েছে। মানুষ অপমানিত হচ্ছে বা কেন, অপমান করছেই বা কেন।

এমনিতেই তার মস্তিষ্ক থই পাচ্ছিল না; তার ওপর শিবের পূজারী

কৃষ্ণমোহন (ওদের কিষ্টমহন ঠাকুর) তার মাথার মধ্যে জোর করে ঢুকিয়েছেন অদ্ভুত কথা। সেগুলো যেন অদৃশ্য ছুরির মতো তার মগজে বিধে রয়েছে। তার বেদনা ভীষণ। কোনরকম করে এই ছুরিগুলো বের করে ফেলতে পারলে, তার ব্যথা চলে যাবে। লখীন্দর জানে ঘায়ের ব্যথা সময় হলেই চলে যায়। তাই মাথা থেকে কোন-রকম করে সেই ছুরিগুলো যাতে সরে যায়, লখীন্দর তাই সময়ের অপেক্ষা করে নিজের কাজে মন দিল। নিজের চিরকালের চাষা ভূষোর কাজ।

কিন্তু একটা কথা বারবার ওর মাথা থেকে কিছুতেই গেল না। এর কি প্রতিকার নেই? আর এই প্রসংগে, গোবিন্দ মিত্র এবং তার সম্বন্ধে দাদাঠাকুরের উক্তি বার বার করে তার মনে আসে। গোবিন্দ মিত্র কি খুনে?

গোবিন্দ মিত্র সম্বন্ধে এখানকার লোকের ভক্তিশ্রদ্ধার অন্ত নেই। গোবিন্দ মিত্র বলতে তারা অজ্ঞান। গত বছর যে খুব বড় একটা খেতমজুর আন্দোলন হয়ে গেল, সেই আন্দোলনের সময় ছিল ও, সেই আন্দোলন পরিচালনা করেছে। আর সেই সময়ই পুলিস তাকে ধরে নিয়ে যায়।

লখীন্দর দেখেছে তাকে দূর থেকে। তখন দেখবার খুব আগ্রহ হয়নি। এখনও যে আগ্রহ বেড়েছে তা নয়। কিন্তু গোবিন্দ মিত্র খুনে, একথা যেন কিছুতেই স্বীকার করতে পারছে না লখীন্দর। আবার সেটাকে নাকচ করার যুক্তিও তার নেই। হবেও বা, মানুষের কখন কি পরিবর্তন হয় কে বলতে পারে।

সেদিন বিকেলে লখীন্দর তার ভাঙা জোয়ালটা মেরামত করবার জন্যে বাঁশঝাড় থেকে একটা মজবুত মুঠি বাঁশ কাটছিলো। সুধীর তাকে সাহায্য করবে বলে একটা কাটারী নিয়ে এল।

'দেখ বাবু সুধীর—' লখীন্দর হঠাৎ শুরু করে, 'কাজের তুল্যি আর আনন্দ নাই।'

সুধীর চোখ তুলে বাবার দিকে তাকিয়ে রইল। লখীন্দর সেদিকে না লক্ষ্য করে বললে, 'বাপ-ঠাকুদ্দা যা দি'গ্যাছে, সেটি লিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ইটা যদি তুমি না করতে পার, থালে অনেক কষ্ট পেতে হয়।'

সুধীর অমন করে তাকাবার ভংগী পেল কোথায়? বাপ-মা বলে ওর একটু সম্ভ্রম নেই। 'ইটা-উটা লিয়ে মাথা ঘামাও ত' মগজের দফাটি গেল, তার চেয়ে নিজের চরকায় তেল দেয়া ভাল—'

'হুঁ?'—সুধীর তেমনি কটমট করে তাকিয়ে আছে, ওর সারা মুখ সন্দেহ এবং কৌতূহলের হাসিতে ভরা।

লখীন্দর সেদিকে লক্ষ্যই করল না। ওর মুখে একটি সুখের হাসি ফুটে ওঠে। ও নিজের কথাগুলোকে যেন নিজেই চিবোচ্ছে।

তার পরদিন ওর এক প্রতিবেশী ভাগ চাষীর আলু-চাষের ব্যাপার নিয়ে পরামর্শ দিতে গেল ও। এ অঞ্চলের মধ্যে প্রাচীন লোক লখীন্দর, চাষ-বাস সম্বন্ধে ওর অভিজ্ঞতা প্রচুর বলেই সবাই জানে। প্রতিবেশীটি এই প্রথম আলু চাষ করবে, তাই লখীন্দরকে ডেকেছে। লখীন্দর একটু তাদারক করে দেবে জমিটা ঠিক তৈরী হচ্ছে কি না।

'কত খোল দিচ্ছ বল দিখিন, মহীন্দ।' লখীন্দর হুকোটা ডান হাতের তেলোয় ধরে আস্তে আস্তে এল। ছোট্ট একখানা হাত পাঁচেক ধুতি আঁট-সাট করে পরা, গামছাটা কাঁধের ওপর।

'ল'মন দিচ্ছি, বাবু।'

'সেকি, মহীন্দ, সাত পুয়া জমিএ ল মন খোল দিচ্ছ কি। বলে সার দিবি ত ফসল মার। তা উমার মুনিবকে বল না কেনে—'

সেই অত ছোট করে পরা কাপড়টাকে আরো খানিকটে ওপর দিকে টেনে গুটিয়ে নিল লখীন্দর। তারপর আলের ওপর বসল। 'লাও, তামুক লাও—'

'হ্যাঃ, দাদা উ কথা আর বলোনি—' একটা তাচ্ছিল্যের ভংগি করল মহেন্দ্র। তার সংগে হতাশাও মেশানো আছে। 'মুনিব দিবে বেশি সার? ত ঐ দিতেই কেঁপে গেল অর বুকটা।' বলে সে জমিতে নামল কোদালটা নিয়ে: 'ই সাত পুয়া জমি লিয়ে বড় ভাবনায় পড়লম্ দাদা। আলু চাষের ব্যাপার, তা তুমিই বল। বুকটা আমার দুরদুর করছে। ত ভেবে দেখ, মাগ-ছেলে-বেটা-বউ —এই চার-পাঁচ মাস জমিতে পড়ে থাকতেই হবে। মাঝে মাঝে মুনিষ লাগাতেই হবে, তুমি বল। মানুষের দেহ, আজ ভাল ত কাল খারাপ, দেহ যন্তর, এ্যার একটা কজা খারাপ হল ত কলটাই আর চললনি। কিন্তু তমার গে, চাষের ব্যাপার—সে কথা ত আর শুনবেনি। তার উপর আলু চাষ—আজ যদি জিরানি দিবার দিন, ত আজকেই দিতে হবে। আলু ধরাবার যদি দুদিন দেরী হল ত চাষ গেল। ত তুমি বল, আমাদের সবাই এই আলু চাষ লিয়ে থাকা—যদি ঠিক ফলাতে না পারি, ত মরে যাব, খেতে পাবনি—' হয়তো ঠিক মত পেরে উঠবে না, হয়তো চাষের তাক বয়ে যাবে, এই ভয়ে মহেন্দ্র প্রায় কেঁপে ওঠে। চষা-মাটির ওপর বসে কোদালের বাঁটটা ঠিক করছিলো সে, হঠাৎ উঠে বলে, 'ত মুনিব সেটা ভাববেনি। বলে, ঐ সার দিলম, ওই ঢের। বলে, আলু যেমন নষ্ট না হয়। বলি, আমি কি চাষী লয়, যে আমাকে উ সব কথা বলু? ত আমার ভাবনাটা বুঝি কম? ই শালা মায়ের থিকে মাসির দরদ বেশি। বলি, তমার লয় পাঁচটা আয় আছে, ইটা গেলে উটা থাকবে, আমার কি আছে শুনি?' কিছুক্ষণ চুপ

করে থাকে মহেন্দ্র, তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'সব সওয়া যায়, কিন্তক অরা বেশি হীনাছিন করে, সেটা সইতে পারিনি। আমাকে দিলে জমি, ত স্বীকার যাই যে আমি দুটা লাভ পাব, খেয়ে বাঁচব, কিন্তু বাবু তমার কি লাভ হবেনি? তুমি কি এই লিয়ে বেঁচে থাকবেনি? ত আমি হীনছিন করার লোক হলম কিসে, তুমিই বল, দাদা—'

বলতে হয় না! লখীন্দর জানে. জমির ওপর দরদ কারো নেই। না চাষীর, না মুনিবের। যদি লাভ হলতো হল, নইলে সে চাষীর দিকে ফিরে তাকাবে না কেউ। জমি হল মা-লক্ষ্মী, তার সেবা করতে হবে। দুএক বছর মা মন বিড়ে-কষে দেখেন, সেই পরীক্ষায় যদি কেউ টেকে তো মা মুখ তুলে চান। তা চাষীই বল, আর মুনিবই বল—সবাই সেই মায়ের সেবক। সে কথা আর কে শোনে! লখীন্দর বলে, 'চাষীকে হীনছিন করলে চাষেরই খেতি হয়, মহীন্দ। ই কথা খুব সত্য।'

ওরা দুজনেই চুপচাপ থাকে কিছুক্ষণ। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে মহেন্দ্র। যেন ওর ভেতরকার একটা বেদনার কথা সজোরে এক পাশে সরিয়ে রাখে।

মহেন্দ্র বলে, 'তমাকে ডাকলম্ দাদা, আমার জমিটায় কি রকম কি জোল বাগাতে হবে, লালা কাটতে হবে একটু দেখি' দাও। এতবড় জমি, এর আগে এত আলু লাগাইনি কখন, তা তুমি দেখ। বড় উবগার হয় থালে—'

লখীন্দর কাজ করতে করতে কথা বলে। শুধু একটা পরিকল্পনা ঠিক করে দেওয়া। বেশি রকম চিন্তিত হলে লখীন্দর হুঁকোটা মুখের সামনে না রেখে ঝুলিয়ে ফেলে। সেই লাঙল-দেয়া মাটির ওপর তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপরে আবার হুঁকোটা টানতে শুরু ক'রে।

'জান মহীন্দ, আজকাল মানুষ খাটবেনি জমিতে। এই যে তুমি লাঙল দিয়েছ জমিএ, তা আগে কদাল দিয়ে কেটে জমি করতম আমরা। সেই মাটিকে ভাঙতম, তারপর চাষ দিতম লাঙল দিয়ে। মাটি যদি গত্ত বেশি হয়, ত আলু লাফি উঠবে!'

'পড়তা কই, দাদা—' মহেন্দ্র সংগে সংগে জবাব দেয়, 'এই যে তুমি কদাল দিয়ে মাটি করবার কথা বল্লে, তা অ:তে খরচটা কি রকম দেখ।'

লখীন্দর বলে, 'মাটিকে ভালবাসতে হয়। ই হল তমার গে বিয়া করার মতন। বউ ছুটা মুখ ঝামটা দিল কি না দিল, ত তাকে তুমি ফেলে রাখবে।'

মহেন্দ্র বলে, 'বউ হল লিজের, আর জমি হল পরের। আমরা তবু না হয় ভাগচাষী, কিন্তু মজুর চাষী যারা, তারা ত জমির বাপের ধার ধারেনি—' খানিকটা ঝাঁজ ওর গলায়। বেশ খানিকটা বিরক্তি মেশানো আছে তাতে।

'ই তুমি মনের কথা বলেছ—' লখীন্দর সোজা হয়ে দাঁড়ায়, দম নেয় একটু, 'ইটা ঠিক কথা। এই যে দেখ মজুররা কাজ বন্ধ করল, ধম্মঘট করল,—ওই যে গো গতবছর যেবারে গোবিন্দ ধরা পড়ল—ত উটা আমি সম্পূন্ন ভালবাসিনি। জমিতে চাষ করবি, ত বেশি পয়সা চাই বলি, তর যদি লিজের জমি হত, ত তুই কি করতু। জমি আগে না পয়সা আগে—। তবে অদের দাবীও লেয্য। তা সেটা আমি খারাপ বলতে পারবনি—' কথাটা গোলমেলে হয়ে গেল, সেটা লখীন্দর নিজেই বুঝতে পারে। তাই বলে, 'ব্যাপার কি জান মহীন্দ, তালে গোলে সবাই যে যার কোলে ঝোল টান্‌ছে ত জমির কিছু হচ্ছেনি। লক্ষ্মীর উন্নতি হচ্ছেনি—দেশে অমঙ্গল হচ্ছে।'

এরপরে আর কথা এগোয় না। লখীন্দর কাজ বুঝিয়ে দেয়, আর মহেন্দ্র শোনে। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে আসে। এক ঝাঁক পাখি উড়ে যায় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে।

কাজ শেষ করে লখীন্দর বলে, 'আজ খুব আনন্দ পেলম ভাই তোমার এখানে কাজ করে। তুমি হয়ত বলবে ইটা বাজে কথা কেন না, মজুরী ত পেলমনি, কুন্থু আমার লাভও নাই। তা সে কথা সত্য লয়, আনন্দ পেলম।'

'হবে হয় ত। তা রাগ কোরনি দাদা, তমার ঘরে ধান আছে তমার ই কথা সাজে। পরের উবগার করা তমাদেরই ভাল।'

একটা তিক্ততা ওর সারা চোখে-মুখে। লখীন্দর দেখে অবাক হয়ে যায়, আহত হয়। প্রথমটা ও কিছু বলতে পারে না, কিন্তু সত্যই আনন্দ পেয়েছিলো বলে বললে, 'ই কথা তমার সত্যি লয়, ভাই ই তুমি বুঝতে পারনি—' কি করে যে বোঝাবে, সেটাও প্রথমটা ভেবে পায় না লখীন্দর। পরে বলে, 'তমার ছেলা আছে মহীন্দ?'

লখীন্দরকে কেমন চিন্তিত মনে হয়। হয়তো, ওর মনে তখন সুধীর-অধীরের মুখ ফুটে উঠেছে। 'যার ছেলে-পুলে নাই তার কিছু নাই। 'পুত্ত নরক থেকে উদ্ধার করে। পুত্তের মুখ দেখে স্বগ্‌গ সুখ হয়। সেই ছেলের জন্য তমার বুক ঢেলে দিয়ে মানুষ করতে হয়। ছেলে বেঁচে থাকলে তুমিও বেঁচে থাকলে। ছেলে ত তমারই অংশ। আমার কুলগুরু বলেছিল, বলে, বাবা লখীন্দ, তুমি ই পৃথিবীটাকে তমার পুত্ত মনে করবে। পুত্তের মত তাকে তমার সব দিয়ে যাবে—সব চেয়ে বেশি দিবে তমার বিদ্যা। তুমি যদি ভাল চাষ জান ত সেই চাষ শিখি দিযাবে তমার লোককে—পথম তমার পুত্ত পাবে সেই বিদ্যা, তারা পাবার পর অন্যকে দিতে পার। ই গুরুর বচন।'

বেশ স্বচ্ছন্দে বলে যাচ্ছে লখীন্দর। গ্রামের বৃদ্ধ লোকে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক লোকদের সামনে প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে নিজের তুচ্ছতম অভিজ্ঞতার কাহিনী পর্যন্ত বলবেই। লখীন্দর মাঝে মাঝে এমনই বকতে শুরু করে। 'তা আগে ই কথাটা বুঝতমনি। এখন ভাবছি এমন আনন্দ আর নাই।'

মহেন্দ্র অবিশ্বাসের চোখ নিয়ে তাকায়। একবার লখীন্দর চোখ-মুখ লক্ষ্য করে করে দেখে, তারপর 'হবে হয়তো' এই ভাব নিয়ে নিজের কাজে মন দেয়। সংক্ষেপে বলে, 'হুঁ—'

'বড় ছেলেকে আমি দিছি আমার বিদ্যা। তা অর মত লাঙলে-লোক ঐখেনে আর নাই। ঘরের কাঁথ তুলতে উ আমার অস্তাদ, ভাই, আর অমন চাল ছাইতে আমিও পারিনি। ত ছোটটিকে সেদিন শিখাচ্ছিলম কদাল ধরা, ত বড় হেসে 'উড়ি দিলে। বলে, আর কেনে, আমাকে ত মুখ্য করে রেখেছ, ত উটাকে একটু লেখাপড়া শিখাও। আর উ যে ছেলে তোমার, উ আবার লাঙল ধরবে।'

তারপর আপন মনেই বলে, 'মুখ্য করে রাখিনি ভাই। অকে যা দি' গেলম, ত উ জানবেনি। ভগমান জানবে।' হঠাৎ যেন কোন কিছু মনে পড়ে গেছে, এমনি ভাবে বলে, 'জান মহীন্দ, আমার দুটি ছেলে দু-রকম। বড়টির ভক্তি-ছোদা নাই, উ আমার যে শেষ পর্যন্ত কি করবে ভাবতে পারছিনি। আর ছোটটির মত শান্ত তুমি দেখনি, লেখাপড়ায় অর মত পাঠশালে ছেলে নাই, তা উ কদাল ধরতে কষ্ট পাবে। উ বোধায় কোদাল ধরতে পারবেনি—'

তার পরের দিন লখীন্দর নিজের জমিতে চাষ শেষ করে বাড়ি ফেরার

মতলব করছে, এমন সময় খবর পেল, মন্থ দিগারের জমিতে ধান তোলা নিয়ে জমিদারের সংগে লাঠালাঠি হয়ে গেছে, আরও হবে। টুকি আর অধীর জল খাবার নিয়ে এসেছিলো, তাদের হাতে লাঙল জোয়াল আর গোরু দুটোকে দিয়ে চলে গেল লখীন্দর।

কিছুক্ষণ আগে ছেলেমেয়েকে শিক্ষা দিচ্ছিল, চাষীর কষ্ট হলে কেমন করে চাষের কষ্ট হয়। কেন না, ওরা দেরী করে জল খাবার নিয়ে এসেছিলো, তাতেই এই কথা ওঠে। 'বলি শুন মা টুকি, অধীর তুমিও শুন—চাষীকে কষ্ট দিতে নাই থালে লক্ষী অসন্তুষ্ট হয়। সে অনেক দিনের কথা। লক্ষণ দাস জমি চষতে গিছল, দণ্ডীপুরের মাঠে। জষ্টি মাস, মাঠে কেউ কোথাও নাই—তেষ্টায় অর ছাতি ফেটে যায়,' টুকি আগ্রহে সরে আসে, লখীন্দর কিছু মুড়ি গুড় মাখা ওদের খাইয়ে দেয়. 'তা উ পথের দিকে চেয়েই আছে। চেয়েই আছে। শেষকালে দূরে অর বউ মাথায় কলসী করে জল আনছে দেখতে পেলে—তা জল দেখে অর পেরাণটা আরো আকুলি-বিকুলি করে —ত উ ছুটতে আরম্ভ করে অর বউএর দিকে, কিনা এগি গিয়ে জলটা খাবে। তা অর বউ ভাবল, বুজি দেরী হচ্ছে বলে লাঙল-বাড়ি দিয়ে মারতে এসছে। মাথার কলসী আর খাবার ফেলে রেখে ভয়ে দে ছুট। ত উ চাষী কাছে এসে তেষ্টায় সেই ভিজে মাটিতে মুখ গুজে পড়ে—জষ্টি মাসের মাঠ, সে কি জল আর তখন আছে—ত উ মরে গেল। ছাতি ফেটে মরে গেল।'

টুকি আর অধীর খাওয়া বন্ধ করেছে। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা।

'তিন বছর সে মাঠে আর ধান হলনি। চাষীর অপমিত্য হইছে, সে পাপ সবাইকে লাগল। পথে যদি কেউ জল চায় মা, ত অকে দিও।'

এই গল্প বলে খাওয়া শেষ করে উঠছে লখীন্দর, এমন সময় খবর এল।
'হ্যা—? লখীন্দর বলে।
'তুমি ত জানতে লখীন্দদাদা, মজুর বাবার ছিল ভাগের জমি উটা। ত দুবছর চাষ বন্দ ছিল। তাতে জমিদার নিজে লাঙল দিতে আরম্ভ করে ছিল গত আষাঢ় মাসে। ত আমরা সবাই মিলে সে জমিদারের লাঙল হটি দিয়েছিলম, আমরা মজুর হয়ে দিছিলম চাষ, ধান বুনে দিছলম, কিছুটি অরা বলেনি। ত এখন মাঠ থিকে ধান তুলে নিতে চায় অরা, সব ধান।'
'সেটা কি আর হয় রে. বাব। চল চল।' লখীন্দর বললে।

সাত

বেলা দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে। উত্তর দিক থেকে সাঁ-সাঁ করে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে মানুষের শরীরের চামড়া কুঁচকে দেয়। মনে হয় যেন হাত-পা জড়িয়ে আসে। পায়ের নিচে মাটি ভীষণ শক্ত, পায়ের তেলো দুর্বল হয়ে পড়ে বলে মাটিগুলোই কাঁটার মতো পায়ে বেঁধে।

লখীন্দর ওসব কিছু খেয়াল করে না, তার দৃষ্টি শ্যামগঞ্জের ওই বড় মাঠটার মাঝখানে। লখীন্দর দেখল, তারই মতো চারদিক থেকে আরো মেয়ে পুরুষ ছুটে আসছে। আলের ওপর দিয়ে, ধান-কেটে ফেলা জমির ওপর দিয়ে ছুটে আসছে কেউ কেউ। সমস্ত ধান তোলা হয়নি, কোথাও বা কাটা ধান আঁটি বাঁধা হতে বাকি আছে। সামনে দূরে ওই যেখানে লোক জড় হয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে সেদিকেও চোখ রাখতে হয়, আবার যাতে ধানের শীষে পা পড়ে ধান না ঝড়ে যায় সেদিকেও খেয়াল করতে হয়। ফলে যারা ছুটছে তাদের ছোটার ভংগি প্রায় হাস্যকর হয়ে ওঠে।

লখীন্দর কেমন এক উত্তেজনা বোধ করে। ওর বুকের ভেতরটা যে ঠিক কি করে ও বলতে পারে না। বোধ হয়, ওর পেট থেকে মাথা পর্যন্ত কেমন জ্বালাজ্বালা করে, বুকটা ভীষণ দুরদুর করে। ওখানে পৌঁছে দলের মধ্যে মিশে গেল লখীন্দর।

ছোট ছোট পাঁচ-ছয়টা দল তৈরী হয়েছে। এ দলেও নেই ও দলেও নেই এ রকম লোকও রয়েছে। মাঝামাঝি ছড়িয়ে রয়েছে তারা।

কেউ ভীষণ চেঁচাচ্ছে। কালো-কালো চিমসে যাওয়া শরীর। হাত

পা নাড়ার ভংগিতে সমস্ত শরীর সাড়া দেয়। ওতে ওদের সংকল্পের একাগ্রতা বাড়ে।

কেউ ভীষণ চিন্তিতভাবে হুকোটাতে ক্রমাগত টান লাগিয়ে চলেছে। আর পার্শ্ববর্তী কেউ শুনুক বা না শুনুক মাঝে মাঝে দু'একটা কথা বলছে। কেউ বা নিশ্চিন্ত মনে মুড়ি চিবিয়ে চলেছে, লক্ষ্য করছে সবাইকে।

এদের মধ্যে একজন গংগার ধারে চটকলে মজুরী করেছিল কয়েকদিন। তখন সে কিছু কিছু হিন্দী শিখেছিলো। সে খুব জোর গলায় চেঁচাচ্ছে:

'কুছ্ পরোয়া নাই। বিলকুল সব মার ডর্ দেংগে। সব শালা লোক হাম দেখ লিয়া, তো পগার পার করেংগা সব শালাকো—'

ওর কথা শুনছে না কেউ। যদিও সবার গলার ওপরে ওর গলা পৌঁছচ্ছে। ওর বাঁহাতে একটা মুলো, ডান হাতে করে কোঁচড় থেকে মুড়ি বের করে মুখে দিচ্ছে, আর মুলো কামড়াচ্ছে। তারপর সেই ফুলো গালে চেঁচাচ্চে, 'হামার জমি—'

কম-বেশি সবারই বক্তব্য প্রায় এক। ওর কথায় কেউ হাসে না। ওকে ওই ভাবে চেঁচাতে দিয়েই প্রত্যেকে কথা বলে।

'ধান কি ছেড়ে দুব? ই শালা কি মগের মুলুক পেইছে নাকি—'

'তা জমিদার, তার ইচ্ছায় কাজ—' আর একজন বলে, 'অর সংগে লড়তে হবে মনে থাকে যেমন।'

'এসু না শালা কুন শালা এসবে। অরা ত এসেছিল, ত টিকতে পারলনি কেনে, গোভাগাড় করে পাঠি দুবনি।'

আর একদলে আলোচনা চলছিল:

'লাঠালাঠি যে একটা হবে, সে ত বুঝাই যায়।'

'সেক্ষেত্তে আমাদের কি করা উচিত-অনচিত্ সেটা ভাব।'

'অত ভাবলে চলবেনি খুড়া আমরা ঢিলটি খেলে পাটকেলটি ফিরি দুব।'

তিনজন প্রবীণ গোছের লোক দুটো আলের মোড়ে বসেছে। প্রায় মুখোমুখি গোল হয়ে বসেছে ওরা।

'ধর তোমার গে যদি একটা খুন-জখমি হয়েই যায়, আর ই যে হবে সে ত জানা কথা, ধর জমিদার কি ছেড়ে দিবে নাকি, ত সেটা কি লেহ্য হবে?'

'ধম্ম-অধম্ম নাই? তা বলে মন্থু দিগার এত কষ্ট করে চাষ বাস করল, এ চাষ করতে কত দেনা হইছে তার সেটা খবর লাও—ধরগে এক বন্দে তের বিঘা জমি—ই কি যাতা ব্যাপার, লোকটার সব্বনাশ হয়ে যাবে যে—'

'থালেই বল—ভাবলেনি চাইলেনি আর অমনি এসে ধান তুলে লিযাবে এর একটা বিচার-আচার নাই? আমরা কি তমারগে ঘাস খেয়ে পেট ভরাই?'

লখীন্দর ওখানে একজনকে জিজ্ঞেস করল, 'কি হইচে বল দিকি।'

পাশাপাশি দু'তিন লোক জড় হয়ে আসে: 'তুমিই বল লখীন্দদাদা, ইটা কি সহ্য করা যায়?'

'বলি আমরা ত মানুষ। লেহ্য অলেহ্য একটা আছে। আজ আমার ঘাড় ভাঙবে, কাল তমার, তা ইটা কি আমরা মুখবুজে মেনে লুব? তা লুবনি!'

'আমরা হাজার হোক মানুষ ত।'

কথাটা লখীন্দরের কানে ঢুকতেই ওর বুকটা একটু কেঁপে ওঠে। অনেকবার সে কথাটা চিন্তা করেছে, কিন্তু ঠিক ভেবে শেষ করতে পারেনি। সে আস্তে আস্তে বলে, 'তা একটা কিছু ঠিক করতে হবে ত?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইটা তুমি ঠিক বলেছ লখীন্দ। তা তুমি কি বল।'

'ধান আমরা দুবনি। তাতে যা হয় হউ।'

'ঠিক। ইটা তুমি ঠিক বলেছ। ইটা আমাদের মনে লেয়। এই শুনগো তমরা—' লখীন্দর এসেছে একথা এর কান ওর কান করে প্রায় সবাই শুনেছিল। কেউ বা আগ্রহ-বোধ করল প্রথম, কেউ বা করল না। কিন্তু এদের মধ্যে কে যখন বললে, 'শুনগো তমরা লখীন্দদাদা কি বলে শুন—' তখন একটু একটু করে সবাই ঘন হয়ে আসে। প্রত্যেকেই কথা বল্‌ছে, প্রত্যেকেই জানতে চাইছে। লখীন্দরের কাছাকাছি লোকগুলি মাথা নেড়ে চিৎকার করছে, 'হ্যাঁ ইটা ঠিক ইটা ঠিক।' কিন্তু যারা দূরে রয়েছে তারা শুনতে পায় না। তারা জানতে চায়, চিৎকার করে প্রশ্ন করে। ফলে গোলমাল আরও বেড়ে ওঠে।

এই সময় সেই হিন্দি-জানা লোকটি চেঁচিয়ে ওঠে, 'এই চুপ রহো।'

সবাই এক সংগে চুপ করে, কিছুক্ষণ মাঝখানে সবাই তাকিয়ে থাকে। কে যেন বলে, 'লখীন্দদাদা কি বলছে শুন—'

'কি বলছ বল,'

'হ্যাঁ লখীন্দ পাচীন লোক, ত উনি বলু—'

'ঠিক পাকা-মাথার যুক্তি লিয়া ভাল—'

আবার গোলমাল বাড়ে। আবার সেই হিন্দী-জানা লোকটি চিৎকার করে ওদের থামায়। ইতিমধ্যে সে লখীন্দরের পাশেই এসে হাজির হয়েছে।

'আমরা ধান তুবনি।' লখীন্দর এই সুযোগে বলে। ওরা কিছুক্ষণ লখীন্দরের মুখের দিকে তাকায়। যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না ও কি বলছে। 'আমরা ধান তুবনি। ত মনু দিগারের খামারে আমরা ধান তুলব।'

'ব্যস, ইসকে বাদ কুছ বাত ভি নেই—'

সবাই একবাক্যে স্বীকার করে যে এর চেয়ে ভাল পরামর্শ আর হতে পারে না। সবাই সমর্থন করে আর লখীন্দরের প্রশংসা করে।

কিন্তু একজন যুবক গোছের কৃষক হঠাৎ ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে বলে, 'আমার একটা কথা আছে শুন। আমার একটা কথা আছে।'

'কি বল ; তমার কি কথা—'

'তুমি আবার কি ফ্যাকড়া দিবে—'

লখীন্দর ওদের থামায়। বলে, 'না না, সবাইয়ের কিছু না কিছু বলা উচিত। এক মাথায় কাজ হয়নি রতন, তুমি বল—'

রতন সংগে সংগে বলে, আমাদের লেতা (নেতা) কই। আমরা যে এই কাজটা করব তা এর ভালমন্দ আছে, বিপদ-আপদ আছে, আমাদের মাথায় কি আর উসব খেলে—'

'কথাটা লেহ্য বটে—' একজন বলে।

যে উৎসাহের ভাবটা সবার মধ্যে দেখা যাচ্ছিল, হঠাৎ সেটা যেন মনে হয় ঝিমিয়ে এসেছে। প্রত্যেকেই কথাটা ভেবে দেখে।

লখীন্দর বলে, 'বিপদ-আপদকে ত ভয় করলে চলবেনি। আমার হচ্ছে এই কথা বাবু। আমরা চাষা-ভূষা মানুষ, ধান না হলে আমাদের চলবেনি, ত আমাদের ধান চাই। ধান আমরা তুলবই—'

রতন আবার বলে, 'ধর, জমিদারের লোক এসবে, একটা মারামারি লাঠালাঠি হবে, তখন ?"

লখীন্দর চিন্তিতভাবে কথা বলচে। ও শুধু সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। সামনের চুলগুলো ওর কিছু পেকেছে, কিছু কাঁচা। কাঁধের ওপর গামছাটা ঝোলানো। লখীন্দর ভাবছে কেমন করে ও বৃদ্ধ মোড়লদের মত কথা বলবে। মাথা ঠিক রাখতে হবে, রাগ করলে চলবে না, একটা ছুট কথা কি বেফাঁস কথা যাতে না বেরোয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

'আমার হল এই কথা। ধান যদি আমরা তুলি, থালে অনেক রকম আপদ-বিপদ এসবে, সেটা ঠিক। সেটা আমাদিগকে মাথা পেতে

দিতে হবে। কিন্তু ইটা আপনারা পাঁচজন ভেবে দেখ যে, পেটে যদি ভাত থাকে থালে সব হয়। যদি বল মামলা-মকদ্দমা, ত খামারে ধান আছে, ভয় করিনি। যদি বল লাঠালাঠি, ত খামারে ধান আছে, ভয় করিনি। ইটা আমরা বলতে পারব। ধানের তুল্য চাষীর বল নাই। ত সে ধান আমরা ছাড়বনি—'

সমস্ত জনতার সব দিক থেকে একটা সমর্থনের ধ্বনি ওঠে, তারপর আবার ওরা চুপ করে শোনে। 'রতন তুমি যে লেতার কথা বললে, ত লেতার কাজ লেতারা করবে। আমাদের কাজ আমরা করব। আমরা ধান ত তুলে লি, পরে বুদ্ধি দিবে লেতারা।' এই ত গোবিন্দ মিস্তির আছে, ত দরকার হলে ওনারা আমাদের মাথা দিবে বই কি।'

গোবিন্দ মিস্তির নামটা উচ্চারণ করবার সময় ওর গলাটা কেঁপে যায়, হয়তো তখন ভট্টাচাজ্জি ঠাকুরের কথাটা মনে পড়ে, এই নামটা উচ্চারণ করেও ভাবে ঠিক করেছে কিনা, কিন্তু পরে বলে 'ওনারা সবতো এই কাজই করেন। তা ঐ রকম যদি একটা কুনু ঘটনা ঘটে যায়, থালে তেনারা এসবে বৈকি। তখন যদি তোমাদের কথা আমাদিকে ভাল লাগে ত শুনব, না হলে শুনবনি।' শেষ কালের কথাটা বলে লখীন্দর কতকটা শান্তি পায়, শেষ পর্যন্ত শোনা না শোনা যে তাদের ওপরেই আছে, এ কথা বলতে পেরে তার ভালো লাগে।

'থালে আমরা ধান তুলা আরম্ভ করি, কি বল। পাঁচজনে বল।'

কথা থেকে ওরা কাজের মধ্যে গিয়ে পড়ে। জমিতে ধানের আঁটিগুলো পড়েছিলো। নিচের দিকে তাকিয়ে ওরা কাজের একটা প্রচণ্ড আবেগ অনুভব করে। কেউ কেউ বা উত্তেজনার সময় ধানের আঁটির ওপরেই পা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো, তারা সসব্যস্তে পা সরিয়ে নিয়ে নমস্কার করে। 'আহা মা লক্ষী।'

ধান তোলা শুরু হয়। আঁটিগুলো এক জায়গায় গোছ করে বোঝা বাঁধা হয়, তারপর পরে মাথায় ওঠে। 'মনু দিগারের খামারে লিয়ে যাও।'

লখীন্দরই প্রথম ধানের বোঝা মাথায় করে। সবায়ের চোখে তার সম্মান আজ খুব বেশি। তার কথা পাঁচজনে গ্রহণ করেছে, এই আনন্দে সে অস্থির। আজ সে সবার পা ধুইয়ে জল খেতে পারে। আনন্দে লোকের মাথা গুলিয়ে যেতে পারে, অহংকার হতে পারে, তখন নিজেকে সবার অধম ভাবতে হয়।

কিছুক্ষণ ধান বইবার পর, সবাই ওকে নিবৃত্ত করে। 'লখীন্দদাদা, তমাকে ধান বইতে হবেনি, তুমি বরঞ্চ আমাদিকে বলে দাও কি করতে হবে। তুমি একটু দেখাশুনা কর।'

'না না, ই আমি ঠিক করছি—সবাই মিলে না লাগলে ত হবেনি। তা ছাড়া ই ধান বয়ার কাজ ত তেমন কঠিন লয়, সবাই ইটা পারবে।'

'তুমি কি খেপেছ লখীন্দদাদা। দেখ দিকি কত লোকের হাতে কাজ নাই—লাগ তুমি।'

অগত্যা লখীন্দর তাই করে। তের বিঘা জমির ওপর কতকজনকে পুবে, কতককে পশ্চিমে ছড়িয়ে দেয়। তার মধ্যে আবার কারা গাদা করবে, কারা বাঁধবে, সব ঘুরে ঘুরে নির্দেশ দেয়। সবাই তার কথা যতই শোনে, সে ততই গম্ভীর হয়ে ওঠে, ততই সতর্ক হয়। নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে ক্রমশ সে বেশি সচেতন হয়ে ওঠে।

ঠিক মতো কাজ সবে মাত্র শুরু হয়েছে। কেউ আর কাজ ছাড়া নেই। আলপথ দিয়ে ধানের বোঝা মাথায় কৃষকেরা চলেছে গ্রামের দিকে। এমন সময় জমিদারের দল এল।

সর্বপ্রথম দলটাকে দেখতে পায় সেই হিন্দী-জানা' লোকটি। সে

চেঁচিয়ে ওঠে, 'এই শালারা আ গিয়া। শালা যে যার কাজ করতা হ্যায়, তো লাঠি কই—এই আও।' ও কয়েকজন ছোকরাকে নিয়ে গাঁয়ে চলে যায় লাঠি আন্‌তে। আলের ওপর দিয়ে সজোরে ছুটে চলে ওরা।

কৃষকেরা প্রায় সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। সবাই প্রথমটা কি করবে ভেবে পায় না। কিন্তু লখীন্দর চেঁচিয়ে বলে, 'ধান ছাড়বনি আমরা কেউ, ধান তুলে লি' চল।'

লখীন্দর প্রথম থেকে এটা আশংকা করেছিলো। জমিদারের লোকজনকে একবার যখন ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, তখন তারা যে এ অপমান হজম করবে না, সেটা জানা কথা। তাছাড়া জমিদারী স্বত্ব বড় গোলমেলে বলে আইন করা ঠিক সুবিধের হবে না। সুতরাং কিছু লাঠিয়াল আসাই স্বাভাবিক।

'কাজ আমরা ছাড়বনি—'

দলটা যত কাছে আসে, লখীন্দর ততই ঘুরে ঘুরে বলে, 'পুরুষের বাচ্চার ভয় নাই। আমরা গাঁয়ে যাচ্ছি ধান রাখতে, আবার ফিরে এসব, বউ-এর আঁচল ধরে কণে লুকাবনি।'

জন পনেরো লেঠেল নিয়ে হিন্দুস্থানী দারোয়ানটা এসেছে। ওরা প্রথমে এসে থমকে দাঁড়াল।

'প্রায় প্রত্যেকের কানে কানে বলে চলেছে লখীন্দর, যতক্ষণ আমরা এক সংগে আছি, কারো বুকের পাটা নাই এগুবার। যতক্ষণ আমরা—'

'শালারা', 'বেউশ্যার বাচ্চারা', 'বেজন্মা সব-' গর্জন ওঠে, গুমরে ওঠে এরা।

লখীন্দর হেঁকে বলে, 'চুপ কর ভাই, কাজ করে যাও।'

দুজন লেঠেল এই সময় এগিয়ে এল। সবেমাত্র একজন চাষী মাথায় ধান তুলেছে, এমন সময় ওরা লাঠি দিয়ে বোঝাটা ঠেলে ফেলে দিল

আগে ধানের বোঝাটা পড়ে, তারপরে চাষীটা ঠিক পড়ে তার ওপরে। গোঁ-গোঁ করতে থাকে, তার ঘাড়টা মুচড়ে গিয়েছে।

যে চাষীটি বোঝাটা তার মাথায় তুলে দিয়েছিলো, সে ঘটনাটা দেখে খেপে যায়। চট্ করে সে একজনের লাঠিটা ধরে ফেলে, কিন্তু ছিনিয়ে নিতে পারে না। এই অবসরে দ্বিতীয় লেঠেলটা তার ওপর ঘা মারে একটা। তার কাঁধের ওপর। হৈ হৈ করে ছুটে আসে আরো কয়েকজন কৃষক।

ইতিমধ্যে সেই হিন্দী জানা লোকটি এবং তার দলবল লাঠি-ঠেঙা নিয়ে ছুটে আসে। মারামারি শুরু হয়ে গিয়েছিলো, রীতিমত বেঁধে ওঠে তারপর।

লখীন্দর প্রথমটা কি করবে ভেবে পায় না। শেষ পর্যন্ত লাঠালাঠি হবে না, এই তার ধারণা ছিল, কিন্তু যখন শুরু হয়েই গেল, তখন ও থামাবার চেষ্টা করে। ও ভিড় ঠেলে সেই হিন্দুস্থানীটার কাছে এগিয়ে যায়! 'সর্দার তমার বাবুকে বলগে এটা ভাল হবেনি, এর একটা মীমাংসা ত আছে। মিটমাট আছে। তুমি ফিরে যাও।'

লখীন্দর সর্দারজীর উত্তর শুনতে পায়নি। তার আগেই একটা লাঠির ঘা লেগে ও অজ্ঞান হয়ে যায়।

চেতনা পেয়েই ও দেখে কার যেন বাড়িতে ও শুয়ে আছে। পাশের ছেলেটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করল। শ্যামগঞ্জে ঢুকবার মুখে এক জেলের বাড়িতে শোয়ানো হয়েছে ওকে। মাথাটা দুর্বা ঘাস ছিঁচে তাই দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

'ধানের কি হল, ধান?'

'সে আর তমাকে ভাবতে হবেনি। ধান ঠিক বওয়া হচ্ছে।'

ঠিকই ত। ঠিক রাস্তার ধারেই শোয়ানো হয়েছিল ওকে।

সার বেঁধে ধান নিয়ে আসছে কৃষকেরা। তার মধ্যে মেয়েরাও যোগ দিয়েছে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। গাছের ডালগুলো আলোয় লাল দেখায়। ওই দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে লখীন্দর। ওর ভালো লাগে।

কী অদ্ভুত মিষ্টি শব্দ ওই ধানশীষের। চলার তালে তালে নড়ে নড়ে এক আশ্চর্য শব্দ হয়, লখীন্দর কান পেতে শোনে।

ধান আসছে, ধান আসছে।

ধান আসছে সার বেঁধে। ধান গাঁয়ে ঢুকছে।

লখীন্দর আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

আট

গোবিন্দ মিত্রের মা মারা গেল। ওর অসুখটা দুদিনের মধ্যে অত্যন্ত গুরুতর হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম দুদিন প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলো, তৃতীয় দিন সম্পূর্ণ ভাবে চেতনা ফিরে আসে। সারাদিন ও সমানে মালতীর সংগে কথা বলেছে। কিন্তু ওর জীবনের যা আশা সেটা পূরণ হতে পেরেছে। সেদিন সন্ধ্যেবেলা গোবিন্দ এসে ওর সংগে দেখা করেছে, সারা রাত অল্প-বিস্তর কথা বলেছে, তারপর শেষ রাত্রে মারা যাবার পর লোকজন ডেকে পুড়িয়ে আবার উধাও হয়েছে। কাজেই মতির যা বাসনা, ছেলের হাতে মুখাগ্নি পাওয়া, সেটা পূর্ণ হয়েছে।

প্রথম দিন অজ্ঞান হওয়ার আগে পর্যন্ত মালতীকে বলেছে মতি: 'দেখ মা, আমার জন্যে এত কষ্ট করবি কেনে, মা। আমার কুনু আক্ষেপ নাই। গোবিন্দ ঠিক একবার এসবে, তুই দেখবি। আর যদি সে নাও এসে, থালে আমার কুনু রাগ নাই। সে আমার সুখে থাউ।'

তৃতীয় দিন জ্ঞান ফিরে আসবার পর মালতীর মনে হল, মতি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে এসেছে। দেওয়ালে একটা বালিশ ঠেস দিয়ে বসালো ওকে। সকাল বেলা সাবু তৈরী করে খাওয়ালো, পাড়া থেকে দুধ এনে দিলো একটু।

'যদি গোবিন্দ নাই এসে ত পাড়া-পিতিবাসীকে ডেকে চিতায় দেউ যেন।' একটু থেমে বললে, 'মরবার সময় তুই যে এই করলি আমার ত তোকে আশীব্বাদ করলম, মা।' আশীব্বাদ করলম তুই সুখী হবি।'

মালতী বুঝ্‌তে পারেনি, তাই। নইলে মতির মৃত্যুর লক্ষণ প্রায় সবই দেখা দিয়েছিলো। ওর মুখের ভংগি অত্যন্ত প্রশান্ত; সমস্ত অংগ প্রত্যংগের স্নিগ্ধতা অত্যন্ত পরিষ্কার করে চোখে পড়ে। কেবল মাত্র, বাক্‌শক্তিই ওর সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিল।

'আমাদের বাঁচা আর কিসের জন্যে। ছেলেকে সুখী দেখতে পেলে তার বাড়া আনন্দ মায়ের আর কি আছে। ত আমার মনটা কি বলছে জানু, মালতী, যে উ গোবিন্দ আমার সুখী হবে। তুই দেখবি, দেখবি তুই।'

বিকেলের দিকে মালতীকে বলল মতি, 'মা মালতী, তুই ডেকে আন, ডেকে আন পাড়া-পিতিবাসীকে। বকুলের মাকে ডাকবি, শ্যামের জেঠাকে ডাকবি—। মরবার সময় লোক দেখে মরতে হয়। ত শুন আমার দিদিমাএর কথা, আর ছোট ছেলা ছিল বীরভুইয়ে ই দিকে মর মর হইছে বুড়ি, কিন্তু ছোট ছেলাকে দেখবে। বলে, সব ছেলাকে দেখলম, অকে না দেখলে আমার পাপ কাটবেনি, আর উ ছেলাও সুখী হবেনি। ত সে ছেলাকে দেখে তবেই বুড়ি মরল—'

এই রকম অজস্র আদেশ-উপদেশ করে গল্প শুনিয়ে মালতীকে অস্থির করে তুলল মতি। তারপর যখন গোবিন্দ এল সন্ধ্যের পর, তখন ও একটু হাসল। হাসির ভংগি করল মাত্র। হাসলে যেমন করে ঠোঁট প্রসারিত হয়, চিবুকটা নিচের দিকে ঝুলে পড়ে, সেই রকম হল শুধু। কিন্তু হাসি তো শুধু প্রত্যংগ-বিক্ষেপ নয়, যা দরকার ছিল সেই প্রাণই ছিল না তাতে। গোবিন্দ দেখেই বুঝেছিল।

গোবিন্দ আসতে আর কিছুই করতে পারল না মতি, শুধু ঐ প্রাণহীন হাসি ছাড়া। এমন কি হাত তুলে আশীর্বাদ করতেও পারল না। বললে, 'কাছে মাথাটা লিয়ে আয়, গোবিন্দ।' মাথাটাতে কোন রকমে ডান হাতটা তুলে, বললে, 'তুই এসবি আমি জানতম গোবিন্দ

আমি জানতম। তুই আমার সনার ছেলা। তুই এলি বলে কত আনন্দ যে আমি পেলম। আমি সুখে মরব গোবিন্দ—'

কিছুক্ষণ পরে আবার বললে, 'লোকে তোকে নিন্দা করে। বলে, খুনে। বিশ্বেস করিনি উকথা আমি। তোর মতন ছেলা আবার খুনে হয়। ত আমার কাছে কথা দে গোবিন্দ, তুই আবার বিয়া করবি। এবরে ভাল দেখে বিয়া করবি। গরীবের ঘরের মেয়া লিবি, গোবিন্দ, বড়-লোকের দিকে চাইবিনি—' ছেলে যখন প্রতিশ্রুতি দিলো আবার বিয়ে করবার, তখন ও চুপ করে গেল। ঠোঁট দুটি হাসির মতো করে ছড়িয়ে রইল, বাকি সময়টা।

তারপর, শেষ রাত্রের দিকে মারা গেল ও।

পাড়ার লোকেরা এই মৃত্যু নিয়ে নানা রকম আলোচনা করলে।

'বুড়িটা মরে গেল, আহা। কত কষ্টই না পেলে মরবার সময়।' একজন স্ত্রীলোক বলে। 'বেটাটাই বা কি রকম, দেখ। অর জন্যেই ত বুড়িটা মরল। বুড়ি আশা করে বসেছিল, বেটা পাশ করে এসে দুধে-ভাতে খাওয়াবে, বেটা জজ হবে, মেজিষ্টর হবে, আর উ হবে রাজার মা, তা বেটা পাঁশ পাছুড়ে দিলে মুএ—

তোর বেটার লেতিন করেছে,—' বল্লে আর একজন বুড়ি।

'ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার অমন পাশ করা বেটার মুএ।' বলে তৃতীয় জন আলোচনাটা শেষ করে।

এই আলোচনাটাই চলছিল অন্যত্র, কয়েকজন বুড়ার মধ্যে। একজন তামাক টেনে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে, 'গোবিন্দকে ত দেখলম ছেলেবেলা থেকে, বুদ্ধিমান ছেলে। অর মা ঘুঁটে গুড়াত, ধান ভানত, ত সেই করে পাঠশালে দিল অকে। তা সেইখেনে বিত্তি পেয়ে গোবিন্দ গেল চন্দখানায় পড়তে। তারপর আর অর খবর রাখতমনি। এক রকম ভুলেই গেছলম অর কথা। ত অর

মাকে দেখতম ধান ভান্‌ছে, জ্বালন ভাঙছে। সত্যি-সত্যি দেখতম চিঠি পড়াতে যেত শ্যামের কাছে। ত বুড়ির খুব আশা ছিল, বেটাকে লিয়ে ঘরকন্না করবে, ত অর এই দশা, কোথা রইল বেটা—আর কোথা রইলি তুই—'

'হা—সবই ভগবানের ইচ্ছা, তারই লীলা খেলা সব—আমরা অধম জীব, আমরা কি বুঝব—'

আর একজন ডান হাতের দুটো আঙুল দিয়ে কোমরের দাদ চুলকোচ্ছিল। সে বললে, 'ই টা কিন্তু আশ্চর্য লক্ষণ, বুড়িটা এক দিনের জন্যেও ছেলাটাকে গাল দেয়নি। ছেলাটার কাছ থেকে সে কি পেলে, না সুখ, না চারটি ভাত—তা আমাদের ঘর সংসারে এমনটা যদি হত ছুরি-কাটারি চলত। আমার বড় ছেলাটার কথাই ধর, বাছা আমার অকালে প্রাণটা দিলে, সে কপাল আমার, কপাল—'

বুড়ো সত্যিই বাঁহাত দিয়ে কপালে দুটো ঘা দিলে, গলার স্বর তার ভারী হয়ে এসেছে, 'বাছা দুদিন জ্বর থেকে উঠেছে, ত তখন বের্ষেকাল, জল পড়ছে এথা একবার অথা একবার,—ঘরে আমি ভুগছি, ত অকে জোর করে পাঠালম মজুর খাটতে। সেই যে জ্বর লিয়ে ফিরে এল ত দুদিনে নিমুনা হয়ে আর উঠ্‌লনি।' বুড়ো চোখের জল মুছল।

কিছুক্ষণ কেউ কিছু বলল না, তার পর আবার পুরনো প্রসংগ ফিরে এল।

'থালেই বল, গোবিন্দর মা যে কুন্থু দিন তার ছেলাকে একটা গাল পর্যন্ত দিলনি, তা উকি ভেবেছিল—'

'অমনটি না হলে কি অমন ছেলা হয়—'

'ই তুমি ঠিক কথা বলেছ ভাই। গোবিন্দর মত ছেলার মুখ দেখে লাখ কষ্ট সহ্য করা যায়। যে অমন ছেলার মুখ দেখে মরতে পেরেছে, তার আবার কষ্ট কি। এই দেখ না, এই আট দশখানা গাঁয়ে

গোবিন্দর শত্তুর কে আছে। বলি সারা দিন সারারাত তো সে ঘরে ছিল, পুলিস খবর পেইচে তার? কেউ রা কাড়েনি। এমনই ছেলা।'

'এ কথা তুমি ঠিক বলেছ। গোবিন্দ ধন্যি ছেলা, গোবিন্দর মা ভাগ্যিমানী মেয়েমানুষ।'

গোবিন্দ মিত্রের মায়ের মৃত্যু নিয়ে নানা জনে নানা রকম করে দুঃখ প্রকাশ করেছে। গোবিন্দ এ অঞ্চলের কৃষক-আন্দোলনের কর্মী। তাই এ নিয়ে আলোচনা। গোবিন্দর প্রভাব অঞ্চলের প্রায় সর্বত্র হয়েছে, এবং এই প্রসংগে রাজনীতি, কৃষক আন্দোলনের কথাও উঠেছে। গোবিন্দর মায়ের স্বার্থত্যাগ, সবাইকেই বিস্মিত করেছে। এই অকুণ্ঠ স্বার্থত্যাগ এতদিন কারো চোখে পড়েনি, কিন্তু মৃত্যুর সংগে সংগে সেটা সবারই চোখে পড়ল। সবাই প্রশংসা করল।

এই প্রশংসা সহজভাবে নিতে পারেনি এমনও ছিল কেউ কেউ। সাবিত্রীর স্বামী ধানগাছিয়ার অজয় রায় তার মধ্যে সেরা। গোবিন্দর নামোচ্চারণ নানা কারণে তাঁর কাছে অসহ্য।

এক দিক দিয়ে গোবিন্দ তাঁর আত্মীয়। গোবিন্দ তাঁর সম্পর্কীয় ভায়রা-ভাই। সাবিত্রীর এক পিসতুতো বোনের স্বামী গোবিন্দ। এই সম্পর্কও মধুর হয়নি।

অবশ্য, ব্যক্তিগত সম্পর্ক কারো সংগে মধুর হল বা না হল সে নিয়ে মাথা ঘামান না তিনি। তাঁর সম্মান ধরে টান দিয়েছে গোবিন্দ। গোবিন্দ তাঁর চাষীদের ক্ষেপিয়েছে, তাঁর জমিতে মজুরী করে এমন লোকদের নাচিয়েছে। যদিও কোনবারই কিছু করতে পারেনি সে, তবু এসব ব্যাপার চাপা-আগুনের মতোই, কোথায় কখন জ্বলে উঠবে ঠিক নেই।

আর সেটা গোবিন্দের দ্বারাই হবে তা তিনি ভাল ভাবেই জানেন।

একবার তাঁর স্ত্রীকে তিনি বলেছিলেন, 'দেখো, তোমার বোনাইটি একটি ধনুর্ধর। এই অঞ্চলের প্রত্যেকটি লোক তাকে দেবতার মত ভক্তি করে। অথচ তার না আছে চাল না চুলো। শুধু বুলি শিখেছেন কতকগুলি: জোতদার ঠেঙাও, জমিদার খতম করো—' ঠেঙাও আর খতম কর কথা দুটোর ওপর অদ্ভুতভাবে জোর দেন অজয়, গলার স্বরটাকে টেনে টেনে অস্বাভাবিক করেন, 'তা ওই শুনেই কেঁচোর দল কিলবিল করে ওঠে, অবিশ্যি একটা বুটের থেঁতলানি সয় না, তবুও—' অজয় দীর্ঘ নিঃশ্বাস চেপে খানিকটে করুণা মিশ্রিত স্বরে বলেন, 'অথচ মজা দেখো, ওই কেঁচোগুলোই ঠ্যাঙানি খাবে, সর্বস্বান্ত হবে তবু গোবিন্দর বোল ছাড়বে না—'

সেই গোবিন্দ বলতে গেলে দুদিন বাড়িতে ছিলো। এই দুদিনের মধ্যে কত কি করা যেতে পারত। কিন্তু পুলিসকেও খবর দেওয়া হয়নি।

হরি মণ্ডলকে ডেকে ধমকায় অজয় ''কই, তোমার লোকজন কই! এক রাত্রি একদিন বাড়িতে ছিল গোবিন্দ, তার মধ্যে তোমার কোনো লোকই খবর দিতে পারল না একটা।'

হরি মণ্ডল সম্পর্কে তার মামাশ্বশুর। কিন্তু কখনো তিনি কোনো সম্বোধন করে ডাকতেন না। কথা বলবার দরকার হলে সোজাসুজি তিনি কথাটাই পাড়তেন, সম্বোধন করার দরকার হত না। অথচ হরি সব সময়ই তাঁকে আপনি বলে কথা বলত।

সে বললে, 'না হাঁক ডাক করে ভালোই হয়েছে, বাবাজী। ওই লোকদিকে যদি ডাকতম ত হয়ত বলত, একটা লোক মরে যাচ্ছে, ই সময়টা কি উ সব করা ভাল হত? ধম্ম-অধম্ম নাই। তার চেয়ে এ রকম কত সময় আসবে বাবা, একটু সবুর করা ভাল। মাছ না হয় জাল থেকে পালিছে, তাই বলে পুকুর ছেড়ে যাবে কি করে।'

একটি ভোঁতা গোল গাল হাসি হরির মুখে ছেয়ে থাকে। এমনিতে অজয়ের সংগে ওর কথা বলার সাহস নেই। অজয়ও প্রায় অন্য দিকে তাকিয়ে ওর সংগে কথা বলবে। কিন্তু কথা একবার শুরু হলে আস্তে আস্তে ওর সাহস ফিরে আসতে থাকে, তারপর এক সময় বরঞ্চ অজয়কে নরম-ভংগীতে কথাবার্তা চালাতে হয়।

'তোমার লোকজনের এই রকম ধম্মাধম্মের জ্ঞান থাকলেই হয়েছে আর কি—' অজয় কেমন একটা তাচ্ছিল্য আর হতাশার ভাব দেখায়। আর ব্যাপারটা সত্যি বলে খানিকটে বিব্রত বোধ করে, 'দরকারের সময় যাদের পাওয়া যায় না, সে সব লোক বাতিল করতে হবে—' কাট-ছাঁট সোজা কথায় ব্যাপারটা শেষ করাই তাঁর ইচ্ছে, যত কম কথা বলে মামাশ্বশুরকে বিদেয় দেওয়া যায়, সেটা তাঁর লক্ষ্য।

হরি আরও নরম ভংগিতে কথা বলে, অবশ্যি কথাগুলো সরল বলে তার জোর আরও বেশি। শেষ পর্যন্ত যাতে নিজের যুক্তি পরামর্শ কাজে লাগে, সেটাই ওর উদ্দেশ্য।

সে বলে, 'আমি বলি, বাবাজী এমন ভাবে ব্যবস্থাটা করুন যাতে সব কুলই বজায় হয়। এই ধরুন গে, আমাদের দীনুর কথা, ও লোক তো আমাদের বাঁধা গোলাম। তা কেনে এমনটি হল? না উ আমাদের প্রজা, ওর বাস্তুটা বাঁধা আমাদের কাছে, তার উপর মাঝে সাঝে অনুগ্রহ পায়, দুটা ভোজ পায়। এর চেয়ে আর বাঁধবার উপায় কী আছে? ত মানুষকে এই রকম করে বাঁধতে হয়, আস্তে আস্তে মেরুদণ্ডটা ভেঙে দিতে হয়, বাইরে থিকে মনে হবে উ ঠিক আছে, কিন্তু আসলে ফোঁপরা, সব ফোঁপরা—'

দুটো হাতের আঙুলগুলো দিয়ে অদ্ভুত এক ভংগি করে হরি মণ্ডল।

অজয়ের চোখ দুটো পিটপিট করে। যতটা খাড়া থাকবে

প্রথমটা ঠিক করেছিলেন, অতটা থাকা যায় না। এই সব ব্যাপারে অসাধারণ বুদ্ধি হরির। আর পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে মানুষকে এমন জড়িয়ে ফেলবে যে খোলা শক্ত। আর এই রকম কাজ করতে ও ওস্তাদ।

'আচ্ছা, তাই হবে। তা তুমি একটু দেখো ব্যাপারটা।'

এর বেশি কথা আর আসে না, বলতেও চান না অজয়। যত তাড়াতাড়ি লোকটাকে কাছ থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় ততই ভালো।

কাঠের তৈরী জানালা দিয়ে বাইরে তাকান অজয়। গ্রাম পেরিয়ে মাঠের দিকে দৃষ্টি চলে যায়। সবুজ মাঠ, তার একদিকে সার বেঁধে তাল-বন। এক ঝাঁক চিল পাক খাচ্ছে আকাশে।

ছেলেবেলায় গ্রামকে তাঁর মনে হতো শান্ত লক্ষ্মী মেয়ের মতো। এখন তার মধ্যে প্রাণের সাড়া দেখতে পান। সে-প্রাণ এমনি বোঝা যায় না, তার গতি কুটিল, দুর্ধর্ষ, তার ভিতর চক্রান্ত আছে, যুদ্ধ আছে, আবার সম্ভাবনাও আছে।

নতুন এক কর্তব্যের তাগিদ অনুভব করেন। ঠিক তাও নয়, দায়িত্বও বটে। এই গ্রামের জীবনে নতুন যুগের সম্ভাবনা এসে গেছে। অজয়ের মনে হয়, তিনিই সেই যুগকে চিনবেন ভালো করে, তার ওপর প্রভুত্ব করবেন। কিন্তু বড়ো শক্ত সেই কাজ।

সে পথে বাধা হচ্ছে গোবিন্দ। আর তাঁর সহায় হচ্ছে হরি। এরা দুজনেই তাঁর আত্মীয়, তবু দুজনকেই ঘৃণা করতে হয় তাঁর।

ভেবে হাসেন অজয়। যে-পথে তিনি চলেছেন, সে-পথে
। তাঁকে ছাড়া আর কাউকে সেখানে পাওয়া যাবে
পথের মাঝখানকার জিনিস। দুদিন বাদে ওদের কোনো
া। কিন্তু তবু মাঝে মাঝে তাঁর জীবন দুর্বিসহ হয়ে
গোবিন্দ আর হরিকে নিয়েই তাঁর মর্ম যন্ত্রণা।

হরি এসেছিলো টাকার মহাজন হয়ে। ও এখন ফেঁপে ফুলে গিয়েছে। ওকে সাহায্য করেছেন তিনি, কিন্তু জড়িয়ে পড়েছেন, হরিকে ছাড়া তাঁর চলবেই না। এসব তিনি কাটিয়ে উঠতে পারবেন, কিন্তু মাঝে মাঝে গায়ত্রীর জন্যে তাঁর বুকটা কোথায় যেন ব্যথা ব্যথা করে। গায়ত্রীকে কুমারী অবস্থায় নষ্ট করেছিলো হরি। সেদিন খুন করতে চেয়েছিলেন তিনি হরিকে, কিন্তু পারেননি। আশ্চর্য লোক হরি, বাইরে কত মেয়েকে যে ও টেনেছে তার সংখ্যা নেই। কিন্তু তাই বলে নিজের ভাগনীর সম্পর্কীয় বোনকে···ছিঃ। কিন্তু গায়ত্রীর জীবন নষ্ট হয়ে গেল। তাঁর নিজের দোষই হয়ত বেশি। গায়ত্রীকে না জেনে বিয়ে করেছিলো গোবিন্দ, কিন্তু ক্ষমা করেছিলো তাকে। ওরা হয়তো সুখেই ছিলো, কিন্তু নিজের কাজে তাকে লাগিয়েছিলেন, গোবিন্দর রাজনীতিক গতিবিধির গুপ্ত খবর দিতে। পারল না মেয়েটা। গোবিন্দ তাকে খুন করে ফেলল।

অজয় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়েন।

নয়

অজয় চুপ করে জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিলেন। দোতালার কোণের দিকে এই ঘরটা তাঁর খুব প্রিয়, আর পুবদিকের এই জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে তিনি ভালো বাসেন।

বাড়ির একটা চাকরানী এসে খবর দিলে, 'মা একবার ডাকছে আপনাকে। আপনি এসে একবার শুনে যাও—' মেয়েটার বয়েস হয়েছে, বোধহয় প্রৌঢ়াই হবে। চাকরানী গিরি করে কাটিয়েছে অনেক দিন, তবু অত ছোট অজয়কে দেখে সে ঘোমটা টেনে দাঁড়াবে। বাঁ-দিকে মুখটা বাঁকানো, কোনরকমে জাবুথাবু হয়ে উচ্চারণ করলে কথাটা।

'কেন, এ ঘরটা ত সদর-মহল নয়, এখানে তো তিনিই আস্‌তে পারেন,' স্ত্রীর সংগে দেখা করতে হবে এটাতে বিরক্ত হয়ে ওঠেন তিনি, সেই বিরক্তি গিয়ে পড়ে ওই চাকরানীটার ওপর। কিন্তু অত ছোট মানুষের ওপর রাগ দেখানো তাঁর অভ্যাস নয়, তাই সামলে বলেন, 'আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।' জানালাটা দিয়ে আর একবার বাইরে তাকিয়ে নেন তিনি। তাঁর ভালো লাগে ওই মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকতে। তাকালেই তাঁর মন যেন বলে ওঠে, এসব আমার, এসব আমার। ম্যাট্রিক পাশ করার পর, দু-চার মাসের জন্যে কলেজ করতে গিয়েছিলেন তিনি কলকাতায়। পুজোর সময় ফিরে এসে আর যাননি। বাবাকে বলেছিলেন, ও আমার দ্বারায় হবে না, আমি চাষীর ছেলে, চাষই দেখব। সেই থেকে গ্রামে আছেন,

সমস্ত জমি রেখেছেন নিজের হাতে, নতুন জমি কিনছেন, কিন্তু প্রজা বসাননি। সেই জমি চাষ করান, হয় ভাগে, নয়তো মজুর লাগিয়ে। নিজে দেখা শোনা করেন সব কিছু।

বাড়িটা তাঁর নিজের করা। পাকা-বাড়ি তাঁর পছন্দ নয়। পুরনো আমলের বাড়িও না, নতুন ফ্যাসানওয়ালাও নয়! তিনি বলেন, পুরনো ভারী ভারী ওই বাড়িগুলো দেখলেই আমার কেমন বুড়ো বুড়ো মনে হয়, আর নতুন ফ্যাসানগুলো দেখতে শুনতে মন্দ নয়. কিন্তু ও যেন ফুর্তির প্রাণ গড়ের মাট। তাঁর পছন্দ টিনের বাড়ি, শক্ত কাঠের খুঁটি, বেড়ার দেওয়াল। এর মধ্যে বিলাসিতা নেই, কিন্তু কর্মঠতার পরিচয় আছে—এই হচ্ছে তাঁর মত।

সেই ঘরের পুবদিকের দোতলার একটি জানালা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়, সেই ঘরটাই তাঁর শোবার। তাঁর ভালো লাগে তার সম্পদ, ওই মাঠের দিকে তাকিয়ে, মাঠের মধ্যে কাজ করে, কাজ করিয়ে আনন্দ পেতে পারেন তিনি।

দোতলারই আর একটা ঘরে সাবিত্রী ছিলো। উত্তর দিকের দেয়ালটাতে দুদিকে দুটো জানালা, তার মাঝখানটাতে তক্তপোষের ওপর কাপড়-চোপড় মুড়ি দিয়ে বসে আছে সাবিত্রী, দেয়ালে ঠেশ দিয়ে। অজয় ওর সামনে এগিয়ে গিয়ে জানালার ধারে চৌকিটা টেনে নিয়ে বসলেন।

সাবিত্রী ডান দিকে মাথাটা একটু বাঁকিয়ে বললে, 'সামনে এসে বসনা একটু, ঘুরে বসতে কষ্ট হবে আমার।'

অজয় কোন কথা বললেন না, আস্তে আস্তে চৌকিটাকে আবার সরিয়ে এনে বসলেন।

'বিছানায় একটু উঠে বোসো না, আমার অসুখটা আজ বেড়েছে, জ্বরও হয়েছে একটু—' অজয় বুঝল না, অসুখ বাড়া আর বিছানায়

উঠে বসার সংগে কী সম্পর্ক আছে, তবু বিছানায় উঠে একটা কোণের দিকে চুপ করে অপেক্ষা করে রইল।

সাবিত্রী জানে, মরে গেলেও অজয় দুটো ভালো মন্দ কথা আগে জিজ্ঞেস করবে না, তাই ও বলে, 'কেমন আছ তুমি ?'

অজয়ের দুটো ঠোঁটে অত্যন্ত ধারালো একটা হাসি ফুটে ওঠে, কিন্তু সেটা চেপে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সাবিত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকে অজয়।

সাবিত্রী বলে, 'অমন করে চেয়ো না, ওটি আমি সহ্য করতে পারিনি। তুমি আমাকে একটুও ভালোবাস না, একটুও না—' সাবিত্রী ফোঁপাতে শুরু করে।

অজয় জানে, এটা হচ্ছে ওর ভূমিকা। একটা কোনো কিছু ওর বক্তব্য আছে, সেটা যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ চুপ করে থাক্‌তে হবে। তারপর কোন একটা মতামত দিলেই চলে যাবে। আশ্চর্য স্বার্থপর মেয়েটা, নিজের কথা ছাড়া কারো কথাই ও চিন্তা করবে না। আর নিজের দুঃখকেই যারা সব চেয়ে বড় করে দেখবে, তাদের কি বলা যেতে পারে। তাই তিনি চুপ করে থাকেন। 'একদিন তুমি আমাকে যখন বিয়ে করেছিলে, তখন বলেছিলে, আমি লক্ষ্মী, আমার জন্যেই তোমার অত উন্নতি হচ্ছে কিন্তু এখন আমার এই অসুখ, আমি এতটুকু কিছু মুখে তুলতে পারিনে, তো তুমি একবার জিজ্ঞেসও কর না, কেমন আছি। কপাল আমার কপাল—'

আঁচল দিয়ে চোখ মুখ নাক মুছল সাবিত্রী, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললে, 'আমি জানি, এখন তোমার কোন কাজেই লাগব না আমি, তবু মানুষের দয়ামায়া বলে তো আছে। লোকে কুকুর বেড়ালেরও একটা তদারক করে। তো আমি কি কুকুর বেড়ালেরও অধম!' একটা দুরন্ত কান্নার বেগ কোনো রকমে দমন করে সাবিত্রী। তারপর বলতে শুরু করে, 'মামা বলছিল—'

অজয় থামান ওকে। 'তোমার নিজের কথা বল। আবার মামার কথা কেন?'

অভিমানে ফুলে ওঠে সাবিত্রী। ও ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, 'কেন বলব না, সবার কথা বলব। সবাইকে তুমি আমার মত ঘেন্না কর। সবাইকে ঠিক নয় যতক্ষণ লোক তোমার কাজে লাগে, ততক্ষণই তুমি তাকে আদর কর, তারপর পায়ে ঠেলে ফেলে দাও।'

'সেটা সত্যি।'

'সত্যি? লজ্জা করে না তোমার ওকথা বলতে? একদিন মামাকে আমি আনিয়েছিলুম বলে তুমি বেঁচে গেছলে। তখন আমাদের দুজনেরই দাম ছিল। মামার টাকার জোরেই না তোমার সেই মকদ্দমাটা মিটল। তারপর তুমি যে এত জমি করেছ সে কার জন্যে? মহাজনি করেই মামা তো চাষীদের তোমার পায়ে এনে ফেলে, ঋণের দায়ে সে চাষী পথ খুজে পায় না। তারপর তুমি জমিটা গ্রাস কর। বল, বল দিকিন, সত্যি কিনা।'

'তোমার শরীর আরো খারাপ হবে, তুমি চুপ কর একটু। রাগ করলে উত্তেজিত হলে তুমি ভেঙে পড়বে।'

সাবিত্রী হাপিয়ে উঠেছিল! চোখগুলো বড়-বড় হয়েছিলো বলে তাই আরো শাদা দেখাচ্ছিল। অজয় ওকে শুইয়ে দিয়ে চোখে মুখে জল দিলেন একটু। কিছুক্ষণ নিঃঝুম হয়ে পড়ে রইলো সাবিত্রী তারপর খানিকটে সামলে নিলে।

অজয় বললেন, 'তুকি ঠিক বলেছ। এইবার থেকে তোমাদের সাহায্য আর নেব না, নিজেই দাঁড়াতে চেষ্টা করব। অন্যের সাহায্যের ঝামেলা অনেক, নিজেকে ছোট হতে হয় অনেকখানি—'

সাবিত্রী চোখ বুজে ছিল। চোখ বুজেই হাত নেড়ে থামাল ওকে। অত্যন্ত আস্তে আস্তে বললে, 'অতি নিষ্ঠুর মানুষ তুমি। তোমাকে

দেখলে আমার ঘেন্না হয়। কাজ ছাড়া কিছু জান না, তোমার কাজের জন্যে যে কাউকে তুমি মেরে ফেলতে পার। আমার অমন বোন গায়ত্রী, তারে কে অমন সর্বনাশটি করলে? সে তোমার জন্যেই তো মারা গেল। ছিঃ ছিঃ। লোকে বলে, মেয়েটার চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছল তাই মেরেছে। কিন্তু সে-কথাত সত্যি নয়। গোবিন্দ সে কথা জানবার পেরেও তাকে কিছু বলেনি। নিজে তাকে লেখা-পড়া শিখাবার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। কিন্তু শুধু তোমার জন্যেই বাছা আমার প্রাণটা হারাল, শুধু তোমার জন্যে।'

কথাটার মধ্যে সত্য ছিল বলে অজয় এতবড় অপমানটা সহ্য করে নিলেন। আস্তে আস্তে বললেন তাঁর কথাটা, নিজে যেন চিন্তা করতে করতে বলছেন, 'তোমার বোনের জন্যে আমারও কষ্ট হয়। কেবল তাকেই আমি কিছু দিতে পারিনি, তার কাছ থেকে নিয়েছি শুধু, সেইটেই আমার লাগে।'

ওরা দুজনেই এরপর চুপ করে থাকে। তারপর অজয় বলেন, 'কিন্তু তোমার আসল কথাটা কী বল দেখি, কী জন্যে ডেকেছিলে।'

সাবিত্রী উঠে বসল। তারপর স্বামীর পায়ে ধরে বললে, 'ওগো, আমাকে একটু ভালো করে দাও না। আমি আর কিছুই চাইনে। তোমার ঘরের দাসী বাঁদী করে রেখো না হয়, কিন্তু আমাকে ভাল করে দাও।'

'কিন্তু অমন করে বেঁচে তোমার কী হবে। বাঁচাটাই কী সব। দাসী বাঁদী হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া যে ভালো।'

সাবিত্রী এক মুহূর্ত ইতস্তত করে, তারপর বললে, 'তবে শোন, তুমি আমার দিকে আর ফিরে চাও না, সে শুধু আমার এই অসুখ বলে। আমি মেয়েমানুষ, আমার স্বাস্থ্য নাই, আমার রূপ নষ্ট হয়ে গেছে, কী করে আমি তোমায় ধরে রাখব। তোমার এত সম্পদ, কিন্তু আমার কোন কিছু নাই, কিছু না—'

অজয় বিস্মিত হয় সাবিত্রীর কথা শুনে। কিন্তু তবুও বলে, 'কেন, এত সব আমার আছে, সেগুলো কী তোমার নয়?'

'না, না, কিছুই না, কিছুই আমার নয়। সব তোমার, তুমি যেদিন আমার হাতের মধ্যে থাকবে, সেদিন আমার সব—'

'তাই বলো, নিজের কথাটাই বলো—কী ভীষণ নীচ তুমি!'

'হ্যাঁ, তাই, আমি নীচ, আমি স্বার্থপর, তবু আমাকে ভালো করে দাও, তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি, আমাকে ভালো করে দাও।'

অজয়ের একবার মনে হয়, পায়ের কাছে তালগোল পাকানো ওই কংকালটাকে লাথি মেরে চলে যায়। তাঁর স্ত্রী যে এত কাঙাল তা তিনি এর আগে ভাবতেই পারেননি। কিন্তু অত নীচকে কি করে শাস্তি দেবেন তিনি। তাই বলেন, 'বল কি করতে হবে। তোমার জন্যে করিনি এমন কিছুই তো নাই। পাঁচ বছর ধরে ডাক্তার কবিরাজ দেখানোর তো ত্রুটি হয়নি। কলকাতাতেও তো তোমাকে রেখেছিলাম দুবছর—'

'আমি একটি মংগল-যজ্ঞ করতে চাই। ঝাঁকরার শিব-মন্দিরের পূজারী ঠাকুরকে দিয়ে সেই যজ্ঞ করাব।'

কৃষ্ণমোহন ঠাকুরের নামে ছলাৎ করে মাথায় রক্ত ওঠে অজয়ের। এই লোকটাকে দেখতে পারেন না তিনি। তবু অবিচলিত থেকে তিনি বলেন, 'যজ্ঞ তুমি কোরো, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু কৃষ্ট ভট্টাচার্যকে দিয়ে নয়, অন্য যে কোন বামুনকে দিয়ে কোরো, তাহলেই চলবে। জানো তো ঐ ভটচাজের সংগে আমার সদ্ভাব নেই।'

'তুমি শুধু তোমার কথাই ভাবছ। আমার কথা একটুও নয়, একটুও নয়।'

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলে ধীরে সুস্থে আচরণ করেন অজয়। আস্তে আস্তে

তিনি পাটা সরিয়ে নিলেন, তারপর তক্তপোষ থেকে নেমে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

ইতিমধ্যে শ্যামগঞ্জের ধান তোলার ঘটনাটা ঘটে। ব্যাপারটা তাঁর কাছে অত্যন্ত জরুরী। কী যে করবেন ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না। সেদিন বিকেলে এই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, এমন সময় হরি এসে সেই পুরোনো কথা পাড়লে। সাবিত্রীর মংগল যজ্ঞের কথা। প্রথমটা অত্যন্ত চটে গেলেও পরে তাঁর মাথায় একটা পরিকল্পনা আসে, তাই তিনি রাজী হয়ে যান।···

হার অজয়ের মনের অশান্তির খবর রাখত না। শ্যামগঞ্জের ব্যাপারটা তার কাছে সাধারণ ঘটনা। তাই সে এসে বললে, 'সাবিত্রী যদি একটা কিছু করতেই চায় ত তার এই ইচ্ছাটা আর অপূরণ থাকে কেনে। আমি বলি বাবাজী, তার জন্মে তো সব কিছুই করলে, তো এটা আর বাকী রেখে লাভ নাই।'

ওদের সাহস দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন অজয়। অথচ কিছু বলতেও পারছিলেন না। মামা-ভাগনীতে মিলে ওরা জল্পনা-কল্পনা করবে, তারপর সেটা কাজে পরিণত করবার বেলায় ডাক পড়বে তাঁর। এ দায়িত্ব আশ্চর্য লাগে তাঁর কাছে। তিনি জানেন, যে-কাজ ভাল লাগে সে-কাজের জন্যে কষ্ট সহ্য করা যায়, কিন্তু তার বাইরে সব বোঝা। কিন্তু ফেলে দেওয়া যায় না এই বোঝা, যদি কোনো কিছু বলো, তাহলে সমস্ত সমাজ তোমায় চেপে ধরবে। তোমার কাজ শুদ্ধ পণ্ড করবে। আশ্চর্য।

ধীরভাবে বলেন অজয়, 'কিন্তু আমি তো বলেছি, অন্য যেকোন ব্রাহ্মণ দিয়েই তো সে-কাজটা চলে—'

'তুমি ভুল বুঝছ, বাবাজী—'হাসিতে মোলায়েম হয়ে পড়ে হরি, 'যার যেরকম বিশ্বাস। মা সাবিত্রীর ইচ্ছে কিষ্ট ঠাকুরকে

দিয়ে পূজাটা করবে, তুমি আমি কী বলব তার। তাছাড়া উনি শিক্ষিত ব্রাহ্মণ—'

এযুক্তি অজয় বোঝেন না। যজ্ঞ করলে যদি কোন ফল থাকে তাহলে যে কেউ করুক না কেন, তার ফল হবেই।—তাছাড়া, ঐ একজনই শিক্ষিত ব্রাহ্মণ আছে, আর নেই?

'তুমি কেনে ভাবছ বাবজী, সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি শুধু একবার আমার মায়ের দিকে মুখ তুলে চাও—বাছা কি কষ্ট পাচ্ছে, আহা! তোমার নিজের একটা মান-সম্মানের কথা আছে জানি। ত আমার কথাই ধর, ঐ বামুন আমায় অপমান করেছিল সেদিন মন্দিরে। কিন্তু কি করব, মায়ের জন্ম আমার তাও ভুলতে হচ্ছে?'

দুর্বল জায়গা দেখে দেখে ঘা দেবে হরি। এতদিন ও তাই করে এসেছে। অজয়ের অনেক দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে তাঁর ওপর খানিকটে দখল নিয়েছে হরি। আর ওকে বাড়তে দেওয়া যায় না।

'এই সংসার অতি কঠিন ঠাঁই, বাবাজী। এখেনে অনেক কিছু সহ্য সামাই করে লিতে হয়। তবেই চলে।'

অজয়ের মনে হঠাৎ একটা কথা আসে। তাই চটে ওঠার বদলে তিনি রাজী হয়ে যান। 'বেশ তাই হবে। একবার তাঁকে আমার সংগে দেখা করতে বোলো।'

মনে মনে তিনি বলেন, 'ওই কৃষ্ণ ভটচার্যকে দিয়েই শ্যামগঞ্জের ব্যাপারটা হাত করব।' আর এই ভেবে তিনি সান্ত্বনা পান যে হরির ওপরেও তিনি টেক্কা দিতে পারবেন। ব্যবহার করতেও পারবেন কৃষ্ণমোহনকে।

কৃষ্ণমোহন এ-অঞ্চলে নতুন লোক। বিয়াল্লিশের কংগ্রেসী-আন্দোলনের সময় তিনি জেলে গিয়েছিলেন। ভদ্রলোক শিক্ষিত, কলেজ পর্যন্ত

গিয়েছিলেন পড়াশুনো করতে কিন্তু এগোতে পারেননি। অদ্ভুত বিনয়ী লোক, তৃণাদপি ক্ষুদ্র লোককেও নিজের থেকে সম্মানিত মনে করতে হবে, এই তাঁর ধারণা।

এই অঞ্চলে এসেই তিনি চাষীদের ক্ষেপিয়েছিলেন শীরসার জমিদারের বিরুদ্ধে। ব্যাগার দেবে না তারা। তা সে-নিয়ে অজয়ের কিছু করার ছিল না, ব্যাপারটা প্রত্যক্ষভাবে তার স্বার্থ-সংশ্লিষ্টও নয়। তবু সাবধান হতে হয়েছিলো তাঁকে কারণ আগুন যে ঘরেই লাগুক সে আগুন তো আর জাতের বিচার করে না। কিন্তু সে কথা নয়, ঐ লোকটি এসেছিলো তাঁর কাছে মন্দির সংস্কারের প্রস্তাব নিয়ে। ক্ষীরপাই আর চন্দ্রকোণার মধ্যে অজস্র ভাঙা বহু প্রাচীন আমলের মন্দির পড়ে রয়েছে, সেগুলোকে সংস্কার করে, জনসাধারণের সুবিধে করে দেওয়ার কথা বলেছিলেন তিনি।

'এ সব মন্দির দেবালয় তো সব আপনাদের পূর্বপুরুষদেরই কীর্তি। তাঁরা আনন্দ কাকে বলে তা জানতেন, তাই সেই আনন্দকে সবার করে দিয়েছিলেন। আনন্দ কখনো তো একলার হতে পারে না, আপনি এই কাজে লাগুন। সমস্ত কাজটা করে উঠবার ক্ষমতা হয় তো একজনের নেই, কিন্তু দেখাদেখি অনেকেই কাজে নামতে পারে। শীরসার বাবুরা আছেন, সরকার আছেন। আপনিই তার পথ দেখান—'

অজয় প্রথমটা কিছু বললেন না, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু দিন আগেও তো শীরসার জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রজা ক্ষেপিয়েছেন, তো তাদেরই দুয়োরে হাত পাততে লজ্জা হয় না ?'

কোন রকম অপ্রতিভ না হয়ে জবাব দিয়েছিলেন ভট্টাচার্য, 'বিরুদ্ধে কেন বলছেন। ব্যাগার দেওয়া যেমন অন্যায়, নেওয়াও তেমনি। সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে গিয়েছিলুম, অন্যায়কারীকে বাঁচাবার জন্যে।

সেটা মেনে নিলে ওঁরা ভালই করতেন। এই দেখুন, আপনার কাছে এলাম মন্দিরের ব্যাপার নিয়ে, তা সমস্ত লোক যদি এর থেকে আনন্দ পায়, তার চেয়ে আনন্দ কি আপনার হতে পারে ?'

'তা লোকে যদি আমার ঘরে আগুন লাগিয়ে আনন্দ পায়, আমাকেও তাই পেতে হবে ?'

'নিশ্চয়ই। সে আনন্দ একদিন পরিশুদ্ধ হবেই হবে, শুধু অপেক্ষা করে থাকতে হয়।'

'থাক। কোন রকম অপেক্ষা করার প্রয়োজন আমার নেই। ওই পরিশুদ্ধ আনন্দেরও নয়।'

ভট্টাচার্যর মুখে যে হাসিটা ছিলো আলতো ভাবে লেগে, সে হাসিটা ক্রমশ পরিস্ফুট হয়, সারা মুখে ঢেকে ফেলে। ভট্টাচার্য বলেন, 'ব্যাপারটা আপনি বুঝতে পারছেন না।' একটু থেমে ছোট্ট একটু চিন্তা করেন, তারপর বলেন, 'কিন্তু বুঝতে আপনাকে হবেই। নইলে কাজ হবে না। তাই যতক্ষণ না বোঝেন ততক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে। তাড়িয়ে না দিলে যাব না।'

এ কি রকম ধরনের ব্যাপার? এতখানি অবজ্ঞার সামনে এ হাসি আসে কোথা থেকে? যেন সে হাসি আঘাত করতে চায়, অবজ্ঞা করতে চায়। তাছাড়া, কেমন ধরনের লোক ঐ ভট্টাচার্য, এতটুকু পৌরুষ নেই ওর।

'হ্যাঁ, তাড়িয়েই দিলাম। যদি এমনি না যান, তো লোক দিয়ে খেদাব।'

'বেশ, আমি এখন গেলাম। কিন্তু আপনার ভূল একদিন বুঝতেই হবে, ততদিন অপেক্ষা করে থাকব।'

হেসেছিলেন অজয়। অট্টহাস্য ছুঁড়ে মেরেছিলেন লোকটার ওপর, তার এই কথা চাপা দিয়েছিলেন।

সেই কৃষ্ণমোহনকে আজ নতুন করে চিন্‌তে হচ্ছে। তার সংগে আজ নতুন করে ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু তার প্রয়োজন এসেছে এটাই হবে সব চেয়ে বড় কথা, তার বেশি নেই।

সমস্ত যাগযজ্ঞের আয়োজনের পেছনে অজয়ের দৃষ্টি রইলো সজাগ। ও সুযোগ বুঝে বললে, 'দেখুন, শ্যামগঞ্জের ওই ধান-তোলার ব্যাপারটা একটা সুরাহা আপনাকে করতেই হবে। ওরা আপনার অনুগত কাজেই ওদেরকে শান্ত করার ভার আপনি নিন।'

'আমি ঘটনার কথা চিন্তা করছি। কৃষকেরা বল-প্রয়োগ করছে, এটা তাদের অন্যায়। একশো বার। কিন্তু তাদের যা দাবী সেটা তো ন্যায্য।'

'ঠিক তাই। আমিও তাই বলি। মনু দিগার ভাগ চাষের অধিকারই তো চেয়েছিলো, আমি তা স্বীকার করতে রাজী আছি।'

'ব্যস, এরপরে আর কথা নাই। আমি বিশ্বাস করি, কৃষকদের দাবী যারা মেনে নেবে তারই রাজা হবার যোগ্য।'

অজয় ব্যাপারটাকে নিজের দিকে টানতে পারছেন এই ভেবে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন তিনি, কিন্তু তাঁর যা স্বভাব, বেশি আনন্দ হলে বা বেশি ক্রুদ্ধ হলে তিনি ধীরে ধীরে কথা বলেন। বললেন, 'আপনি বোধহয় জানেন, জমিটার দখল নিয়ে শীরসার বাবুদের সংগে আমাদের অনেক দিনের মন কষাকষি। বাইরে থেকে নানারকম ফ্যাকড়া বেরিয়ে জমিটা আমাদের দুজনেরই হাত থেকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম। সেটা তো বাঞ্ছনীয় নয়। আমি বরঞ্চ শীরসার বাবুদের কাছ থেকে জমিটা কিনে নেব, ইতিমধ্যে আপনি চাষীদেরকে আমার প্রস্তাবটা বুঝিয়ে দিন। ওরা যা চেয়েছিলো সেটা পাবে—'

'এতো অতি উত্তম প্রস্তাব। এই রকম বোঝাপাড়ার ওপর দিয়ে

ব্যাপারটা মিটলে তার চেয়ে সুখের বিষয় আর কি হতে পারে আপনারা নিজেদের মধ্যে বিবাদটা মিটিয়ে ফেলুন, আমি চাষীদের বোঝাব।'

অজয় হাসলেন একটু। একসংগে অনেকগুলো দিক সামলেছেন তিনি।

শীরসার জমিদার-বাবুকে লিখলেন, যথাবিহিত শিরোনামা-সম্বোধন ইত্যাদির পর, '...জানেন তো, জমিটার স্বত্ব নিয়ে অনেক গোলমাল আছে। শেষ পর্যন্ত ওটা আমাদের দুজনেরই হাত থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। তাছাড়া চাষীদের মতি-গতি ভাল নয়, প্রমাণটা হাতে হাতে পাওয়া গিয়াছে। এ ক্ষেত্রে, আমি আপনাকে উপযুক্ত দাম দিচ্ছি, আপনি আমার স্বত্ব স্বীকার করে নিন, আমি আপনার যেমন প্রজা আছি তেমনিই রইলাম। আমি উপরন্তু উচ্চহারে খাজনা দিতে রাজী আছি। আপনি এটুকু স্বীকার করে নিলেই বাকীটা আমি সামলাব।'

ঠিক দুদিন বাদে জবাব এল :

'...তুমি অল্প-বয়স্ক, বিশেষ বোঝ না। আইনের জট কেমন করে ছাড়াতে হয় সে আমি বিলক্ষণ জানি। প্রজা বসানোর কথা আর কেন, যে জন্যে তুমি জমিটার দখল চাচ্ছ, সেটা আমারও লক্ষ্য হতে পারে। জমির কদর আজকাল অতি বেশি রকম, ভায়া।'

অজয় থ' বনে যায়। ডান-হাতটা ক্রমশ মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে।

দশ

হরি মণ্ডলের সংগে সেদিন নবীনের নানারকম কথাবার্তা চলছিল। নবীন হরির অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত। আর সেই জন্যই হরির নিজের বাড়িতে একসংগে মদ খাবার অধিকার সে পেয়েছে। এই ছেলেটির ওপর কি জানি কেন, তার অত্যন্ত মায়া হয়। তার নানাবিধ গুণাবলীর মধ্যে তার কেবল মাত্র একটি গুণই নবীন নিতে পেরেছে, সেটি হল, নারীকে যেন তেন প্রকারেণ ভোগ করা। অবশ্য, যদিও এটাই তার প্রধান বিশেষত্ব, তবু তার মতো নবীন ধূর্ত নয়, নবীন অল্পে হতাশ হয়ে পড়ে। তার মতো টাকা-পয়সা চিনতে পারে না নবীন, শারীরিক শক্তির দিক দিয়েও অনেক পেছনে আছে নবীন, তবু কেমন যেন মায়া বসে গেছে ছোকরার ওপর। বছর পঁচিশ বয়েস হবে, তবু হরির কাছে যেন ও নেহাতই একটি শিশু।

'কি হে নবীন, দিলম ত তোমার চাকরীটা করে। তবে সাবধানে কাজকম্ম কোরো, খাতা লেখার কাজ, এতে দায়িত্ব আছে, একটু ইদিক-উদিক হবার জোটি নাই। তুমি তো ভেবেছিলে হবেনি, কিন্তু আমি হখন বলেছি, তখন উ হবেই হবে। অর কুনু রকম নড়ন-চড়ন নাই।'

নবীন একেবারে গলে পড়ে, 'আমিও কি আর কারও কাছে গেছি। জানি, তুমি ছাড়া আমার গতি নাই। আমি এটা ঠিক ভেবে রেখেছি, যখন কুনু কিছু না পারব, তখন তোমার দুয়ারে এসে পড়ে থাকব। বাস্, যা হয় করবে।'

কথাটা সত্যি। হরি আঙুল দিয়ে ইসারা করলে ওর রাস্তায় বুক পেতে দিতে পারে নবীন। হরি ওর দিকে একবার তাকায়, তারপর আবার হাতের মাটির খুরিটার দিকে। এক চুমুক দেবার পর সেটা নবীনের দিকে এগিয়ে দেয়।

'তারপর, আর কোথাও কিছু জুটালে? কি রকম যুবক হে তোমরা, তোমাদের মতন বয়স যখন আমার ছিল, তখন রাস্তা দিয়ে গেলে মাগি-গুলা হাঁ করে চেয়ে থাকত। ডাকবার শুধু অপেক্ষা—' হরি একটু হাসলে, আবার পাত্রটা ভর্তি করলে একটু, 'বুঝলে নবীন, রাত্রের কথা ছেড়েই দাও, তখন মাঠ পুকুর ঘাটেই চলে, তা কেন, সে বাড়ির উঠানে কাজ করে এসেছি, দিনের বেলা বন-বাদাড় তো রয়েছে—হেঁ—হেঁ—কিন্তু কি করছ তমরা সব।'

নবীনের ঠোঁট দুটো কাঁপে, মুখটা বিবর্ণ হয়ে ওঠে। চোখ নিচু করে মাটি খুঁটরায় ডান পায়ের নখ দিয়ে। কি করবে ভেবে পায় না।

'খুড়া, অমন করে বোলনি। তোমার মতন হতে পারবনি, সে ক্ষমতা আমার নাই। আমাদের অত সাহস নাই। বুঝলে কি খুড়া, ভয় পায় ভীষণ, কি করব, তা নালে কি জানিনি রে বাবু, কটা মেয়ে আর সতী।

'এতদিনে এই কথাটা তাহলে বুঝেছ। কোন শালীই সাচ্চা নয়, সব মুখ বুজে থাকে। তা কোনো গরু দুটা বেশি লাথ ছুঁড়ে, কোনটা বা অল্পেতেই সন্তুষ্টি, কিন্তু একবার যদি ছাঁদতে পার ত দুধ ঢালতে হবে সবাইকে টুঁ টুঁ —'

বলে হরি একবার থামে, হয়তো তার পূর্ব-অভিজ্ঞতার কথাগুলো চোখের সামনে ঝিলিক মারে একবার। কিছুক্ষণ আত্মস্থ থাকবার পর বলে, 'যাক গে, তোমার কী খবর বলো? কিছু হল নাকি?'

'সেই কথাই বলছিলম, আমাদের আমখেড়ে গ্রামেই হল ঘটনাটা।

গেছলম সামন্তদের ঘর, ওই বিষ্টু সামন্ত, অদের ঝাঁকরার ধানের চালানী ব্যবসা আছে, ত সে ঘরে তখন কেউ নাই। নূতন বিধবা ঝিটা আছে। নানা-রকম কথা শুনালে, গল্প করলে বসে বসে। আমি যত আস্‌তে চাই, তত বলে, ব'স না বাপু, কী অত কাজ। ত আমি একবার উঠেই পড়লম, ত মেয়েটা হাত ধরে ফেললে, বল্লে, বস বস। ত আমি দিলম সেইখানে ফেলে।'

হরির মুখে একটা হাসি লেগে থাকে আলগা-ভাবে। কোন অভিজ্ঞ প্রাচীনের হাসি। সেই হাসিটা সামানভাবে বজায় রেখে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, শৈশবে নিজের অভিজ্ঞতার কথা। শৈশবে যৌবনে অনেক বড় লোকের বাড়িতে সে চাকরী করেছে। সেখানে বহু সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী বউ-ঝিকে উপভোগ করার সুযোগ সে পেয়েছে। তারাই সুযোগ দিয়েছে নিজে থেকে। তারই অতি রসালো অতি উত্তেজক অতি মারাত্মক কাহিনী হরি ধীরে ধীরে বলে গেল।

হরি থামে তারপর, তার সামনে তারই নিজের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে। মানসিক-উৎকণ্ঠায় সমস্ত মুখটা ওর কী-রকম বিকৃত দেখাচ্ছে। সে কথা বদলায়। তাই বলছিলম, নবীন, শরীরটাকে ভাল কর। তোমার চোখের কোণে কালি পড়ছে, বুঝলে। খাও দাও ভালো করে, বাবু। দেড় সের রসের দুধই খেতে হবে তোমায়। নাহলে শক্তি হবে কী করে। শাস্ত্রে আছে, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। শরীরটা ঠিক কর, ঐটাই হচ্ছে আসল।'

ঠিক তাই। নবীনের মনে হয়, ওই জন্তেই তো ওর ঠিক হরির মতো অতো সুযোগ মেলে না। হয়তো মেয়েদের কাছে সে যথেষ্ট লোভনীয় নয়। একবার যদি শরীরটা ভালো হয়, তাহলে···। একটা তীব্র উত্তেজনা নিয়ে বাড়ি ফেরে নবীন। তার চোখের সামনে তখন এবাড়ি ওবাড়ির দরজা, স্নানের ঘাট আর বারান্দা। সুউচ্চ বক্ষঃস্থল

শুরু নিতম্ব, সলজ্জ তৃষ্ণার্ত চাহনি। এসব তো তারই, তারই জন্যে অপেক্ষা করে আছে। জয় করে নিতে হবে; ধৈর্য ধরে কেড়ে নিতে হবে। কিন্তু তারপরে আর দৃষ্টি চলে না। কোথায় পাবে সে টাকা, অতো দুধ-ঘি কিনে খাবার মতো? লাথি মেরে মায়ের কাছ থেকে সে ভাত আদায় করেছে, আর মা কুড়িয়েছে ঘুঁটে, নয়তো ভেনেছে ধান। সেই মা আজ তার ঘাড়ে, বুড়ি বাতে ভুগছে, চোখ কানা হয়ে গেছে, মরেও না কিন্তু। খাতা লিখে সে ক'টাকাই বা পাবে।

না, কিছুই হবে না তার। সমস্ত জীবনটা তার বিফল হয়ে গেল। এই তো তার এখন যৌবনের সময়, কটা মেয়েকেই বা সে পেয়েছে। মাত্র দুটি, তাও আবার দাসী-বাঁদী। ছিঃ। কিছুই দাম নেই তার জীবনে। এক একবার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে যায় তার। ভাবে কী হবে এই জীবন রেখে, যার মধ্যে কোন সার্থকতা নাই?

কিন্তু হরির কথা তাকে আশা দেয়। হরি ওকে প্রায়ই বলে, 'এসব ব্যাপারে ধৈর্য ধরে থাকতে হয়, খুড়ো। তবেই সিদ্ধি হয়। মান-অপমানের বালাই ভুলতে হয়।'

কিন্তু ধৈর্য থাকে না সব সময়। রাখতে পারে না নবীন। মনে হয়, ও ছুটে যায়, নিঃশেষে মিশে যায়, কোথায়? ···সে বলতে পারে না, কোন এক অত্যন্ত তীব্র আকর্ষণের মাঝে।

কিন্তু যতই সে পারে না, ততই দুঃসহ হয়ে ওঠে তার দেহ মনের ভার। একদিন কথা প্রসংগে, মালতীর উল্লেখ করে হরি। আর তার সাথী মাষ্টার-বউ এর কথা।

'তোমাদের আমধেড়ে গ্রামে ওই দুটিই বোধ হয় আছে। তা মাগির মত মাগি। জান ওদেরকে?'

'তা আর জানবনি। মালতীর থেকে ওই মাষ্টার-বউটা, মাইরি···'

হরি বিশেষ কিছু বলে না, শুধু একবার, 'হুঁ—' করে চুপ করে থাকে।

নবীন বলে চলে, ‘ও-মেয়ে জান খুড়া হাওড়া থেকে এসেছে। লেখাপড়া নাকি জানে, গান জানে, তো বলেছেন এই গাঁয়ে থাকে কি করে মেয়েমানুষ, শুধু তো মাতালের গাঁ। দেখতম ওকে একবার কিন্তু ওই মালতী ছুঁড়িটে ওকে সামলে রাখে।’

‘ঠিক তাই।’ সংক্ষেপে বলি হরি।

‘কেন গো খুড়া, নজর পড়েছে নাকি তমার? তাহলে আমরা প্রসাদ পাব নিশ্চয়ই—’ কোন একটা কল্পনায় নবীন উৎসাহিত হয়ে ওঠে, ‘তা কোনটি গো, খুড়া?’

‘দুটাই। তবে কি জান ওই মালতী ছুঁড়িটাকে হাত করতে হবে আগে—নইলে মাষ্টার বউয়ের পাত্তা মেলা ভার হবে।’

নবীন হঠাৎ কী একটা কথা চিন্তা করে নিজের মনে হাসে, ‘আচ্ছা, খুড়া সত্য করে বল না, কোনটা তোমার বেশি পছন্দ, হুঁ, বল না—’

‘মালতীটাকে—’

বাধা দিয়ে নবীন বলে, ঠিক। বউটা সুন্দর হলে কী হবে, জিনিস যদি থাকে তা ওই—’

‘জানে নবীন, ও মাগির দেমাক বেশি। লোকে ওর নামে দুর্ণাম ছড়ায় ও কিন্তু হাসে। একদিনও একটা আপত্তি করেনি।

ওর ভাবটা হল এই, যাই বল না আর কর না কেনে তোমরা, আমার কচু। তো অর সেই দেমাক আমি ভাঙব। এতদিনেই ঠিক তাই করতম, কিন্তু ব্যাপার কি জান নবীন, বাবাজী চটে যাবে একটু বেশি আর সেই জন্য আমার আরো রাগ বেশি, পুরুষ তো। তোমাকেই বলি নবীন, কাকেও বোলো না যেন, ওই বাবাজী আমাকে ঘেন্না করে। তো আমিও সন্ধ্যেবেলা একশো আটবার নাম জপ করি অর মুখ দেখার পাপ ঘুচাবার জন্যে। তবে কি জান বাবাজী, এই সংসার অতি কঠিন জায়গা, এখানে অনেক কিছু সইতে হয়। রাগে তোমার

হয়তো বুক জ্বলে যাবে, কিন্তু মুখে হাসিটা রাখতেই হয়। ওই বাবাজী আমার কাছে টাকার জালে বাধা, কিন্তু জানো নবীন, অনেকবার আমার প্রাণে বাঁচিয়েছে লোকটা—'

নবীন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করে হরি: 'মালতীর উপর আমার অনেক দিনের নজর। ত ভাগ্নী সেটা জানত, একদিন বললে, উটি কোরনি মামা, তোমার জামাই চটে লাল হবে—'

'কেনে কেনে—'

'ওই মালতীর খুড়তুত ভাই সতীশ। তো চাষীরা তার খুব ভক্ত; তো অরা যদি ক্ষেপে যায়···হ্যা, ওই সতীশ, দুদিনের পুটকে ছেলে— তা ব্যাপার হচ্ছে এই—ভয় ওর কোথা জান। গোবিন্দ অর শালিটাকে খুন করেছে, তার জন্তে দোষটা কার রে বাবু, তোর না আমার। হুঁ। আসলে কি জান, মানুষ সবাই লোভী, সবাই। তবে কেউ চাপা কেউ খোলা। বুঝতে পেরেছ কি বলছি?'

নবীন চোখ বড় করে, 'হ্যাঁ? অজয়বাবুও তলে তলে জল খান?'

'আমার তো তাই মনে হয়। তবে হাতে নাতে প্রমাণ পাইনি কিছু। তবে কিনা মালতীর মতন মেয়ে—'

ওরা দুজনেই চুপ করে থাকে। অনেকক্ষণ ধরে। তারপর এই ভারী নিস্তব্ধতা কাটাবার জন্তেই বোধ হয় নবীন বলে, উ কথা ছাড়। এখন আসল কথাটা ধর দেখি, কি করে টানছ বল দিকি, আমাদের কিছু যদি করতে হয় ত বোলো খুড়া আমরা আছি।'

'যদি দরকার হয়ত ডাকব—'

'তোমার থালে উদিকে চোখ গেল, খুড়া,—' নবীন কথাগুলো চিবোয়। ওর মুখে একটা বাঁকা প্রাণহীন হাসি ফুটে ওঠে।

ঠিক, ঠিক এই জন্তেই হরি ওকে ভালবাসে। নবীন যেন তারই

প্রতিকৃতি, তারই ভেতরে যা আছে, তারই যেন বহিঃপ্রকাশ। তাই অত ভাল লাগে নবীনকে।

হরিও হাসে। 'তা আর উদিকে নজর যাবেনি? ত যাবে কোন দিকে, ঐ ছোটলোকের দাসী-বাঁদী বাগ্দী মেয়েগুলাকে আর ভাল লাগেনি। গায়ে একবার হাত দিলে তার তিনদিন গন্ধ থাকবে। তাছাড়া, কি জান বাবু, ওই মেয়াগুলা নিজেরাই তোমাকে ডাকবে। তা মেয়েরা যখন ডাকবে তখন কি ভাল লাগে, এ্যাঃ?'

নবীন হঠাৎ প্রসংগান্তরে সরে যায়! 'ঠিক তাই। আচ্ছা খুড়া, ঘরে ঘরে মেয়েরা এত হ্যাংলা হয়ে উঠল কেনে, যেন খিদে বেড়ে গেছে? আমার কি মনে হয় জান, ঐ মিলিটারী আসার পর থেকে এমনটি হয়েছে। যুদ্ধের আগে ত এমনটি ছিলনি?'

'ছিল বাবা ছিল, কম ছিল তখন। বলি, শরীরে যদি পাপ নাই থাকবে, ত ইটা হবে কেনে। জান নবীন, মানুষ ভালো নয়, মানুষ অতি খারাপ অতি খারাপ, তার চেয়ে সাপ ভাল, ব্যাং ভালো—সব ভাল'

কথাটা ভাবিয়ে তোলে। নবীন কথাটাকে নিয়ে আলগাভাবে নাড়া-চাড়া করে নিজের মনে।

'থালে মানুষ বিয়া করে কেনে? বিয়া-টিয়ার কি কিছু দাম নাই?'

'হ্যাঃ এই কথাটা বুঝলেনি? বিয়া না করলে মাগিরা কি করবে? ছোঁড়াগুলার না হয় কিছু বুঝা যাবেনি, কিন্তু মাগিগুলা নিজেদের কলংক ঢাকবে কি করে। জান নবীন, আমার অন্তত সাতটা ছেলে এখনো বেঁচে আছে, বুঝলে নবীন, আমি তাদের বাবা নয়, বুঝলে হেঁ হেঁ—'

হরির হাসিটাকে লক্ষ্য করে না, ওর কথার ওপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নবীন বলে, 'ভাল লাগে নি বাবু, ইসব ভাবতে গেলে আর ভাল লাগেনি—'

হরি তার সেই হাসিটার জের টেনে বলে, 'তা ভাবলেই খারাপ। কিন্তু [illegible] পাবে হাতের কাছে, তখন যে আনন্দটি' ইত্যাদি।

এগার

মালতীর সখি মাষ্টারবউ হারমনিয়ম বাজিয়ে গাইতে শুরু করেছে, এমন সময় পাড়ার ছেলেরা হৈ হৈ করে ছুটে এল। এই হয়েছে এক জ্বালা। ছোট ছোট এইটুকু-টুকু ছেলে সব, চারদিক থেকে ওকে একবারে ঝেঁকে ধরবে। গলা ছেঁকে ধরবে কেউ, কেউ কোলের ওপর কনুই ভর দিয়ে বসবে। কেউ তাল দেবে, কেউ মাথা নাড়বে। আবার কেউ বা বিস্বর কণ্ঠে গলা মেলাবে ওর সংগে। ছোট বড় নানা রকম ছেলে রয়েচে সে দলে, প্রকৃতি অনুযায়ী নানা রকম ভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবে তারা, কিন্তু একটা জিনিস সত্য, সবাই তারা গান শুনতে চায়। গাইতে চায়। ভীষণ তাদের ইচ্ছে।

এই জন্যে ওর স্বামী বলেছিলো, 'দেখ মিনতি, তোমায় মিনতি করছি, আর যাই করো, আমার যখন পাঠশালা চলবে তখন তুমি গান গেয়ো না। এক তো পাঠশালার ছেলেগুলার এমনি অবস্থা যে পাঠশালায় ওদের টিকি মেলা ভার, কোথায় টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাবা নয়তো ঠাকুরদা'র পেছনে পেছনে, ধানের চাঁঙারিটা বইছে, নয়তো গরুটা ধরে রাখছে, কখনো বা মাটি কোপাচ্ছে কেউ বা ন্যাংটা, কেউ বা কপনি-পরা—তারপর তুমিও যদি ওদেরকে টানো, তাহলে ওরা কী শিখবে!'

'ও আমি পারব না, গান না গাইতে পারলে আমি ছাতি ফেটে মরে যাব, যখন খুশি গাইব আমি। ওরা আসে কেন? শাসন করতে পারো না?'

'না, পারিনে। দেখ, ওদের কথাটা ভেবে দেখ একবার, কী আনন্দ পায় ওরা? আগে খেলাধূলা ছিল, এখন ওরা খেলতে গেলেই বাপ মারা চেঁচিয়ে ভূত ভাগাবে। সেই সময়টা কাজে পাঠাবে ওদের। তাহলে ওরা কী করবে বলো, তাছাড়া গান ওরা শুনবে কোথায়?'

'হ্যাঁ, তাই তো, গান শোনেনি না আরো কিছু। এদিকে এসে সিনেমার গান গাইতে বলবে, মোরে কি একটি রাতি বুঝলে?'

'হ্যাঁ? এসব শিখলে কোত্থেকে?

'কেন, তোমার পাড়ার ওই ধনুর্ধরগুলির কাছ থেকে, ওরা এ-বাড়ির তিন মাইল দূর থেকে শিস্ মারবে—ছিঃ ছিঃ' সেদিন কেঁদে ফেলেছিলো মিনতি।

কী জানি কেন, কিছুতেই সে এই পরিবেশের সংগে মানিয়ে নিতে পারছিলো না নিজেকে। হাওড়ার এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহে আশ্রিতা হিসেবে ছিলো সে। বাইরের জগৎ সে কমই দেখেছে, কিন্তু গড়ে উঠেছে সে অত্যন্ত নরম একটি হৃদয় আর আদর্শের প্রতি অকুণ্ঠ নিষ্ঠা নিয়ে। বিয়ে হবার পর এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গিয়েছে সে স্বামীর সংগে, কিন্তু কোন জায়গায় সে শান্তি পায়নি। মন তার অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ থাকে সব সময়ই। কিছুতেই সে মানসিক ক্লান্তি দূর করতে পারে না। প্রায়ই বলে, আমি পারিনে আর এ নোংরামি সহ্য করতে।' আর ঠিক সেই জন্যেই বেশি করে গান গায় মিনতি, গান তাকে গাইতেই হয়।

বাঁশের ঝাঁপ-ঝোলানো খড়ের ছাওয়া ঘরটায় ডুবন্ত সূর্যের আলো এসে পড়েছে। সেই মাত্র কাজকর্ম সেরে গা ধুতে যাবে বলে গামছাটা কাঁধে ফেলেছে, এমন সময় হঠাৎ ও কেন পশ্চিম দিকের জানালাটায় গেল। আহা, কী সুন্দর, কী সুন্দর। মিনতি সূর্যের দিকে তাকিয়ে, গুনগুন করতে শুরু করলে, 'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর—'

গান গাইতে গাইতে উৎসাহিত হয়ে ওঠে মালতী, এখন গুনগুনানি থেকে গলা ছাড়ে, তারপর হার্মনিয়ম টেপে। ততক্ষণে সূর্যের দিকে তাকানোর দরকার করে না, ও বিছানায় বসে চোখ বুজে গেয়ে চলে।

যা সাধারণত ঘটে থাকে, ছেলেরা প্রথমে উঁকি-ঝুকি মারল, তারপর ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল এক দুই করে, তারপর ঘিরে ধরলো ওকে।

মিনতি আবেশটাকে নষ্ট হতে দিলো না। ওদের অনুনয় করে আদর করে বললে, 'লক্ষ্মি সব, মাণিক সব, অমন করে গান শোনে না, যাও দরজার কাছে গিয়ে বোসো।' ও নিজেই ওদেরকে নিয়ে দরজার কাছে বসিয়ে দিয়ে আসে। ওরাও কথা শোনে গান শোনবার লোভে। তক্তপোষের ওপর বসে হারমনিয়মের পর্দা টিপে চলেছে মিনতি, ওরা তাই ঘাড় উঁচু করে দেখে। মিনতির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ওদের আশা মেটে না। মিনতি কিন্তু তাকায় না ওদের দিকে। ওদের ওই বিস্ময় আশ্চর্য বোকামিতে ভরা। সে দিকে তাকালে ঐ আবেশটুকু আর থাকবে না। এমনিতেই তো বাধা পড়েছে একবার।

কিন্তু বেশিক্ষণ চলে না এই ভাবে। একটা দশ-এগার বছরের মেয়ে হঠাৎ সুর মেলাতে চায়, 'সুন্দর হে সুন্দর—'

মর্মান্তিক ব্যাথায় উঠে পড়ে মিনতি। গান বন্ধ করে গা ধুতে যায়। তারপর প্রদীপ জেলে সন্ধ্যে দেয়। বসে থাকে ওর বিছানাটার ওপর।

কেন, কেন ওরা এমনি করবে?

শুধু ছেলেরাই তো নয়, বড়রা আছে এর পেছনে। একদিন একটা ছেলে এসে গান গাইতে বারণ করলে। বললে, 'উসব বড়মানুষে বিবি-গিরি এখেনে চলবেনি—ইটা গরীবের দেশ, গরীবের ঘর।' তো এর পেছনে কি বয়স্ক লোকের কথা নেই? হায়রে, গান গাওয়া

সেটা বিবিপনা হল? আশ্চর্য এদের সব মতিগতি। হাসিও পায়। মিনতির স্বামী সুবল এখানে প্রথম পাঠশালা করার পর, একজন লোক একটি ছেলের হাতে বলে পাঠায়, বলিস তো তো মাষ্টবকে এক কড়ার যদি সতেরোটা আম পাওয়া যায় তাহলে একটা আমের দাম কত।' ছিঃ ছিঃ। এরা মনে করবে, এদের চেয়ে বিদ্বান আর কেউ নেই, ওরা যা করে তার বাইরে যদি কেউ কিছু বলে, তবে তাকে অবজ্ঞা করবে, নয়তো ক্ষমতা থাকলে চেপে ধরবে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মিনতি। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সে কল্পনা করেছে গ্রামের প্রান্তে কোন একটি কুঁড়ে ঘর, সামনে হয়তো লাউ গাছের মাচা, তার কোন খুঁটিতে কালো বাছুরটা বাঁধা, সেটার মা গিয়েছে চরতে। কিন্তু ভেঙে যাচ্ছে, কোন স্বপ্নই আর টিক্‌ছে না। আজ মনে হয়, যে একটা তিন তালা পাকা বাড়ি থাকলে তার ছাদে গা এলিয়ে বসা যেত একবার, গান গাওয়া যেত যত খুশি।

সন্ধ্যে গিয়ে রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। এবার গিয়ে রান্নাবান্না করতে হবে। কেমন নির্জীবের মত উঠল মিনতি।

'এই মিনি, মিনি-বউ—' মালতী হঠাৎ ঢুকে আটকাল ওকে। হাত দিয়ে নয়, ওর মুখের সকৌতুক হাসিটা ওর সামনে মেলে ধরে।

মিনতি চলে যাচ্ছিলো, কিন্তু মালতী বললে, 'বল দিকি, কাকে এনেছি—'

'আমার মুণ্ডুকে—'

মিনতি ওর হাত ছাড়িয়ে চলে যাবার আগেই সুবল আর সতীশ ঘরে ঢুকলো। মনে হয় দুজনে ওরা ভীষণ একটা কিছু আলোচনা চালাচ্ছিল, সুবলের মুখটা তখনো কাঁচু-মাচু হয়ে আছে, আর সতীশ হাসছে আস্তে আস্তে।

'বৌদি, দেখা করতে এলম যে।'

প্রথমটা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো মিনতি। অনেকক্ষণ। কতদিন নিরুদ্দেশ হয়েছে ও! তারপর বললে, 'এস ভাই—'

'থাক, হয়েছে।' মালতী ক্ষেপে ওঠে, 'ননদদের খাতির ত নাই, যত আদর সব ঠাকুরপোদের জন্যে।'

ত্যালাই পেতে ওদের বসাল মিনতি। বললে, 'এতদিন দেখিনি তোমাকে। কোথায় ছিলে, বল।'

'তার কী আর মা-বাপ আছে। কারও আদালে-বাঁদালে, কারও চ্যাঁকশালে—আর জঙ্গলেই তো কাটাই বেশি দিন। দেখছ বৌদি, রেঁদে-বেড়ে বাটনা বেটে কুটনো কুটে এই হয়েছে হাতের অবস্থা। তোমাদের জাত মেরে দিলম, হুঁ।'

'মিনতি হাসল একটু। 'ছেলেটা সেই রকমই আছে।

'তুমি সেই আগের মতই আছ।'

এই সময় বাইরে গেল সুবল, ঘরে নেই একমুঠো মুড়িও। পাড়ায় কিনতে গেল মুড়ি, যদি মুড়কিও পাওয়া যায় কিছু।

মিনতি হঠাৎ প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা ঠাকুরপো, পারবে তোমরা ওই সব করতে, মারামারি বিপ্লব এই সব। কিন্তু তোমাদের ভরসা তো এই চাষা-ভুষোর দল। ওদের আছে কিছু? আমি তো ভাই কিছুই বুঝতে পারিনি।'

সতীশ একটু হাসল।

'ছাই, ছাই, ছাই পারবে অরা।' মালতী তাচ্ছিল্যে ভেঙে পড়ে, 'ছোটলোক-চাষাভূষোর কথা ছাড়ান দিলম, ত অদের নিজেদের কথাই ধরনা কেনে। ওই পটকা ছোড়াগুলা পুলিস মারবে? থালেই হইচে। আর মজা দেখ, পুলিসগুলা সত্যিই অদের ভয় করে। আমার কি মনে হয় জান্থ, ভাই মিনি, অরা সতীশদিকে দেখেনি, দেখলে আর ভয়টি করতনি—'

'মালতী, তুই চুপ কর একটু। আমাদিকে কি ভয় করে, আমাদের কথাকে। আমরা সত্যি কথা বলি বলে, আমাদের এই সাহস, আর ওদের ভয়ের শেষ নাই। দেখনি মণি পাঠশালে, কোন ছেলে মিথ্যা কথা বললে, চোখগুলা কেমন পিটপিট করে।'

মিনতি বললে, 'সে কথা ঠিক। কিন্তু তোমাদের কথা কি এরা বুঝবে? ভাল বললে যে এরা খারাপ শোনে।

মালতী বলে, 'বুঝবেনি কেনে, কানের কাছে যদি সব সময় ঘ্যান ঘ্যান করে, থালে মানুষের মাথার কি থাকে? এই সতীশের কথা ধর। এতক্ষণ আমার ঘরে উ কি করছিল জিগাস কর দিকি। সুবলদার কানে যেমন ভূত নামাবার মন্তর পড়ছিল, বলে, আজকাল যে নেকা-পড়া হচ্ছে সেটা কিছু নয়। বলে, নেকা-পড়া ভাল করার জন্তে মাষ্টারদিকে ধর্মঘট করতে হবে। ঝাড়া একযুগ অরা সব ক্যাঁচর ম্যাচর কি করল। তারপর সুবলদার এখন ঢুকুল যায়। দুদিন পরে দেখবে সুবলদা ইস্কুল তুলে দিয়া বসে আছে।'

সতীশ বলে, 'কথাটা ঠিক তো। আমি একশ বার একটা কথা বলতে পারি। কথাটা যে ঠিক, যতক্ষণ না বুঝে ততক্ষণ তা তাকে বলতে হবে।'

মিনতিকে অত্যন্ত আত্মগত দেখায়। সে বলে—কথাগুলো যেন ভেতর থেকে খুঁজে খুঁজে বের করে। 'আমিও সেকথা বলি। মানুষ খারাপ, কিন্তু তাই বলে ওরা যে ভাল হবে না, তার মানে নাই। কতবার আমি পাড়ার ছেলেদের বলেছি, এটা করো না, ওটা বলতে নাই, কিন্তু কিছুতেই শোনে না। যে লোকগুলো আমাদিকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে, এক একবার মনে হয়, গিয়ে ওদেরকে আমি নিজেই বলি, এসব করতে নেই; কিন্তু আমি পারিনে। কেমন করে বলতে হয় জানিনে।

মিনতি চুপ করে যায়। সতীশ পিদিমের আলোতে দেখে, ওর কালো উজ্জ্বল চোখ দুটো কেমন ভিজে ভিজে দেখায়। বুকের ধুকধুকানিটা বোঝা যায় গলার কাছে।

মালতী কিন্তু ওদের অমন চুপচাপ থাকতে দেয় না।

'কেনে, কেনে, যে রকম করে সুবলদাকে বলেছ, সেই রকম করে বল না—'

সতীশ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে বললে, 'ই কথা বুঝি তুমি জাননি? শুন তবে। সুবলদা আগে তো হাতকাটা তেলের ব্যবসা করত রেলগাড়ীতে, ত বউ বললে, না, উ করতে পাবেনি, অতে মিথ্যা কথা বলা হয়। হাত কাটবেনি, আর মিথ্যা করে দেখাবে ত উ চলবেনি। তবে করবে কি রে, বাবু। অনেক যুক্তি-যাক্তা হল, এ কাজের কথা হল, উ কাজের কথা হল, তবে যাবে কথা রে বাবু। সব জাগাই ঐ মিথ্যা। তা কি হবে বল, না মাষ্টারি কর। সেখেনে মিথ্যে কথা বলতে হবেনি। গেল শ্যামপুর মাষ্টারি করতে, ত জানিনে ভাই, একদিন দেখি চলে এল সুবলদা কাঁথা-কম্বল নিয়ে। কী ব্যাপার, না, সেখেনে মাইনে পেইছে পঞ্চাশ, কিন্তু লিখতে হবে যাট, ত ও নিজেই পালিয়ে এল। জান ভাই, যেমনি হাঁড়ি তেমনি সরা। ত কাঁটায় কাঁটায় চলছে সব।'

'আ থাম, ঠাকুরঝি। ও কথা এখন রাখ।'

মালতী কান দেয় না ওদিকে। ও বলে, 'আবার চলে যাবে ই পাড়া থেকে, ই দেশে আর থাকবনি, কেনে না ছোঁড়াগুলো বড় অসভ্য, শিস্ দিবে রাত্রে দিনে অর দিকে চেয়ে চেয়ে। বলি যাবি কোথা? শ্যামপুরের ইস্কুল ছেড়ে দিয়ে, নিজেরা পাঠশালা বসালি, ত আজ যদি পাঁচটা ছেলে আসে ত কাল আসবে দুটা, তা অতেই ত চলছিল দুবেলা দুমুঠা। তা নয়, চলে যাবি। খাবি কি রে বাবু? না,

খাবনি, খাওয়াটাই কি সব। শুন একবার,বুঝলে ভাই এই সব হচ্ছে ব্যাপার।'

মালতীর সেই তীক্ষ্ণ কৌতুকের ভাবটা চলে গিয়ে কখন ও গম্ভীর হয়ে গেছে। ব্যাথায় হয়তো ওর ভেতরটা টনটন করছে। কিন্তু কিছুতেই সেটা প্রকাশ করবে না সে। উঠে পড়ে বললে, 'দাও, বাবু, সতীশকে কি খেতে দেবে দাও। ভাত ত হয়নি, মুড়িই দাও চারটি। জান্ন ভাই মিনি, আজ অদের মিটিন হবে, সেই শ্যামগঞ্জের মনু দিগারের ধান লিয়ে যেটা হল, সেইটার মিটিন। কী তালুক-মুলুক হবে সারারাত, দাও চারটি—'

সতীশ বললে, 'যাবি, তুই চল না—'

মিনতি বলে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাওনা ঠাকুরঝি, ঠাকুরপোদের দৌড়টা দেখে আসবে একটু।'

'থালেই হইছে। এখন রাস্তা দিয়ে গেলে লোক মুখ ফিরিয়ে লেয়, তখন কুকুর লেলিয়ে দিবে।'

বড় অসতর্কভাবে কথাটা বেরিয়ে গেছে। খুড়তুতো ভাইয়ের সামনে কথাটার উল্লেখ ভালো হয়নি। বড় অপ্রতিভ হয়ে পড়ে মালতী।

'লে বাবু, তাড়াতাড়ি খেয়ে লে—'

সতীশ চলে যাবার সময় মিনতি বললে, 'তমার ভয় করে না ঠাকুর পো।'

'ভয় আর কাকে, বৌদি, এই তোমাদের ঘর এলম, তুমি ত আর ধরিয়ে দিবেনি আমাকে। এখেনে আমাদের শত্রু নাই, অতি অল্পই আছে, তবে সেগুলোকে সামলাতে পারব।' হঠাৎ মালতীর কী হল জানিনে, ও একটু এগিয়ে এসে সতীশকে বললে, 'ওরে, একটু সাবধানে থাকবি, কতদিন পরে তোরে দেখলম—'

না, ও কাঁদবে না। কাঁদতে জানে না ও।

রাত্রে মালতী এখানেই থাকে। তাই একসংগে রান্না-বান্না করে খেল ওরা। শীতের রাত্রি অল্পেতেই নিঃঝুম হয়ে এল। সুবল বিছানায় শুতে যায়। ওরা রান্না ঘরে উনুনের ধারে বসে হাত-পা সেঁকে সেঁকে গরম করতে থাকে।

'তোমাকে আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না ঠাকুরঝি।' মিনতি বলে, 'কোনদিন তুমি কিছু বিশ্বাস করনি, কারো ওপর তোমার ভরসা নাই। কিন্তু অমন নরম প্রাণ তোমার আছে তা তো জানতাম না। আজকে বুঝলাম। এখন দেখছি, কেন তুমি অন্যের কাজ করে এত আনন্দ পাও। কারো অসুখ বিসুখ করলে সারারাত কাটিয়ে দাও।'

মালতী কিছু বলে না, ও চুপ করে থাকে।

মিনতি কিন্তু উস্‌খুস্‌ করতে থাকে, কি একটা বলবে বলবে করেও পারে না। মালতী সেটা লক্ষ্য করে বলে, 'কিছু বলবে ভাই।'

'হ্যাঁ। ছোট-বোনের দোষ নিয়ো না, দিদি। কোনদিন তোমায় সে কথা জিজ্ঞেস করতাম না, কিন্তু আজকে জিজ্ঞেস করতেই হবে। দিদি, লোকে যে তোমার একটা কলংকের কথা রটায় সেটা কি সত্যি।'

'আমি ছোটবেলা থেকে বিধবা হয়েছি, ভাই। আমাকে জিগাস করনি। উ কথা জিগাস করতে নাই।'

অনেকক্ষণ ওরা চুপ করে রইল, দুজনেই। তারপর মিনতি বলে, 'রাগ করলে, দিদি।'

'না ভাই, রাগ কেনে করবে।'

'তবে আর একটা কথা বলতে হবে। তুমি কি সত্যই মানুষকে বিশ্বাস কর না? কতবার তুমি বলেছ, মানুষ বড় খারাপ, সেটা তুমি হেসে হেসে বলতে। তাই বুঝতে পারিনি—'

একটু থেমে, মালতী কিছু বলবার আগেই বললে, 'আমার কথা তবে শোন, চারদিকে মানুষ এত নীচ হয়ে গেছে দেখলে কষ্ট হয়। কিন্তু আমি কী করব। সতীশ ঠাকুরপো যা বলে, হয়ত সত্যি। দুঃখে কষ্টে মানুষ এই রকম হয়েছে। একদিন ওরা হয়ত ঠিক হবে। কিন্তু ততদিন কি বাঁচব, তা ছাড়া এখন আমি বাঁচি কী করে। হয়তো ক্রমশ হয়ে যাবে, একদিন হয় তো আমার এসব গায়েই লাগবে না, এদের মতই হয়ে যাবে। কিন্তু সে যে মরার বাড়া—'

মিনতি অন্যমনস্ক হয়। ওর মনের মধ্যে চিন্তাগুলো যেন [illegible]বন্ত হয়ে ওঠে। নিজের অভিজ্ঞতার সংগে নিজের সত্য-বোধ মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছে ও। এক সময় মালতী কথা বলতে শুরু করে, তার প্রশ্নের জবাব: 'মানুষকে কেনে বিশ্বাস করবনি, ভাই। তা নালে এত বড় পিথিমিটা চলছে কী করে। তবে কী জান, মেয়ামানুষের সংগে পুরুষের সম্বন্ধই আলাদা। এর চেয়ে খারাপ আর কিছু নাই। মেয়ে জন্ম বড় খারাপ, বউ, বড় খারাপ। সব পুরুষ তমার দিকে ছুটে আসবে, গিলে খাবে তমাকে। তারপর বাদ-বাকিটা ফিঁকে ফেলে দি' যাবে। আর মেয়েদের প্রাণটা দেখ কেঁদে কেঁদেই মরবে অরা, অদের দুঃখ কেউ বুঝবেনি। কারও পায়ে পেন্নাম কর তুমি, ত দু-চার কথার পর তমার দিকে ঘুসি' ঘুসি' সরে এসবে। ত সব পুরুষই ঐ, মেয়ে দেখলে তাকে চুষে লিবেই লিবে—'

ও একটু থামে। মিনতি দেখল ওর ঠোঁটটা কাঁপছে।

'তবে হ্যাঁ, এমন দুএকটা পুরুষ আমি দেখেছি। মেয়েদিকে অরা ফিরেও চাইবেনি। তবে তারাও ভাল নয়, ভাল নয়। বড় কঠিন অরা। তুমি ভালবেসে মরে যাও, কেঁদে বুক ভাসি' দাও, ত অরা দেখবেনি। দুটা কথাও শুনবেনি। মেয়ে জন্ম কিছু নয় ভাই, অরা নরকের কীট—'.

মালতী ভেঙে পড়ে। দুটো হাঁটুর মধ্যে হাতের দুটো তেলো, আর তার মধ্যে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে থাকে।
মিনুতি অবাক হল। কখনো ওকে কাঁদতে দেখেনি সে। কিন্তু কি বলবে ভেবে পায় না। ও শুধু বাঁহাতটা মালতীর পিঠের ওপর দিয়ে আর ডান হাতটা দিয়ে মালতীর ডান হাতটা ধরে রইল।

বার

মাথায় আঘাত পেয়ে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছিলো লখীন্দর। ভীষণ যন্ত্রণা প্রায় কাবু করে ফেলেছিলো তাকে।

কিন্তু ওর মানসিক অশান্তিই ওকে ব্যস্ত করে তুলেছিল। দেহের যন্ত্রণা বা নিজের অসুবিধা সম্বন্ধে ও কোন চিন্তাই করত না, কিন্তু সুধীরের কথা ভেবে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিল লখীন্দর।

সেই ধান-তোলার দিন লখীন্দর চোট খেয়েছে শুনে ছুটে গিয়েছিলো সুধীর, কিন্তু সমস্তটা শুনে পালিয়ে এসেছে ও। বাবার সংগে দেখা করেনি। বলেছে, 'বাবার মত লোকের গায়ে হাত দিছে, কুন শালার ঘাড়ে দুটা মাথা আছে!' অসহ্য ক্রোধে ফেটে পড়েছিলো সুধীর। ওর পেশিগুলো শক্ত কাঠ হয়ে গিয়েছিলো। হয় তো সামনে পেলে তখনই ছিঁড়ে ফেলতে সেই লোকটাকে। কিন্তু তারপর ও শুনেছে, ওর বাবা নিজেই এগিয়ে গিয়েছিলো, সেদিনের সমস্ত ব্যাপারটা তার বাবাই পরিচালনা করেছে, তখন পালিয়ে এসেছে সুধীর। তারপর থেকে বাবার সংগে কথা বন্ধ।

'তোর বাপের এমন অবস্থা, ত কথা কস্‌নি অর সংগে দুটা? গ্রামের কোন বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলে, সে বলবে 'তুমি মানী লোক, তুমি যদি তমার মান খুয়াও, ত আমি কী করব। বাবার বুড়া বয়সে মতিভ্‌ম হইছে খুড়া, তুমি দেখবে। আবার শুন্‌ছি, দেশের কাজ করবে, গোবিন্দ মিস্তিরের দলে যাবে, মিটিন হবে—'

এ নিয়ে লখীন্দর কথা বলছে ছেলের সংগে।

'ওরে, তুই অমন করে ভাবছু কেনে। ধান তুলা লিয়ে ব্যাপারটা হইচে। ধান ত আমরা ছেড়ে দুবনি। তবে ই ব্যাপারটা অত সহজ লয়। সে লিয়ে মামলা-মকদ্দমা আছে, পাঁচজনের মত-অমত আছে। ত আমরা ত সব বুঝবনি। যারা ই কাজ করে, ত তাদের কাছে সব জান্‌তে হবে বৈকি। জেনে শুনে যদি ভাল লাগে তমার ত তুমি সেটা মেনে লিলে, না যদি লাগে ত তুমি চলে এসবে!'

জবাব দিয়েছিলো সুধীর, 'তমার সে-লিয়ে অত মাথা ব্যাথা কেনে। অন্ন লোকের জমি, যার দরদ সে তার বুঝবে। 'তমাকে বলি শুন এই যে তুমি মিত্তিরের দলে গেছ, ত তমার ঘরে সব্বনাশ ঢুকল—'

কেঁপে উঠ্‌ল লখীন্দর কথাটায়, 'যে লোক গেছে, সেই মরেছে। ত ঐ গোবিন্দর কথা দেখ, অর মাগ নাই, ছেলা নাই, ত ঐ ভবঘুরের সংগে তুমি যাবে! খাল কেটে কুমীর আননি বলছি—'

এর উত্তরে কত কথা বলার ছিল লখীন্দরের কিন্তু একটা কথাও সে বলতে পারেনি। ওরে, তোরা তো বলছিস, পরের কাজ নিয়ে মাথা ঘামাতে নেই। কিন্তু তোর নিজের কাজ যখন পড়বে, তখন কী হবে। আর তাছাড়া এটা যে আমাদের মতো বুড়োদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। কবে কোন কাজটাকে না বলেছি আমরা, পরের উপকারের ডাক পড়লে ছুটে যেতে হয়েছে। অভ্যাস বড় বালাই। তাছাড়া, এখনকার ছেলে-ছোকড়ারা কী সেটা জানে না, না করে না? এই তো সুধীরের কথাই ধর। দলাদলি কী ও করেনি। দুর্গায়ে শিব-শীতলা পুজোর রেষারেষি নাই? তোরা দল বেঁধে মাথা-ফাটাফাটি করিস তো? হ্যাঁ, সব কাজই তাই, একা হয় না, একা করতে পারে না কেউ। শুধু—'

সুধীরকে বলতে ইচ্ছে করে লখীন্দরের, 'রেষারেষি ত ছোট কাজ, উ

কাজ করতে নাই। ভাল কাজ এক সংগে করতে হয়। ভগমান থালে কিপা করে!' কিন্তু ও কিছুই বলতে পারে না।

ঠিক এই কথাই অখিলকে বলছিলো লখীন্দর।

'সৎপথে থাকতে হয়, অখিল। পাঁচজনের কাজ করতে হয় থালেই, আনন্দ পাওয়া যায়।'

'আমিও ত তাই বলি, লখীন্দদাদা। জীবনে আনন্দ আর পেলমনি, সুখের মুখ দেখলমনি, এই বুড়া হয়ে গেলম, ত এখন সুখ একটু চাই বইকি—'

অখিল এসেছিল একটা প্রস্তাব নিয়ে। অখিলকে পাঠিয়েছে জমিদারের দলের লোক। তারা যেন ব্যাপারটা থেকে সরে আসে। তাছাড়া, এ সম্বন্ধে আরও খবর দিলে, ওদের নানা-রকম সুবিধে হবে। টাকা-কড়িও পাবে সংগে সংগে।

লখীন্দর বললে, 'উ কাজে সুখ নাই, ভাই। ছোট কাজ যদি করলে ত তমার সব সুখ লষ্ট হয়ে গেল। পরের উবগার যদি না করতে পার ত অলেষ্ট (অনিষ্ট) করবেনি—'

একটু থেমে খানিকটে সংকুচিত ভাবে বললে লখীন্দর, 'আমার অনেক বয়স হল, আমার কথাটা লাও। এই আমি বুঝি তমাদের মা-বাপের পায়ের ধূলার জোরে। আমাদের যে এই জীবজন্ম, তা ইটা হচ্ছে ভগমানের লীলা-খেলা। তুমি সুখ বলছ, টাকাকড়ি বলছ ত কী হবে উসব? সবই ত ফেলে চলে যেতে হবে একদিন। ত তুমি বলবে, থালে খাটাখাটুনি কেনে, মানুষ থালে টাকাকড়ি উপায় করে কেনে। ত বেঁচে থাকতে হয়। তুমি বলবে, থালে বাঁচব কেনে। আমি বলি, ঐ যে বললম, ইটা ভগমানের লীলা। এখেনে ছোট কাজ যদি করলে ত, তমার সব গেল। ভগমান মানুষকে দুঃখ কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করে, ত তুমি যদি ঠিক থাকতে পারলে ত তবেই আনন্দ পাবে। না হলে আনন্দ নাই। ছোট কাজ খুব খারাপ, অখিল—'

অখিল অতশত বোঝে না। হয়তো কিছু কিছু ধরতে পারে, স্বীকার করেও। কিন্তু তবুও নিরুপায়। তাছাড়া, ওর সহপাঠি শ্যামচন্দ্রের স্বচ্ছলতা ওকে পীড়া দেয়। যে শ্যামচন্দ্র ওর চেয়ে বোকা ছিলো, সে আজ ঘাটালের মোক্তার হয়ে কত রোজগার করছে, আর ওর এই অবস্থা। লখীন্দর ওকে বোঝায়; 'নিজেকে হীন ভাবতে নাই, অখিল। কেউ সুখী লয়। ই কথা ত সেদিন তমাকে চষ্‌তে চষ্‌তে বলছিলম, তুমিও তাই বলছিলে। তার বাবার টাকাকড়ি ছিল, তাই সে অমন হইছে, তোমার ঐ সুবিধা থাকলে তুমিও পারতে।'

অখিল চলে যাবার সময় বলে লখীন্দর, 'খুব সাবধানে থাকবে ভাই। লোভ খারাপ জিনিস, মানুষকে পশু করে দেয়। পরের যদি উবগার না করতে পার—' ইত্যাদি।

এসব কথা বিশ্বাস করে লখীন্দর। প্রাণপণে ও পালন করবার চেষ্টা করে। কিন্তু তার অন্তরে একটা দ্বন্দ্ব এসে গেছে। সুধীর তাকে ভয় দেখিয়েছে, পাড়ার দুএকটা লোক এসে বলে, 'ই সব মাহা-ঝামেলার ব্যাপার লখীন্দরদাদা, কিন্তু কিনা, তুমি পাচীন লোক, তুমি ভাল বুঝবে,' ইত্যাদি। ওর ভয় হচ্ছে, হয়তো, তার নিজের পরিবারের ওপর কোন বিপদ ও ডেকে আনছে। কিন্তু বিপদই বা কার নেই? কখন কী হয় বলা যেতে পারে? এই যে তেরশো উনপঞ্চাশ সালে অতবড় ঝড়টা হল, ত মাঠে ধান ছিল? চারাগাছ সব উপড়ে গিয়েছিল না? আর সেই চারা-ধানের গাদার মধ্যে চাষীদের মৃতদেহ ছিল না? সেদিন যে সুরেন্দ পাত্তর তার বউকে নিয়ে ঘুমোচ্ছিল, তা একটা সাপকাটিতে দুজনেই তো মরল? তাহলে কাকে কী বলবে তুমি।

নিজের কথা ভাবে না সে। যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে নিজের কাজকেও নিন্দনীয় মনে করতে পারে না লখীন্দর। কিন্তু অধীর আর টুকির

কথা ভেবে ও কেমন মুহ্যমান হয়ে পড়ে। ও নিজের অজ্ঞাতে শিউরে ওঠে। ওদের কী হবে? আর মহাভারতের সেই উপাখ্যানটা ওর মনে আসে। দাতাকর্ণের পুত্র বিষকেতু ছুটে এসেছে, হাতে তখনো তার খেলনা। বাবা-মা কাঁদছেন। নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ বললেন, শিশু, তোমার মাংসেই আমার পরিতৃপ্তি। বিষকেতু হাত তালি দিয়ে মায়ের কোলে গিয়ে পড়লো, বেশ হবে। মা-বাবা আমাকে কাতো।
লখীন্দর কাঁদে। আহা, আহা, কী সুন্দর।
ভগমান, ঘর ভরে দাও, অমন ছেলে দাও। ভগমান, সব ঘর ভরে দাও। পিতাকে সংকট থেকে রক্ষা করুক তারা।
আস্তে আস্তে অধীর আর টুকির মাথায় হাত বুলোয় লখীন্দর। ওদের ওপর ভীষণ খুশি হয়ে উঠেছে লখীন্দর। সেদিন মাঠে গোরু-লাঙল-জোয়ালগুলো সব ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিলো সে। ভাবনা ছিল, হয়তো সবগুলো ওরা সামলাতে পারবে না। কিন্তু ওরা যে সবগুলি ঠিক মতো করেছে, তাতে ওর আনন্দের সীমা নেই। তুচ্ছ ঘটনা, কিন্তু ওর মনে হয়, যে ওদের সে ভরসা করতে পারে।
এখন প্রায় তার কাজ কর্ম নেই। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে বসে থাকে, ছেলেদের গল্প বলে। মাঝে মাঝে অধীরের বইটা নিয়েও ভুরু কুঁচকে পড়তে থাকে।

বিয়ে বাড়ি হৈ হৈ, হাতে দৈ পাতে দৈ, তবু বলে কৈ কৈ।

তার চোখের সামনে দইয়ের ছড়াছড়ি নয়, হাতে-পাতে-দই ঐ ছেলেগুলোর আনন্দের ছবি ভাসে। আনন্দে সে কেমন হয়ে যায়।
'বাবা অধীর, তমার বিয়া বাড়িতে ঐ রকম দইয়ের ছড়াছড়ি হবে, দেখবে।'
'হ্যাঁ', ঘাড় বাঁকিয়ে অধীর বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে।
'আর টুকি মায়ের বিয়াতে কিছু হবেনি, কিচ্ছু না। ও আবার

আমাদিকে ছেড়ে চলে যাবে। অর কত লোতন বাপ হবে, মা হবে—'
লখীন্দর হয়তো ব্যথা বোধ করে।
টুকি একটু বড় হয়েছিলো বলে ও লজ্জা পায়। বলে, 'দূর। তাই হবেনি, তাই হবেনি—' ওর আবার একটু অভিমান হয়।
লখীন্দর ওকে কোলের কাছে টেনে আনে। তারপর আদর করে বলে, 'না গো মা, তমারও হবে। তমার বিয়াতে রসনচৌকি বাজবে। হঁ্যা'
লজ্জায় আনন্দে হেসে ফেলে টুকি। বাবার হাত ধরে বলে, 'বাবা, আমার বিয়াতে পাল্কী হবেনি, শ্যামার যেমনি হইছিল?'
আশ্চর্য। আশ্চর্য! কী আশায় আনন্দে রয়েছে ওরা। ভগমান, শক্তি দাও, শক্তি দাও। ওদের ওই আশা পূরণ করবার শক্তি দাও।...
অধীরের বইয়ের আর এক জায়গায় আছে, 'বালকবালিকাগণ অলস হইবে না। অলস লোককে শয়তানে ধরিয়া থাকে...'
পড়ুক ওরা। পড়ে পড়ে শিখুক। সুধীর যাই বলুক, টুকিকেও লেখা-পড়া শিখাবে লখীন্দর। মেয়েটাকে সে পাঠশালে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু মেয়েটা বোধ হয় বড় হয়ে গেছে! অত বড় মেয়েকে পাঠশালে পাঠালে হয়তো লোকে নিন্দা করবে। তার চেয়ে একজন 'ম্যাষ্টর' রাখলে কেমন হয়? সে এসে পড়িয়ে যাবে ওদের দুজনকেই। কত নিতে পারে সে?
ছেলেদের উপদেশ দেয়, 'কাজ করে যাও, বাবা। অলস থাকতে নাই। এই দেখ তমাদের বইতে লেখা আছে—' হয়তো তক্ষুনি ওদের পাঠিয়ে দেয় কোন কাজে, 'মা টুকি, যা গোরুগুলাকে লেড়ে দি' আয়। মংলীটাকে জল দেখাবি। অধীর, বেগুন বাড়ি থিকে বেগুন গুলো তুল্‌ লিয়ে আঁয়ত।' এই কাজ নিয়েই একদিন কথাবার্তা

হচ্ছিল রামের সংগে। রাম সেদিন মনু দিগারের জমিতে কাজ করে ভীষণ আনন্দ পেয়েছে। আনন্দ কাকে বলে সে ভুলে গিয়েছিলো, কিন্তু সেদিন লখীন্দরের সংগে কাজ করে তার মনের গ্লানি দূর হয়ে গেছে।

'জানলে লখীন্দদাদা, ভাবতম, আমি বুঝি মানুষ লয়। ত কারও মুয়ের দিকে চাইতে পারতমনি। সবাই আমাকে ঘেন্না করত। আবার যারা আমাকে দুটা ভালমন্দ কথা বলত, যে রাম কেমন আছ। তমার শরীরটা ভেঙে গেছে, ভাই। ত ইগুলোকেও আমি সহ্য করতে পারতমনি। জান লখীন্দদাদা, তুমি যে সিদিনটা আমাকে দেখেও দেখলেনি, আর সবাইকে যেমন তুমি বলছিলে, ইটা কর, উটা কর, ত আমাকেও তেমনি বললে—ত অতে আমার খুব ভাল লাগল। থালে আমি সকলের সমান। আমার ইটা মনে হল। ত তমাকে আমি বললম লখীন্দদাদা, এই তমার পা ছুঁয়ে দিব্য করলম, তুমি যে কাজটা করবে, যেটা বলবে, সেটায় আমি না বলবনি—'

লখীন্দর গম্ভীর হয়ে যায়। সমস্ত কথাটা যেন জাবর কাটতে থাকে সে। তারপর বলে, 'রাম, ইটা হচ্ছে গীতার কথা। বাস্তন পণ্ডিতের মুয়ে ইটা আমার শুনা। শিকিষ্ট ইটা অজ্জুনকে বলেছিল যে, কম্ম কর, কম্মেই আনন্দ। কম্মেই পাপ ক্ষয় হবে। ত তমার পাপ ক্ষয় হচ্ছে, ভাই রাম, মানুষের পাপ এই করেই ক্ষয় হবে,—' একটু থেমে বললে, 'কিন্তু কু-কম্ম লয়, মানুষ থালে ছোট হয়ে যাবে। ত তমাকে আর কী বলব ভাই, পরের জন্যে সকলের জন্যে প্যারাণটায় একটু দয়া-মায়া রাখবে—'

একদিন জন-পাঁচেক কৃষক তার সংগে দেখা করতে এলো। তার মধ্যে সেই হিন্দী জানা লোকটিও—নাম তার বাঁশরী—ছিলো, আর

ছিলো পরাণ। পরাণের সংগে অনেকদিন দেখা হয়নি লখীন্দরের তাই ওকে বললে, 'এস ভাই পরাণ, অনেকদিন দেখিনি তমাকে। ভাল আছ ?'

এমনি করে প্রায়ই ওর কাছে লোকজন আসে। ওর শরীর সম্বন্ধে কুশল জিজ্ঞাসা করে। আর জমিটার সম্বন্ধে নানা রকম কথা শুধোয়। লখীন্দর প্রায় সবাইকেই বলে, 'এই আমি বুঝি, ভাই। ধান আমরা ছাড়বনি, অতে যা হয় হবে। তবে এই লিয়ে মাথা গরম করবে থালে চলবে নি। কেনে না মাথাটি গরম যদি করলে ত তমার ইকুল-উকুল দুকুল গেল।'

গোবিন্দ মিত্রের মিটিং-এর কথা উঠলে বলে, 'তা যেতে হবে বৈকি। পাঁচ-রকম পাঁচটা দেখতে শুনতে হবে বৈকি। ইটা উটা শুনতে শুনতেই সব ঠিক হবে।

আজকাল এই কথা না বলে পারে না সে। সবাইয়ের কথা সে ধৈর্য ধরে শোনে। তার থেকে ভাল অংশ গ্রহণ করে। সবাইকে আবার নিজের অভিজ্ঞতার কথা শোনায়। অর্থাৎ সেদিনকার সেই ঘটনার পর থেকে সে এক বিশেষ দায়িত্ব অনুভব করে। মনে হয়, যাই ঘটুক না কেন তার অভিজ্ঞতার কথা সবাইকে জানাতে হবে। আর আশ্চর্য, চিন্তা করার শক্তি তার ভীষণ রকমে বেড়ে গেছে। সে নিজেই বিস্মিত হয়। অনবরত সে চিন্তার জাবর কেটে চলেছে। হয়তো প্রায় শেষ-রাত্রি পর্যন্ত সে ঘুমোতেই পারেনি। এখন আবার দিনের বেলা কাজ নেই তার। এক এক সময় বিরক্তিতে সে ভেঙে পড়ে, সে অসহ্য যন্ত্রণায় কপাল টিপে ধরে। মাথাটা নেড়ে হালকা করে নেয়, যেন নিজের চিন্তাগুলোকেই ঝেড়ে ফেলছে। আজকাল এমন হয়েছে, কোন একটা কথা উঠলেই সে সতর্ক হয়ে সেটা বিচার করবে, মাথা দোলাবে, তারপর সে সম্বন্ধে নিজের কথা বলবে।

সেদিন কথা হচ্ছিল কৃষকদের সম্বন্ধে। কৃষকদের হাত থেকে জমি চলে যাচ্ছে। আর সেই জমিতেই দিনমজুরী করছে তারা। মনু দিগারের ঐ ধান তোলার ব্যাপারটা নিয়েও কথা ওঠে। কী করবে এর পর সে-সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

'জান লখীন্দদাদা, মা লক্ষ্মী আমাদের উব্‌বে বেরাগ হইচে। ধান আর দেখতে পেলমনি। জমি চলে যাচ্ছে সব।' পরাণ বললে।

'ত যাবেনি কেনে, আর একজন বলে, 'তা চাষাদেরই ত দোষ। অদের লোভ মন্দ লয়। বিয়া করবে ত জমি বন্ধক দিবে। আর ঐ হরিমণ্ডল, জমি যদি বন্ধক পেইছে ত আর কুনু কথা নাই। ছেলার অন্নপাশন বল, একটা আহ্লাদ-আমদ বল, সব ঐ জমি বন্ধক। ত থালে আর হবেনি কেনে? মা লক্ষ্মীকে মাথায় রাখতে হয়, তা না করে তাকে আবার বন্ধক দেয় কেউ।'

লখীন্দর বলে আস্তে আস্তে, 'ত উকথাই সবটা লয়। মানুষ কষ্টে পড়েও জমি বিচছে ভাই। গেলবারের আকালে কী হল। ত ব্যাপারটা হচ্ছে এই, বলে সে কথাটাকে নিয়ে নিজের মনে চিন্তা করতে লাগল।

'আজকাল সব দিন বদলে গেছে।' পরাণ বললে, 'আগে জমিদার পেরজা বসাত, এখন পেরজা সরাইছে। ই সব মানে বুঝিনে, বাবা! সব খাস করে লিচ্ছে, খাস করে।'

'ত তাতে লাভ নাই মনে করেচ। পেরজা যদি বসালেত কপয়সা খাজনা পাবে তুমি। কিন্তু ধানের দরটা দেখ আজকাল। ত থালে পেরজা বসাবে কী করে।'

এইসব কথাই পরিষ্কার করে বললেন গোবিন্দ মিত্র তাঁর প্রস্তাবিত গোপন-মিটিংএ।

জমির দাম আজকাল অসাধারণ রকমের বেড়ে গেছে। অবশ্য

ধনীদের কাছেও, আর, গরীবদের কাছেও। বড়বড় শিল্পপতিরা পর্যন্ত জমির ওপর নজর দিচ্ছেন, কারণ ধান আজকাল বেশি টাকা আনে। তাছাড়া শিল্পের বাজার খুব মন্দা। এখন ঐ এক লাভের ব্যবসা হচ্ছে জমি। তার উৎপন্ন দ্রব্য। তুমি যদি চাষ করোতো মজুর হয়ে করবে, দাম পাবে তার বদলে। কিন্তু ধানের ওপর কোন অধিকার নেই। আজকাল আবার জমিদার-জোতদার-তালুকদার —এদের মধ্যেই ঝগড়া। 'এই আমাদের ব্যাপারটাই দেখুন, বললেন গোবিন্দ মিত্র, 'মন্থু দিগারের জমির কথাটা নিন। শীরসার জমিদার আর ধানগেছের জোতদার—দুজনে মিলে এই জমিটার ওপর পড়েছে। কেউই পারছে না সেটাকে কোলে টানতে। মাঝখান থেকে লাভটা হচ্ছে আমাদের। যতদূর মনে হচ্ছে, এ ব্যাপারটা আর বেশি দূর এগোবে না। ওদের খাওয়া খাওয়িতেই শেষ হবে।' বলে হাসলেন তিনি একটু। পরক্ষণেই কিন্তু সাবধান করে দিলেন, 'কিন্তু তাই বলে সব ক্ষেত্রেই এমনটি হবে না। আমাদের সাবধান হতে হবে, তৈরী থাকতে হবে। একটি কথা শুধু আমাদের : ধান আমরা ছাড়ব না, ধান ছাড়ব না।'

তের

একথা ঠিকই। লখীন্দর মনে-প্রাণে এই জিনিসটি বিশ্বাস করে এসেছে। ধান হল গিয়ে মা-লক্ষ্মী। তাকে ছাড়া মানেই তো নিজের মৃত্যু, পরিবারের মৃত্যু। লোকে তো এমনিই বলে, ধান ছাড়া মানে লক্ষ্মীছাড়া। তেমন করে বেঁচে থেকে লাভটা কী।

তাছাড়া মা-লক্ষ্মী তাঁর সন্তানদের পালন করছেন। সেই মা-লক্ষ্মীকে খামারে আন্‌তে হয়, ঘরে তুলতে হয়। তাঁর পূজো করতে হয়। যে বছর ধান আসে না, সেই বছর মানুষ কেমন নিঃঝুম হয়ে যায়। পরের বছর মা-লক্ষ্মীর উপর তেমন ভক্তি থাকে না। মানুষ লক্ষ্মী-ছাড়া হয়।

আর, মানুষ সেই রকম হচ্ছে আজকাল। জমি বিক্রী করে দিচ্ছে চাষী। তারপর তাদের অবস্থাটা দেখ। যেন অরা দড়ি-ছেঁড়া গরু, মাঠে মাঠে ছুটে বেড়াচ্ছে ঝড়ের সময়। কিন্তু যাদের জমি আছে, অরাই বা জমির উপর কী দরদটা দেখায়? কোন রকম নমো-নমো করে চাষ বাসের কাজ সারে ওরা। ফসলও পায় তেমনি। কিন্তু তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই ওদের। বলে, 'ফসল ত পাবে ঢের, তার জন্যে মাগ-ছেলে নিয়েত আর আট-পহর জমিএ পড়ে থাকতে পারিনি---সে সময় বরং আর পাঁচটা কাজ করলে দুটা পয়সা পাব।'

কথাটা সত্যি। নানা কারণে হয়ত জমির উপর সব মনটুকু দেওয়া সম্ভব নয়, হয়ত দুটা পয়সা কম হয় জমিতে লেগে থাকলে, (আর তাই বা কেন, ঠিক ঠিক কাজ করতে পারলে, মা-লক্ষ্মী মুখ তুলে

চাইবেন, বৈকি) মানুষের ঘরকন্না কেমন সুন্দর হয়। তকতকে ঝক্‌ঝকে উঠোন, পরিষ্কার মরাই, তুলসী তলা : লখীন্দরের ধারণা, যার ঘরে ধান নেই, তার ঘরে লক্ষ্মীশ্রীও নেই। শুধু কি তাই, তাদের সুখও নাই। জমির টান যদি কমল, তাহলে নিজেও ডুবলে। নিজের উপর টানও কমে যায়। হাজার হোক, চাষীতো, তোদের রক্তের মধ্যে তো মাটি রয়েছে। মাটি ছাড়লি কি অধঃপাতে গেলি।

কিন্তু সে কথা নয়, লখীন্দর শুধু গোবিন্দ মিত্রের দিকে তাকিয়ে এক অদ্ভুত অনুভূতিতে নির্বাক হয়ে ওঠে। যখন গোবিন্দ মিত্র জোর দিয়ে বললেন, "ধান আমরা ছাড়ব না," তখন তিনি যেন তার মনের কথাটি টেনে বললেন। নিজের অজ্ঞাতে লখীন্দর খানিকটে ঝুঁকে পড়ে ঘাড় নড়ে। নিজের অজান্তেই সমর্থন জানায় সে। এতদিন সে যে কথাটা ভেবে এসেছে, সে কথাটাকে এত জোর দিয়ে তো এর আগে কেউ বলেনি। যার কাছেই প্রসংগক্রমে কথাটা সে তুলেছে, সেই বলেছে, 'কি আর করবে বল ওরা। কেউ কি আর ইচ্ছা করে নিজের পায় কুড়াল মারে ?' এর কোন পরিষ্কার জবাব সে দিতে পারতো না। ফলে, তার অনুভূতিকে কখনো সে জোর করে বলতে পারেনি। কেমন যেন ভীরু-ভীরু ভাব রয়ে গিয়েছে তার মধ্যে। আজ সেইটাকে হঠাৎ এত জোর দিয়ে বলায়, ও যেন উল্লসিত হয়ে ওঠে। নিজের ওপর ওর বিশ্বাস হঠাৎ বেড়ে যায়।

কিন্তু লখীন্দর অত্যন্ত সতর্ক হবার চেষ্টা করে। এই লোকটির সম্বন্ধে সে ভাল-মন্দ মিশিয়ে নানা রকম কথা শুনেছে। অনেকেই সাবধান করে দিয়েছে তাকে। যা-তা লোক নয়তো গোবিন্দ মিত্তির, ওর গায়ের হাওয়া লাগলে ঘরে আগুন লাগে। ওকে ধরবার জন্যে সরকারের মাথা ব্যথার অন্ত নেই। ও যে-সমস্ত কথা বলে, তার মধ্যে

হয় তো সত্যি আছে কিছু, কিন্তু লাঠা-লাঠি খুন-জখমি নিয়েই তো ওদের কারবার। যে কটা লোক ওর পাল্লায় পড়েছে, সেই মরেছে। সর্বনাশ হয়েছে তাদের। এই রকম লোক তাহলে গোবিন্দ মিত্তির। ভালো কথা বলে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে তারপর গলা চেপে ধরে। কিন্তু কেন ও তা করে? কেন? কী স্বার্থ ওর। একথার পরিষ্কার জবাব সে কারও কাছে পায়নি, কিন্তু একজন তাকে বলেছিলো, 'কেনে আর, চোকের সামনেই ইটা আর দেখছনি তুমি? এই যে কন্‌গেরেসের বাবুরা রাজত্বি পেল, ত অদের লাভ হলনি? অরা কি এর আগে আমাদিকে লোভ দেখায়নি যে, ইটা হবে, ঊটা হবে। ইস্কুল পাবি, খাবার পাবি, পরনের কাপড় পাবি। ব্যস ইটা হলেত মানুষ বেঁচে যেত। ত তারাই আজ কি করেছে দেখ। এই হলগে ব্যাপার—লঙ্কায় গেলত রাবণ হল।

লখীন্দর স্বীকার করে। নিজের চোখে দেখেছে সে এসব। কিন্তু কেন যে এমন হয়, সে ঠিক বুঝতে পারে না। মানুষের মতিগতি তাহলে কখন কী হবে কে বলতে পারে। আজ যে তোমার বন্ধু, কাল সে তোমার শত্রু। মানুষ বড় খল, মানুষ বড় কুটিল। মানুষকে বিশ্বাস করতে নেই।

গোবিন্দ মিত্তির বলছিলেন, 'গেল বারের তেভাগা-আন্দোলনের কথা মনে পড়ে আপনাদের? আমরা ধানের ভাগা নিয়ে লড়েছিলুম। এবার আমরা জমি নিয়ে লড়ব। যে চাষী, যে চাষ করবে, জমি হবে তারই। আর কাউকে আমরা মানিনে।'

লখীন্দর গোবিন্দ মিত্রের দিকে তাকিয়ে থাকে। নাকটা একটু থ্যাবড়া, নরম-নরম গোল গাল মুখখানা। কোথায় যেন সুধীরের সংগে ওর মিল আছে। অবিশ্যি সুধীরের মতো অত শক্ত গড়ন নয় ওর। কেমন রোগা রোগা লিকলিকে চেহারা। কিন্তু হাসিটা

ওর আশ্চর্য, কেমন যেন অবজ্ঞা আর দৃঢ়তা একই সঙ্গে মিশে আছে ওই হাসিতে। লখীন্দর মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে। কোথাও ওর মধ্যে অপরিচিত কিছু নেই। না ওর চেহারা, না কথায় বার্তায়। কিন্তু হাসিটার কাছে থমকে যায় লখীন্দর। ও খানিকটে বিস্মিত আর সতর্ক হয়ে ওঠে। অমন হাসি সে দেখেনি।

এখানে পৌঁছেই গোবিন্দকে চিনেছিলে ঠিকই। একদৃষ্টিতেই ওকে চেনা যায়। এত শীতে সবাই মাথায় কম্বল চাদর জড়িয়ে এসেছে, কিন্তু ওর মাথা খোলা, দেহের অতি অল্পই এক অংশে চাদরটা জড়ানো। একটা শাদা রঙের শার্ট পরনে। ডান হাতটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে উঠিয়ে-নামিয়ে বলছিলো সে।

লখীন্দরের মনে হয়, গোবিন্দ অনেকবার তার দিকে তাকাচ্ছে। আর গোবিন্দ তাকালেই সে যেন কী একটা লজ্জার মতো বোধ করে। তাই প্রত্যেক বারেই মাথা নিচু করে নেয় সে। তখন নিজের মনে ওর চিন্তার জাবর কাটা চলতে থাকে। তখন অনেক কথা হয়তো ওর কানে যায় না।

এক সময় মুখ উঠিয়ে ও শোনে, 'কিন্তু জমি যারা কেড়ে নিয়ে গেছে, তারা এমনি ছেড়ে দেবে না। আমরা আমাদের জমি দখল করে নেব। তার জন্যে আমরা পেছ পা হব না লড়াই করতে। আমাদের ভরসা হচ্ছে, আমাদের একতা। আমরা যদি সবাই এক সংগে মিলে কাজ করতে পারি—'

এই জন্যেই লোকে ওদের খুনী বলে? লখীন্দরের কিন্তু মন সায় দেয় না ওতে। কেমন যেন মায়া হয় গোবিন্দের জন্যে, নিজের ছেলের ওপর যেমন হয়। হয়তো, সুধীরের সংগে খানিকটে মিল থাকাতে এমন মনে হচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই ওকে খুনী মনে হয় না। না, ও খুনী নয়।

আর আশ্চর্য, এই অনুভূতির সংগে সংগে ওর বুকের খানিকটে বোঝা যেন নামে। অকারণেই ও আশ্বস্ত হয়ে ওঠে।

এতক্ষণে লখীন্দর চারপাশে তাকিয়ে দেখে একবার। কাঁথের দেয়াল-তোলা বড় দালানের মতো, তাল পাতার ছাওয়া ঘর। এই আমধেড়ে গ্রামেরই রতনের ঘর এটা। বেছে বেছে এটাই মিটিংএর জায়গা ঠিক হয়েছে। সে ঘরের ভেতর চাষীরা বসে মাথা নাড়ছে। কখনো উল্লসিত হয়েও উঠ্‌ছে বা।

লখীন্দর দেখে, ভবিষ্যতের আশায় ওদের মুখগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। একজন কিন্তু হঠাৎ বাধা দিয়ে ওঠে।

'বাবু, ই কথাত শুনলুম খুব। শুনলম অনেক দিন থিকে। গেল বারের কন্‌গেরেসের আন্দোলনের সময়ও ই কথাটা শুনেছি। কেশ-পুরে আমরা লড়াইটাও করলম। বলি শুন তমার গে—আজকে কে কার ঝাড়ে বাঁশ কাটে বলত। তমার কথা শুনব কেনে আমরা। ই কথা আমি ঠিক বুঝেছি, তমরা যাই বল, আমাদের গরীব-দুঃখীর কপাল, ই কুমুকালে ভাল হবেনি, ভগমান আমাদিকে মুখ তুলে চাইবেনি, ত মানুষ কি করবে? মানুষে পারবে নি কিছু করতে।' বলে লোকটি বোকার মত এদিকে-ওদিকে তাকালো দুএকবার। ওরা কী ভাবছে, সেটা দেখবার জন্যে। তারপর নিঃঝুম হয়ে চুপ করে রইল।

গোবিন্দ বললে, ওর মুখে সেই সুন্দর হাসি, 'কংগ্রেস যে তার কথা রাখেনি সেটা আশ্চর্য নয়। রাখবে কী করে। যারা আমাদেরই মত আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো, তারা যে তখন ভুল বলেছিল তা নয়। কিন্তু কি করবে কি তারা। গদীতে বসলেই গোদা হয়। তুমি যদি একটা দোকান ফাঁদ, ত তমাকে অনেক কিছুই করতে হবে—মিথ্যা কথা বলতে হবে, খদ্দের ঠকাতে হবে, কারণ লাভ তো

তোমার চাই। এক্ষেত্রেও সেই ব্যাপার, সবই হচ্ছে লাভের। ধনী আছে, মহাজন আছে, জমিদার আছে—সব চায় লাভ। তো ওরা আর কী করবে। নিজের কোলে ঝোল টান্‌তে হয়। তো আমরা কংগ্রেসী নই, আমরা কৃষক-সভার লোক !'

লখীন্দর দেখলো, আশ্চর্য জোর দিয়ে কথাটা বললো গোবিন্দ মিত্র। প্রত্যেকের ওপর ও যেন চোখ বুলিয়ে নিল একবার।'

'আমরা কৃষক-সভার লোক। কৃষকদের নিয়ে আমাদের দল। আমরা কি চাই? আমরা এই সমাজটাকে ভেঙে নতুন করে গড়ব। এমন সমাজ যার মধ্যে লাভের ধান্দা নেই, বড় ভাইকে ঠকিয়ে ছোট ভাই যেখানে দুপয়সা কামায় না। তার জন্যে আগাগোড়া এই জমিদার ধনী মহাজনের চক্র আমরা উচ্ছেদ করব।'

একটু থেমে ও আবার বললে, 'ভেবে দেখুন, ছেলে যে জন্মায়, সে তো আর মায়ের পেট থেকে চুরি চামারি শেখে না। সে দেখে শেখে। আমরা সেই দেখবার জিনিসটুকুকে নষ্ট করব।'

হ্যাঁ? এমনই হয় বুঝি? লখীন্দর কথাটাকে লুফে নেয়। মানুষ কেন বদলে যায়, সে কথা সে অনেক বার ভেবেছে কিন্তু তার কোন জবাব পায়নি। অবিশ্যি সে জানত, অভাবে স্বভাব নষ্ট। কিন্তু যাদের অভাব নেই, তারা নষ্ট হয় কেন? হয়তো, এই জন্যেই। মানুষ লোভের মধ্যে পড়ে, পাপের মধ্যে, তারপর সে আর তার হাত থেকে ছাড়া পায় না। শেষকালে সে রাক্ষস হয়ে যায়। হ্যাঁ, অবস্থার বিপাকে মানুষ দেবতাও হয়, রাক্ষসও হয়।

'তাছাড়া কৃষকসভা কৃষকদেরই। আমরা বলিনে এ সভা সবার। এটা মহাজনেরও নয়, জমিদারেরও নয়। এর সব কিছু কাজ এবং নীতি কৃষকরাই করবে। এই যেমন ধরুন—'

কিন্তু কেমন গোলমাল হয়ে যায়, জমায়েত লোকগুলি আশা ও সন্দেহে

দুলতে থাকে। ওদের ভেতরকার প্রচণ্ড আবেগকে যেন ঠেলা দিয়ে থামিয়ে রাখে অবিশ্বাস। ওরা ঠিক বুঝে উঠ্তে পারছে না।

'যা বলছিলম। মনু দিগারের জমির ধান-তোলা ব্যাপারটা নিয়েই দেখুন। তখন তো আপনারাই সবই করেছেন। আপনাদের এই কাজ কৃষক-সভা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করবে। এ কাজ আপনাদেরই নয়, এটা কৃষক সভারও।'

দু' একজন বলে উঠ্ল, 'কই, লখীন্দদাদা কই। তুমিত সেদিন আমাদিকে মাথা দিলে। ত তুমি কী বল। বাবুর কথায় কি তমার কথা, সেইটা বল—'

'হ্যাঁ, আপনিই বলুন। আপনাদের কথা আপনাদেরই বলতে হবে—'

লখীন্দরের খুব ভালো লাগে, এই আপনি বলে সম্বোধনটা। ব্যাপারটা কিছু নয়, কিন্তু তারাও তো মানুষ, ভদ্রতা বলে একটা কিছু তারা জানে। সেই ব্যবহার করেও কখনো তারা তার প্রতিদান পায়নি। সেটা পেলে এই ভালো-লাগাটা আশ্চর্য নয়।

কিন্তু লখীন্দর অদ্ভুত রকমে বিব্রত হয়ে পড়ে। সবাই, এমন কি, গোবিন্দ পর্যন্ত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ওর কথা শোনবার জন্তে। কি করবে ও ভেবে পায় না। কোন রকম করে বলে, 'হ্যাঁ, ইটা ঠিক কথা—' তারপর আর কিছু বলতে পারে না। মুখ-খানা ওর একটু ফাঁক হয়ে গেছে, ঠোঁট দুটো কাঁপছে। কয়েকবার কিছু বলবে বলে মুখ তুললে, তারপর আবার নামিয়ে নিলে। অনেক চেষ্টা করেও তারপর বেরোল না কিছু।

দোষ নেই লখীন্দরের। এই ধরনের রাজনৈতিক সভার অভিজ্ঞতা ওর প্রথম। এর আগে ও রাজনৈতিক আন্দোলন দেখেছে, হয়তো কিছু সংযোগও ছিলো। কিন্তু সে সংযোগ অতি দূরের। অত্যন্ত আলুতো গোছের সেই যোগাযোগ। কিন্তু আজ ত এসেছে একটা

বোঝা পড়ার ভাব নিয়ে। ওর অজান্তেই হয়তো ও জড়িয়ে পড়তে এসেছে। কে বলতে পারে সে কথা।

তাছাড়া প্রথম থেকেই বিস্ময় আর নতুনত্ব, এ দুটোর ধাক্কা ও সামলে উঠ্‌তে পারছিল না। রামকে নিয়ে সন্ধ্যের পর বেরিয়েছিল লখীন্দর। শীতের রাত, শোঁ শোঁ করে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে হিজল বনের ফাঁক দিয়ে। কোনরকমে মাথায় কানে কম্বল জড়িয়ে ওরা এগোতে থাকে। ঠাণ্ডা ধুলো-ভরা রাস্তা ওদের খালি ফাটা-পায়ে যেন কাঁটা ফুটোয়। কিন্তু অভ্যস্ত বলে বিশেষ অসুবিধা বোধ করে না ওরা।

রতনদের বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকতে গিয়ে আটকালো ওদের। দুজন ছোকরা একটা জামগাছের তলায় দাঁড়িয়ে কাঁপছিল।

'কে, কে যায়?' কাছে এসে ভাল করে দেখে বলে, 'লখীন্দদাদা? যাও, যাও, যাবে বৈকি। তুমি আর যাবেনি?'

অত শীতেও কেমন উত্তেজনা বোধ করে লখীন্দর। অত বয়সেও। মনে হয় ও একটা অজানা দুঃসাহসের কাজ করতে যাচ্ছে।

ওরা তাহলে চারদিকে ঘিরে আছে। পরে শুনেছিল লখীন্দর, কোন অচেনা অবিশ্বাসী লোককে ওরা যেতে দিত না। নানা রকম কথা বলে ছল করে অন্য পথে পাঠিয়ে দিতো। আশংকার সম্ভাবনা থাকলে ইংগিত করতো ওরা। আশ্চর্য। ওখানে গিয়ে আরো আশ্চর্য হয়ে গেল লখীন্দর। ছেঁড়া তেলাই পেতে বসেছে সব। একটা টিমটিমে হ্যারিকেন জ্বলছে, সেটা গোবিন্দর হাতের কাছেই। ওর মুখটাই ভালো করে দেখা যায়। একটু জায়গা করে বসল লখীন্দর কিন্তু তখন কি একটা কথা নিয়ে সবাই ব্যস্ত ছিলো বলে ভাল করে লক্ষ্য করল না ওকে কেউ। শুধু সতীশ ওকে লক্ষ্য করে হাত নেড়ে বস্‌তে বললে।

এই নতুনত্ব একদিন কেটে যাবে নিশ্চয়ই। তখন ও হয়তো ভালো করে বলতে পারবে ওর মনের কথা। এখন ও আত্মস্থ করবার চেষ্টা করছে ওর পরিবেশকে।

সভা শেষ হবার পর, গোবিন্দ লখীন্দরকে বললে, 'আপনি একটু থেকে যান। কিছু কথা আছে।'

লখীন্দর তাই চাচ্ছিল। এতক্ষণ ধরে সভাতে এত লোকের মাঝখানে সে যেন মাথামুণ্ডু কিছুই ঠিক করে উঠ্‌তে পারছিলো না। গোবিন্দের সংগে কথা বলতে পারলে হয়তো সে তার চিন্তাধারার সংগে সব কিছু খাপ খাইয়ে নিতে পারবে।

এক সময় সব খালি হয়ে যায়, শুধু সতীশ, গোবিন্দ, রাম আর লখীন্দর থাকে। রতন ঘরের ভেতর যায় কি কাজে।

'আপনি একটু পড়াশুনো করুন।' গোবিন্দ বলে।

'আমি ?' লখীন্দর খানিকটে অবাক হয়ে শুধোয়।

'হ্যাঁ। সতীশ গিয়ে আপনাকে বই পত্তর দেবে, ও মাঝে মাঝে আপনাকে পড়বার সাহায্যও করবে। নানা-রকম বই থাকবে তার মধ্যে। আপনি পড়াশুনো করলে সব কিছু বুঝতে পারবেন। মনের জোর পাবেন।'

একটু হেসে আবার বললে, 'আপনার সেদিনকার কাজ দেখে আমরা খুব খুশি হয়েছি।'

প্রশংসা করতে গিয়ে ওর চোখ দুটো চকচক করে ওঠে, গলার স্বরে আবেগ এসে যায় খানিকটে। 'আপনি প্রাচীন লোক, আপনাকে দেখে মনে হয় আপনার অনেক অভিজ্ঞতা আছে। আপনার সব কথাই জানি আমরা। আমার কথা বলতে পারি, আমার খুব ভালো লাগছে আপনাকে। কিন্তু তাহ্‌লে তো চলবে না। আপনাকে পড়াশুনো করে সমস্ত ব্যাপারটা জানতে হবে, না জানলে আপনি

লোককে চালাবেন কি করে। আজকের সভায় আপনি প্রায় কিছুই বলতে পারলেন না। আমি বুঝতে পেরেছিলুম আপনার অনেক কিছু বলবার ছিল, কিন্তু তবুও আপনার বলা হল না। পড়াশুনো আপনাকে সেই সাহস দেবে।'

লখীন্দর কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনলে। একটি ছাত্রের মতো। ওর যখন প্রশংসা করা হল তখন ও বিগলিতও হল না। ওর ত্রুটি উল্লেখেও আহত হল না। ধীরে ধীরে গোবিন্দের বক্তব্যটুকু ও শুনে নিলে।

বললে, 'হ্যাঁ। আপনি এই যে নেকাপড়ার কথা বললেন ইটা ঠিক। আমাদের কিষ্ট মহন ঠাকুরও একদিন ই কথা বলেছিল। বলে, বাবু, মানুষ হল গিয়ে কাদা মাটি, আর বিদ্যা হল ছুঁতার। ত ঐ ছুঁতার কাদামাটি থিকে ঠাকুরের মূত্তি গড়ে। হ্যাঁ।'

'ঐ শিবের পূজরী কেষ্ট ঠাকুর? ওর কথা আমি বুঝি না।'

গোবিন্দ আহত হয়। তারই ভক্ত যেন তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পূজো করে এসেছে, এমন ধরনের একটা ভাব আসে তার মনে। কিন্তু ওকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। ওদের ভণ্ডামি বুঝবে কি করে ওরা? ভালোভালো কথার অন্য মানে করে ওদেরকে বোঝাবে। সেই দুর্দশা থেকে এদেরকে তো বাঁচাবার দায়িত্ব তাদেরই।

লখীন্দর গোবিন্দের মুখের ভাব দেখে বোঝে, নিশ্চয়ই কিছু ভুল ও করেছে। তা না হলে গোবিন্দ এমন অসন্তুষ্ট হবেই বা কেন? গোবিন্দ কিন্তু সহজভাবে বলে, 'ওরা যে শিক্ষার কথা বলে তার কোন অর্থ নেই। আপনি এই ঘটনাটা ধরুন, মনু দিগারের জমির ব্যাপার নিয়ে যেটা হল। তো কেষ্ট ঠাকুর এল একটা প্রস্তাব নিয়ে। কি না অজয়বাবুর কথা তোমরা শোন, মারামারি কাটাকাটি করে লাভ নেই। মানে বড় কুমীরের কাছ থেকে সরে এসে ছোট কুমীরের

কাছে দাঁড়াও, এই তো? মারামারি কাটাকাটি করতে ওরা বারণ করে। কিন্তু কেউ যদি তোমার গলাটা কাটতে আসে, তা হলে কি করবে? গলাটা বাড়িয়ে দেবে? দাও তার জবাব—'

লখীন্দরও বলে, ও ততক্ষণে স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। ওর চিন্তাশক্তি কাজ করতে শুরু করেছে তখন।

'ভাই গোবিন্দ, তুমি আমার চেয়ে অনেক ছোট, তমাকে ভাই বলেই ডাকি। কিছু মনে করবেনি তুমি। তুমি কথাটা শুন, তমারগে আমরা হলম গিয়ে মুখ্যু লোক। সব কথা ভাল করে বুঝতে পারিনি। তুমি এক কথা বললে ত সেটা বুঝলম যে হ্যাঁ, ইটা ঠিক। আর একজন আর এক কথা বললে সেটাও ঠিক। তবু সব সময় জ্ঞানগম্যি আমাদের ঠিক জাগেনি তাই যা তা বলে ফেলি। এই মারামারি কথাটাই ধর—তুমি কিছু মনে করবেনি ভাই—লোকে তমাকে খুনে বলে। তুমি নিজের ইস্তিরি হত্যা করেছ। ত লোকে বলে অদের ওই হচ্ছে কারবার। তাছাড়া, তুমিই বল, খুন-জখমি কি ভাল?

গোবিন্দ হাসল একটু। বেদনায় ওর হাসিটা বাঁকা দেখাচ্ছে।

'তুমি যখন আমাকে ভাই বললে, তখন আমিও তোমাকে লখীন্দদাদা বলব। সবাই তো ওই নামেই ডাকে তোমাকে।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল গোবিন্দ। ওর ভেতরে একটা তোলপাড় চলেছে, সেটাকে সামলাবার চেষ্টা করে সে। এমন প্রশ্ন সোজাসুজি তাকে কেউ করেনি। হঠাৎ তাই ব্যথা পেলেও গোবিন্দ আনন্দও পায়। এই হচ্ছে সত্য, সত্যের রূপ এমনই নগ্ন। লোকটির ওপর তার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যায়।

'জানি, জানি। লোকে আমাকে খুনে' বলে জানি আমি। কিন্তু সে কথার জবাব কাউকে দিইনি এতদিন, আজকে তোমাকেই দেব। জানো লখীন্দদাদা, ভেবেছিলুম, নিজের কথা কাউকে জানাব না,

তাতে নিজেকে ছোট হতে হয়! সেটা ভুল। শুনবার মতো লোক পেলে বলতেই হবে, বললে ভালোই হয়। আমার স্ত্রী—বললে একটু ইতস্তত করে গোবিন্দ। আমি বুঝি অন্যায়কারীকে আমি ক্ষমা করব না, কাউকে ক্ষমা করিনে আমি, কাউকে না—হয় তো হবে আমি বেশি সময় নিইনি—'

'বুঝেছি, বুঝেছি—' মাটির দিকে চেয়ে বাঁ হাতটা গালের ওপর রেখে লখীন্দর ঘাড় নাড়ে। 'অন্যায়কে তমরা ক্ষমা করবেনি। ত ভাই ই বড় কঠিন ব্যাপার। এ হল গিয়ে ধম্ম রাজার সেই চোখ। তাকে পাপ করে ফাঁকি দিতে পারবেনি কেউ। শাস্তি পেতেই হবে-'

কী জানি কেন, লখীন্দরের মনে একটা আনন্দের অনুভূতি আসে। অন্যায়কে ক্ষমা করা যায় না, তার শাস্তি আছেই।

কিন্তু এ বড় কঠিন। তার মধ্যে দয়া মায়া নেই, অন্ততো গোবিন্দ তাই বললে। কিন্তু ধম্ম রাজা, তাঁর তো দয়া-মায়ার শরীর, পাপী অনুতপ্ত হলে তার রেহাই পাওয়া যায়! তবে, তবে? কোথায় যেন একটু খটকা থেকে যায় ওর।

চৌদ্দ

অতঃপর লখীন্দর পড়াশুনো শুরু করে। সতীশ অনেক রাত্রে আসে, একটি সাপ্তাহিক পত্র থেকে কিছু কিছু পড়ে শোনায়। বলে, সাধারণ খবরের কাগজে যে সব খবর বেরোয় না, সেই সব থাকে এই কাগজে। বলে, সাধারণ মানুষের ইজ্জতের লড়াই শুধু তো আর এই ঝাঁকরা-কেশপুর-তমলুকে সীমাবদ্ধ নয়। এই লড়াই চলছে সব জায়গায়; বাংলায়, ভারতবর্ষে—পৃথিবীর সবখানে। লখীন্দদাদা, তুমি কি বাংলা দেশের কথা জানো? ভারতবর্ষ? জানবে কি করে। তোমাদের সময় তো আর পাঠশালায় ভূগোল পড়ানো হতো না। তোমরা শুধু শুভঙ্করী-মানসাঙ্ক শিখেছ। তোমাকে ম্যাপ দেখতে শেখাবো একদিন। কিন্তু সে কথা থাক। যে কথা বলছিলাম সে কথাই বলি আগে। এই সমস্ত পৃথিবী জুড়ে সাধারণ মানুষ, লখীন্দর-রাম-অখিলের মতন মানুষ, লড়াই করে চলেছে। এটা আমার লড়াই, ওটা তোমার লড়াই, তা নয়। সবার লড়াই সমান, একই উদ্দেশ্য সফল করবার জন্যে লড়াই। তাই, জানো লখীন্দদাদা, আমাদের একটুও ভয় নেই, আমাদের আশংকা নেই। আমরা জানি আমরা জিতবই। আজ যদি ওরা বন্দুক ছুড়ে থামিয়ে দেয় কেশপুর ঝাঁকরাকে, কাল লড়াই চলবে কোলকাতায়। বাংলা দেশকে ঠাণ্ডা করলে চলবে ব্রহ্মদেশে। হ্যাঁ, চলছেই তো। সে-কথা তোমাকে বলব একদিন। তুমি নিজেই জানতে পারবে। এই কাগজখানা পড়ো, প্রত্যেক হপ্তায় তোমাকে আমি দিয়ে যাব। এর মধ্যে সত্যি কথা লেখা

থাকে বলে সরকার বে-আইনী করে দিয়েছে এই কাগজ। কিন্তু পারবে না ওরা, যা সত্য, চিরকাল তারই জয় হয়।

লখীন্দর প্রথম প্রথম ছেলেমানুষের আনন্দ নিয়ে শুরু করে। 'সতীশ ইটা আবার কেমন হল বল দিকিন। তুমি আবার আমার ম্যাষ্টর হলে যে গো। আগে বুড়োরা ম্যাষ্টর হত এখন ছকরারা হয়—হ্যাঁ-হ্যাঁ—'

সতীশও হেসেছিলো: 'আজকাল আমরাই যে বেশি জানি।"

কিন্তু এই লঘুতা থাকে না। দুদিন-চারদিন পরেই ওর মাথা ধরে আসে। রামায়ণ মহাভারত লখীন্দর পড়েছে, একরকম মুখস্থই হয়ে গেছে বলতে হবে। কিন্তু এই কাগজের নতুন বানান, নতুন ভাষা। একই লাইন হয়তো ওর কয়েকবার ধরে পড়তে হয়েছে। সপ্তাহের শেষে সতীশ নতুন কাগজ এনে তাড়া দিয়েছে, আগেরটা শেষ হয়েছে কি না। না, হয়নি। পারেনি লখীন্দর শেষ করতে।

তাছাড়া বুঝতেই বা পারে সে কতটুকু। ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ, মালয়, চীন, জাপান (হ্যাঁ, চীন-জাপানের যুদ্ধের কথা সে শুনেছিল আগে) সোভিয়েট, আমেরিকা—এত সব দেশ আছে পিথিমীতে? কোথায় সে-সব। প্রত্যেকটি অজানা শব্দ তার ভেতরটা তোলপাড় করে তোলে। সে কথার মানে না জানা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। উপনিবেশ কী। সাম্রাজ্য কাকে বলে?

দিনের পর দিন চলে যায়। রোজ রাত্তিরে লম্ফ জ্বেলে পড়তে বসে লখীন্দর। কখনো উচ্চারণ করে পড়ে, কখনো মনে মনে। এক সময় তার চোখ জ্বালা করে মাথা টিপ টিপ করে। তারপর আলোটা নিবিয়ে দেয়। আর তারপর তার যন্ত্রণার সীমা থাকে না। প্রায় শেষ রাত পর্যন্ত বিছনায় এপাশ-ওপাশ করে লখীন্দর। চিন্তায় তার মাথা কুরে কুরে খায়। আজকাল আর সুধীর তার কাছে শোয় না।

ভালোই হয়েছে। তাছাড়া বাবাতে ছেলেতে প্রায় কথাবার্তা নেই। সুধীর আজকাল কী করছে সে-দিকে খেয়ালই করে না ও। শুধু কি তাই। অধীর আর টুকি ওর কাছে আর আদর পায় না আগেকার মতো। একদিন অধীর বললে, 'বাবা, উটা কী পড়ছ? আমাকে দাও।' আচ্ছা সে হবেখন। এখন যা। টুকি একদিন রামায়ণ পড়তে বলেছিলো। সেও আর একদিন হবে। ওরাও আর তার কাছে আসে না।

স্ত্রী গৌরীবালা কিন্তু বলে, 'ওগো তমার শরীলটা কি হচ্ছে দিন দিন। তুমি রগা হয়ে যাচ্ছ? সবই সে বোঝে, কিন্তু কেমন যেন এক নেশার মতো হয়ে গিয়েছে, তাকে পড়তেই হয়। তাছাড়া সকাল বেলা যখন সে বিছানা থেকে ধড়মড় করে উঠে লাঙল কাঁধে করে মাঠে যায়, তখন তার এত ভাল লাগে। রাত্রের সব ক্লান্তিই ভুলে যায় সে। রাস্তায় বা মাঠে ওর সহকর্মীরা ওকে নানারকম প্রশ্ন করে। ও তার জবাব দেয় দৃঢ়তার সংগে। 'বুঝলে কিনা ভাই, এই সমাজের রন্ধে রন্ধে গলদ, হ্যাঁ। যত দুঃখ সব এই সমাজের অবস্থার জন্যে।' নতুন শিখেছে এই কথা সে। কিন্তু 'সমাজের রন্ধে রন্ধে গলদ' এই কথাটা বলতে সে খুব আনন্দ পায়। লোকে তার কথা মন দিয়ে শুনছে, এটা ভেবেও তার আনন্দ হয়। কিন্তু অহংকার নেই ওর। অতি মনোযোগের সংগে ও শেখে। যা শেখে তার সংগে মিলিয়ে নেয় নিজের অভিজ্ঞতা। অনেক সময় তার অভিজ্ঞতা থই পায় না, সেখানে যুক্তি দিয়ে ও বিশ্বাস করে। তারপর মেনে নেয়।

সেদিন মিটিংএর শেষে রাস্তায় আসতে আসতে গোবিন্দ তাকে এই সমাজের কথা বুঝিয়েছিলো। নানা কথা বলবার পর বললে, 'আমার কথাই ধর লখীন্দদাদা। এম্-এ পাশ করেছি আমি। একটা

ছেলেকে এম-এ পড়াতে কহাজার টাকা খরচ হয় বলতে পার? কি করে পারলুম আমি? লোকে বলে, ছেলেটার বুদ্ধি আছে। সোনার ছেলে। ওসব কিছু নয়। সব ছেলেই সোনার ছেলে। সবাই পারত। তাহলে পারে না কেন—এ কথা হয়তো তুমি শুধোবে। হ্যাঁ, তার আগে একটা কথা বলি। গাঁয়ের মণি মুখুজ্জেকে তো জানো তুমি। সে বলেছিলো, ও সব ভাগ্যে হয়। হ্যাঁ, এইটেই হচ্ছে আসল কথা। যত সব বড় হয়েছে দেখেছ, সব ঐ ভাগ্যের জোরে। ওদের নিজেদের কিছুমাত্র জোর নেই। আমি ম্যাট্রিক পাশ করলাম একজনের দয়ায়, তারপর স্কলারশিপ—ষ্টাইপেণ্ড কত কী। দাঁড়াল গিয়ে ব্যাপারটা তাহলে এই। শুধু ভাগ্যের জোর বরাতের জোর। আমার সংগে চল্লিশটা ছেলে পড়ত ইস্কুলে, তারা আজ কোথায়? তুমি হয়তো বলবে, ভাই তোমার বুদ্ধির জোরে তুমি পেয়েছ সুযোগ। কে বলে ওদের বুদ্ধি ছিল না? আরে আমি তো বোকা ছিলাম এক নম্বর। শুধু পেয়ারা গাছ জাম গাছ করে বেড়াতুম। মাথা তো খুলল ম্যাট্রিকের তিন বছর আগে। ভাগ্যিস একটু আগে-ভাগে বুদ্ধিটা খুলেছিল। ব্যাপারটা এখানেই শেষ নয়, যে-কদিন বুদ্ধি খোলেনি সে-কদিনের খবর কে রাখে। সে তো আমি জানি আর আমার মা। মা আমাকে খাওয়াত পরাত, ইস্কুলের মাইনে দিত। কী করে জানো? ধান ভেনে, ঘুটে কুড়িয়ে। কতটুকু সেটা। একটা এম-এ পাশ করবার তুলনায়, জোর মা না হয় দুশো টাকা দিয়েছে, আর ইস্কুলের প্রেসিডেন্ট, বা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল—ওরা, ওরা সে জায়গায় অন্ততো বিশ হাজার টাকা দিয়েছে। বলো দেখি, কোনটার দাম বেশি।'

এই সময় গোবিন্দ থামল। লখীন্দরও উৎকর্ণ হয়ে ছিলো। তারপর?

'মা আমার একটা পয়সার সাহায্য পায়নি আমার কাছ থেকে

কিন্তু মরবার সময় মা কী বলে গেল জানো? বললে আবার বিয়ে করিস। করবি তো? বল দিকিন লখীন্দরদাদা, এর দাম কেউ দেবে? কে মাপ করবে এই আত্মত্যাগের, এই মহত্ত্বের? মায়ের দাম আমার কাছে ওই দুশো টাকা।'

গোবিন্দ আবার বললে, 'অরা কিন্তু বলবে, মায়ের ভাগ্য খারাপ। কারণ সে সুযোগ করে নিতে পারেনি নিজের জন্যে। জানো লখীন্দ-দাদা, এই জগতের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা যারা, তারা শেখায় সুযোগ করে নাও। সুযোগ দিতে বলে না। তাহলে নবজাত শিশুর কী হবে? বাবা-মা সেই কথা তো বললেই পারে। মানুষ সুযোগ পেলে তবে তো সে সুযোগ দিতে পারবে। তা নয়, 'সুযোগ করে নাও, কেড়ে নাও অন্যের সুযোগ।'

প্রসংগত অন্য কথায় সরে যায় গোবিন্দ তারপর।

'এই হচ্ছে লাভ এই করে করে কী হয়েছে? লক্ষ লক্ষ মানুষ আজকাল অতি দুর্বল, অকেজো। তারা শক্তিসঞ্চয়ের সুযোগ পায় নি বলে রেখে যেতে পারছে না শক্তির উত্তরাধিকার। শুধু ঘৃণা, ভালোবাসার পরিবর্তে শুধু স্বার্থপরতা রেখে যাচ্ছে। নিজেদের মধ্যে শুধু প্রতিযোগিতা, অন্যকে ঠকিয়ে কে কতখানি আদায় করতে পারবে, তারই চেষ্টা প্রত্যেকটি লোক করছে। একসংগে মিলবার পথ নেই। তাই শক্তিও নেই তাদের। অবশ্য, যাদের ভাগ্য ভাল (ভাগ্য কথাটার ওপর জোর দিয়ে বলে গোবিন্দ) তারা শক্তি সঞ্চয় করছে। আর সেই শক্তি দিয়ে অন্যের শক্তি কাড়ছে।'

তাহলে? তাহলে কি উপায়? মানুষের কী বাঁচবার পথ নেই?

আছে। অতি পরিষ্কার সে পথ। আবার জটিলও বটে। একদিনে তো সব বোঝা যায় না। একটু একটু করে সব বুঝতে হয়, অনেক পড়াশোনা করতে হয়।

বারবার করে গোবিন্দ বলছে, পড়াশুনা করো। পড়াশুনা করো।
তাহলে সব বুঝতে পারবে।

ধীরে ধীরে লখীন্দরের চিন্তাধারায় এক আশ্চর্য পরিবর্তন আসে। অতি স্পর্শ-কাতর মন ছিলো তার। সাধারণ কৃষকের ধর্ম-অধর্মের জ্ঞান আর রুচিবোধ নিয়ে সে মানুষ। প্রাচীন মুরুব্বিদের কথা—সে অভ্রান্ত বলে মানত। মানুষের দুঃখ কষ্ট ব্যথা তার চোখে পড়বেই। মানুষের ত্রুটি বিচ্যুতি পাপ নীচতা তার চোখে এড়াতো না। কিন্তু কোনদিন সে মানুষকে ঘৃণা করেনি। তাদের জন্যে সমবেদনায় সে কাতর হয়ে উঠ্‌তো। ব্যথাই পেতে জানতো সে, আর সেই অপরিসীম ব্যথার সামনে অসহায় হয়ে চুপ করে থাকতো।

কিন্তু এখন আর তার দুঃখ বোধ হয় না। বুকের ভেতরটা মুষড়ে মুষড়ে ওঠে না কারো বেদনার কথা শুনলে। এখন তার মন চলে যায় সেই বেদনার পেছনে। সে ভাবে ওই বেদনার কারণ হচ্ছে, এই। এতো শুধু তোমার নয়। হাজার হাজার লোকের ওই এক অবস্থা।

কিন্তু তাতে আর কি যায় আসে। একজনের দুঃখকে অসংখ্য লোকের মধ্যে অনুভব করলে তার বিরাটত্ব বাড়ে। কিন্তু আশ্চর্য, একথা বোঝার সংগে সংগে লখীন্দরের নিজের দুঃখ-বোধ অনেক কমে যায়। কি যেন সে একটা অনুভব করে, সে ঠিক বুঝতে পারে না। হয়তো সেটা সুখানুভব, হয়তো সেটা উৎসাহ বোধ।

কথাটা সে সতীশকে বলেছিলো একদিন। ঠিক মতো গুছিয়ে মনের কথা বলতে সে পারেনি, কিন্তু কোনরকম করে জানিয়ে ছিলো। সতীশ বললে, 'তোমার মনের ভিতরটা সবটুকু তো বুঝতে পারছি নি। তবে, জানবে তুমি, এই বোধ তোমার হয়েছে কেন না তুমি জ্ঞান লাভ করছ। এই শক্তিতেই আমরা একদিন জিতব।'

যতই দিন যায়, ততই দুঃখের মূর্তিগুলি একটু একটু করে সরে যায় যেন ওর কাছ থেকে। অনেক পেছনে ফেলে এসেছে যেন ওগুলোকে। মনে হয়, ওগুলো একটা মরা পাহাড়, সেটাকে সরাতে কষ্ট হবে। আবর্জনা তোলার কষ্ট। কিন্তু তারপর! কি এক আশ্চর্য আনন্দে ও চোখ বন্ধ করে। মুক্তি! পরিষ্কার আলো-আকাশ-হাওয়া! আঃ!

লখীন্দদাদা, দেখলে তো তাহলে। পড়াশুনার কি গুণ দেখলে তো। কাজেই পড়ো, আরো ভেতরে যাও, আরো তলিয়ে দেখ। আর যখনই তুমি বুঝতে পারবে ভালো করে কেন এই রকম হয়, তখনই দেখবে ঐ দুঃখের-আবর্জনা সরিয়ে ফেলা কত সহজ। কিন্তু তা করতে হলে সংকীর্ণ হলে চলবে না। বড় করে, সমস্তটা মিলিয়ে এক করে দেখতে হবে। একেবারে গোড়ায় গিয়ে ঘা দিতে হবে।

অতএব সতীশ একটা ছোট্ট বই খুলে বসে। তার প্রথম লাইন শুরু করে'

'একটা প্রেতাত্মা ইউরোপকে শাসাচ্ছে, সাম্যবাদী প্রেতাত্মা।'

লখীন্দদাদা, কাদের ভয় দেখাচ্ছে জানো। যারা মানুষকে দুঃখ কষ্টের মধ্যে ফেলে রাখতে চায়। মানুষের দুঃখ কষ্টকে স্থায়ী করে রেখে যারা নিজের সুবিধে করে নিতে চায় তাদের। আর প্রেতাত্মা কী জানো। যা সত্য যা কল্যাণ তাই হচ্ছে ওদের কাছে প্রেতাত্মা। সত্য কথাকে ওরা ভূতের মতো ভয় করে।

লখীন্দর ঘাড় নাড়তে থাকে।

'বুঝেছি, বুঝেছি! ইটা আমিও দেখেছি। সাধু-সন্ন্যাসীর ভয় নাই, কথাও তার ভয় নাই। আর যত সব বড়লোক বদমাইস, ত অদের রাত্রে ঘুম নাই। ভয়ে অরা আধ মরা হয়ে থাকে।'

'হ্যাঁ ঠিক। কিন্তু কেন ওরা এমন হল।' মানুষের ভাগ্যকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার অধিকার ওরা পেল কোথা থেকে। বলি শোন।

এই বইয়েই আছে। মানুষ যখন অতি প্রাচীন কালে অসভ্য ছিলো, তখন তারা নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করত না। ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই হত না তখন। তারপর এল মানুষের অহং ভাব। কেবলমাত্র নিজেকে দেখ্‌তে শিখল মানুষ, ভাবতে লাগল নিজের কথা। কিন্তু যারা নিজের কথা ভাবলে বুঝলে নিজের কথা তখন আর তাদের পায় কে। অন্তকে বুঝবার সুযোগ তারা দিলে না। কেবল নিজের কোলে ঝোল টানল অন্যের ভাগ থেকে। অন্যে যদি গেল তো তোমার কী। তুমি বাঁচলেই হল। আর ক্রমাগত আনন্দ যদি পেতে চাও অন্যের আনন্দ কাড়ো। আর ক্রমাগত ক্ষিদে বেড়েই গেল।

এই ক্ষিদের মূর্তি কী জানো লখীন্দদাদা? ব্যবসা। এই ব্যবসাই লাভের লোভে মানুষকে মারে। প্রাণে নয়, তার মনটাকে নষ্ট করে। তাকে নির্জীব করে দেয়। তার মধ্যে যা কিছু ভালো সব নিংড়ে তাকে একটা কাঠের পুতুল বানিয়ে রাখে। আর যখন খুশি যেমন খুশি নাচাতে চায় তাদের। কিন্তু মানুষতো আর কাঠের পুতুল নয়। ক্রমাগত তাদের শুষে নিলে এক সময় তাদের আর কাজে লাগানো যায় না। তারপর সেই শোষণের চৌহদ্দি বাড়ে, প্রথমে নিজের দেশ, তারপর বিদেশ। তার ফলেই তো উপনিবেশ হল, সাম্রাজ্য হল।

ভারতবর্ষের কথা জানো তুমি? ইংরেজ এদেশে এসে এদেশের মানুষ মেরে তাদের মাল চালালে। জানো কিসের জোরে? নতুন মাল দিয়ে নতুন অস্ত্র দিয়ে। আর সেই নতুন মাল আর অস্ত্র পেলো কোথেকে তারা? না বিদ্যে থেকে। বিদ্যেকে খাটিয়ে তারা মানুষ মারে। বিদ্যেকে মানুষের কাজে লাগায় না।

কিন্তু আমরা কি তা সইতে পারব? বিদ্যেয় আমরা ওদেরও আগে। মানুষের আত্মজ্ঞান তো কয়েকজনের জন্যে নয়। সবার জন্যে। সবাইকে সে-জ্ঞান না দিলে সেটা হল অহং, আর অহং কি জানো?

নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করে মরা। ওদের অবস্থা হচ্ছে তাই। লোভ যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে ওঠে, তখন ওরা নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করে। যুদ্ধ করে। আর রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখড়ের প্রাণ যায়। হ্যাঁ।

তাই ওই বিশ্বে ওই ওদের সব আয়োজন সবার জন্যে আমরা চাই। এই ব্যবস্থাটা বদলাব আমরা। মানুষকে বাঁচাও, তুমিও বাঁচবে। তা না হলে তোমার ভাগ্যে অশান্তি, কাটাকাটি, যুদ্ধ। বলো, কোনটা ঠিক।

কিন্তু এই সত্যি কথাটাকে সইতে পারে না ওরা। ভূতের মতো ভয় করে।...

প্রায় তিন মাসের ওপর হল। লখীন্দর ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ওর প্রাণের এক ধারালো উৎসাহ যতই বাড়ে, ওর শরীর ততই কাহিল হয়ে যায়।

রাস্তা হাঁটবার সময় ওকে অত্যন্ত আত্মগত দেখায়। কি যে চিন্তা করে ওই জানে। কিন্তু একটা হাসি দেখা দেয় ওর মুখে। সে হাসি ঠিক বিষণ্ন না উজ্জ্বল ঠিক বোঝা যায় না। কিন্তু ভালো করে কারো সংগে কথা বলে না সে। একটু বেশি পরিশ্রম করলে ও হাঁপিয়ে ওঠে।

ভাত খেতে বসে পাঁচটা সুখ-দুঃখের কথা আর সে বলে না। একদিন একটা ব্যাপার ঘটলো এই নিয়ে। স্ত্রী গৌরীবালা ওর পায়ে ধরে মেঝের ওপর পড়ে কাঁদতে লাগল। ভাত খেয়ে লখীন্দর আঁচাতে যাবে বলে উঠছে, এমন সময় দড়াম করে ও পড়লো এসে।

লখীন্দর মহাবিব্রত হয়। কি করবে অনেকক্ষণ ও কিছুই ঠিক করতে পারে না। এক সময় বলে, 'ছাড়, পা-টা ছাড়। কি হইচে তমার বল।' কিন্তু কিছুতেই গৌরীও পা ছাড়ে না। শুধু ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে।

পনের

গৌরী এমন আচরণ কখনো করেনি। কোনদিন মুখ ফুটে কোন কিছু বলতে পারতো না ও। কতো বার লখীন্দর তাকে বলেছে, 'কেমন ধারা মেয়া তুমি। তুমি লিবেনি আমার ঠিঙে কিছু মেগে ?' তারপর নিজেই হয়তো কিনে এনেছে একজোড়া নক্সী শাঁখা, নয়তো ফ্যাসান-মাফিক কোন শাড়ি।

গৌরী কিন্তু বলেছে, 'ছিঃ, মেয়ামানুষ কি আবার লিজের তরে জিনিস মেগে লিবে, ছিঃ। সে তুমি যা দিবে তাই আমার ঢের। কোনো দিন নিজেকে কারো কাছে প্রকাশ করেনি। এক একবার হয়তো অতিষ্ঠ হয়ে বলেছে, 'এই যে গেরস্তর ঘরকন্না দুবেলা ধানভানা-ভাত-রাঁধা ই আমার দ্বারা হবেনি আর। ই আমার দ্বারা হবেনি। রইল তমাদের সব, আমি বাপের ঘর চললম।' একদিনের জন্যে চলেও যাবে হয়তো, এইতো ও গাঁয়ে বাপের বাড়ি, তার পরের দিন সকাল-বেলা এসে বলবে, 'জানি যে আমি। ভাত রাঁদবে কে রাস্তে, ত সবাই মুড়ি খেইচ। হ্যাঁ' তাছাড়া সব চুপচাপ। কেউ কোনদিন ওর কথা চিন্তা করে দেখেনি।

আজ কিন্তু লখীন্দর ওর কথা শুনে অবাক হয়ে গেল।

'ওগো, আমি আর ইটা সহ্য করতে পারিনি। তুমি কেমন হয়ে যাচ্ছ দিন দিন। লোকে কি বলে। বলে তোদের সব্বনাশ হবে। তমাকে ধরে লিয়ে যাবে সিপাই। তমাকে মেরে ফেলবে। তমি কি বই পড়, ঐ দেখলে তমাকে আর রাখবেনি।'

একেবারে নয়। অতি ধীরে ধীরে কান্নার ফাঁকে ফাঁকে বললে গৌরী। অনেক কথাই জড়িয়ে গেল। উদ্বেগ আর ভয়ে পরিষ্কার করে উচ্চারণ করতে পারছিলো না সে।

'তুমি ছ্যানাগুলার দিকে একবার চাও। তমার অধীর আর তমার কাছে যায়নি, টুকি কেমন রগা হয়ে গেছে দেখছ। আর সুধীর যে মচ্ছি-মাস্থ ঘর এসোনি গো। রাস্তে সে কথা থাকে। তুমি তমার সংসার লাও। ই দেখে আমি কেমন করে বাঁচব।' কান্নার বেগ বাড়ে। সমস্ত শরীরটা ওর কেঁপে উঠ্ছে।

বছরের পর বছর ধরে যে সংসার গড়ে উঠেছে, সে-সংসার নাড়া খেল আজ। আজ লখীন্দরের গৃহিণী আশংকায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। লখীন্দর কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজে বুঝতে পারে না। একে আজন্ম ও অশিক্ষিত, কোন রকম মস্তিষ্কচর্চা খুবই কম ওরা করেছে। যা কিছু ব্যাপার সবেই তো প্রায় হৃদয়ের প্রাধান্য! তাই সহসা ও কিছু বলতে পারে না। অন্যান্য বারের মতো গৌরীকে ধমক দিয়ে থামাতেও পারে না ও। সান্ত্বনাও পারে না দিতে।

সব চেয়ে ওকে বিমূঢ় করে তোলে ব্যাপারটার আকস্মিকতা। একবারও সে ভাবেনি যে, তার স্ত্রী এইভাবে তার সম্বন্ধে চিন্তা করছে। তার সংসারে এমন একটা কিছু ঘটেছে, যার জন্যে সেই দায়ী। লখীন্দর তখন আর কিছু বলে না। আস্তে আস্তে নিজের ঘরে আলো জ্বালিয়ে বসে থাকে। এক সময় রাত্রি গভীর হয়ে আসে। ও আস্তে আস্তে নিচে নেমে আসে ছেলে দুটোকে দেখবার জন্যে।

ওদের মাথা-সিথানে একটা পিদিম জ্বালা। শোবার সময় গৌরী বোধ হয় উস্কে দিয়েছিলো। অধীর মাকে জড়িয়ে শুয়ে আছে। আর এদিকে টুকির গায়ে একটা কাঁথা জড়ানো। শোবার দোষে টুকীর ডান পাটা বেরিয়ে গেছে কাঁথার বাইরে, কাঁধের বুকের অনেকটা

খোলা। ছিঃ ছিঃ এইতো ফাল্গুনের মাঝামাঝি, এমন সময় শীতে ওর কষ্ট হয় না।'

কাছে এসে আস্তে আস্তে কাঁথাটা ঠিক করে দিলো লখীন্দর। কিন্তু কি হয়েছে ওর চেহারার অবস্থা? গাল দুটো পাতলা শুকিয়ে গেছে। গলার কাছটা ধুক ধুক করছে। ঘুমের ঘোরে দু'একবার জিব নেড়ে ঢোক গিলল টুকি। বোধ হয় ওর তেষ্টা পেয়েছে।

লখীন্দর অতি সন্তর্পণে জাগালো ওকে। আস্তে আস্তে বললে, 'টুকি চল মা, আমার কাছে শুবি।' এই রকম ডাকে অত্যন্ত অভ্যস্ত ছিলো টুকি। আর এই ডাক পেলে আনন্দে ছুটে যেতো ও। আজও চলে গেল ওপরে।

লখীন্দর ওকে শুইয়ে নিজের লেপটা মুড়ি দিলে, নিজে বসে রইল ওর পাশে।

'হ্যাঁ মা টুকি, আমার উব্‌রে তরা রাগ করেছু লয়?

'না ত। রাগ করিনি। কিন্তু দেখ, তুমি আর আমাদিকে ভালবাসনি। আমরা তমার পর হয়ে গেছি। তুমি আর আমাদিকে দেখনি বলে মা রোজ কাঁদে। রোজ কাঁদে।

হঠাৎ ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে আসে সব। গৌরীকে নতুন চোখ দিয়ে দেখে লখীন্দর। এতদিন নিজেকে পেছনে রেখে কাজ করত গৌরী। কিন্তু কী মহৎ ভালোবাসা দিয়ে ও সংসারটা গড়ে তুলেছে। এত সব তো তারই জন্তে। পাকে পাকে জড়িয়ে আছে সে। হঠাৎ সেই কান্না-ভরা চোখ দুটো মনে পড়ে গৌরীর।

'বাবা, তুমি কি পড় সব রোজ! তুমি আর উ সব পড়বেনি।' লেপের ভেতর থেকে হাত বের করে বাবার হাত ধরে টুকী। 'না তুমি আর উ সব পড়তে পাবেনি। হ্যাঁ।'

'না, মা। উ সব আর পড়বনি—'

লখীন্দর জানে না ও কি বলছে। ঠিক এখনই ও একটি নিবিড় এবং তীব্র অনুভূতিতে আচ্ছন্ন। এখন যেন মনে হয়, ওদের সবাইকে বুকে করে রাখে। সেই সংসারী মানুষ, তার স্ত্রীপুত্র কন্যা আছে, তার ওসব চলে না।

সত্যিই তো। যদি তার কিছু হয়? যদি মারা যায় সে? তাহলে তার সংসার লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। সুধীর একলা, তাছাড়া সে ছেলে মানুষ, সে কি করে চালাবে? না হয় না, তার ওসব করা চলে না।

'মা টুকি তুই ঘুমি' পড়। ঘুমা তুই—' বলে ওর মাথায় চুলে, মুখে হাত বুলিয়ে দেয় ও। লখীন্দরের বিশ্বাস হয়, হ্যাঁ, এসব কাজে বিপদ আছে। সংসারী মানুষদের পক্ষে এ সব কাজ নয় হয়তো। সেদিন সতীশের সংগে তার কথাবার্তা মনে পড়ে। সতীশকে হেসে বলেছিল সে, 'ত ভাই, এবার একটা বিয়ে-থা করে ফেল। লাল টুকটুকে বউ আসুক একটা। তারপর দাদা-লাতিতে মিলে কদিন খুব আহ্লাদ করা যাবে।' তার জবাবে সতীশ বলেছিলো, 'ওসব হয়নি, লখীন্দ দাদা। ওসব আমাদের জন্যে নয়। বিয়ে থা করে সংসারে জড়িয়ে পড়ি যদি, তাহলে? তাহলে কাজ করব কখন।' লখীন্দর বলেছিলো; 'না ভাই, ই কথা তমার ঠিক লয়। সংসার ধম্ম করতে হবে বৈকি। অত বড় যে ভোলা মহেশ্বর, তারও ত পার্বতী আছে। ত এই হল ব্যাপার। সংসার ধম্ম খুব বড় ধম্ম, দাদা। উটি নালে মানুষ পবিত্তি হবেনি। হ্যাঁ।'

সে কথা ভুল বলেছিলো লখীন্দর। সতীশের কথাই ঠিক। কিন্তু কি করে তাহলে ওরা সংসারী লোককে দলে টানে?

এক এক করে সমস্ত ভেবে দেখে লখীন্দর। কোথায় একটু একটু করে ভেসে চলেছে সে? গেল বছরের মজুর-আন্দোলনের কথা ওর মনে পড়ে। তখন অন্যান্য মজুরদের মতো সেও কাজ বন্ধ

করেছে। ধর্মঘট করেছে। তার জন্তে কম শাস্তি পায়নি ওরা। ভাগ্যক্রমে সে নিজে কিছু বিপদে পড়েনি। তারপর, এই সেদিন মনু দিগারের জমির ব্যাপারটা ঘটে গেল। লাঠির ঘাটা যদি জোর হতো আরো ? তাহলে ?

তাছাড়া, এদের নীতিই তো হচ্ছে এই। লড়াই করে আদায় করা। তার জন্তে যে কোন বিপদের জন্তে তৈরী থাকতে হবে। সে তো দেখেছে, সেবার মজুর আন্দোলনের সময়, মেয়েদের সংগে পর্যন্ত সংঘর্ষ হয়েছে পুলিসের। মান-ইজ্জত ছেড়ে মেয়েদেরকেও যদি নেমে আসতে হয়, তাহলে, তাহলে একটা ওলট-পালট হবেই। ওদিকে চাষীরা তো ক্ষেপে আছে। তারা তো বলে, বাবা, লাঠি দাও, বন্দুক দাও। লড়াই তারা করতে চায়। আর একথা তো সত্যি, দু একজায়গায় রাত্রে লাঠি খেলা হয়। কোথায় যে কি হচ্ছে সে সব খবর রাখে না। কিন্তু সে বুঝতে পারে, একটা কিছু চলছে ভেতরে ভেতরে। মনু দিগারের জমি নিয়ে মারামারির পর, কয়েক জন লখীন্দরকে বলেছিল, 'এখন না হয় লাঠিতে ব্যাপারটা মিটল। কিন্তু পুলিসের সামনে দাঁড়াবে কি করে। এঁ্যা ?' তখন ওসব কথায় কান দেয়নি সে। তখন তার বুকে সাহস ছিল। মনে প্রতিজ্ঞা ছিল, যাই ঘটুক না কেন, যা সৎ কাজ তা করতেই হবে। এখন কিন্তু সমস্ত কিছুর অতি বাস্তব রূপটি তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে। না, সে পারবে না। পারবে না ওর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে। ঠিক তার পরের দিন থেকে যথারীতি আগেকার মতো জীবন শুরু করে সে। নিজের কাজ নিয়ে মেতে থাকে সে। রাত্রে পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। সে সময় অধীরকে মানসাংক করায় বা কখনো কখনো রামায়ণ পড়ে। লাউ মাচা, গোয়াল-ঘর, মরাইয়ের চাল, এই নিয়ে বিকেলের অবসর কাটায় সে।

কিন্তু কয়েক দিন মাত্র। তারপর তার মনের এই উৎসাহ কোথায় উবে যায়। ক্রমে ক্রমে আবার গাফিলতি আসে। পুনরায় সে পড়াশুনো করতে বা কৃষক-সভার কাজের সংগে যোগ রাখতে পারে না বটে, কিন্তু তার প্রাত্যহিক কাজ ভালো লাগে না।

বিশেষ করে একটা ব্যাপারে সে অত্যন্ত মনমরা হয়ে উঠে। সে তার বড় ছেলে সুধীরের আচরণ। এই কমাস সুধীর তার সংগে প্রায় কথা বলেনি। সেদিকে খেয়ালও করত না লখীন্দর। কিন্তু সমস্ত শুনে তার লজ্জার সীমা থাকে না।

সুধীর প্রায় সমস্ত গ্রামটাকে অস্থির করে তুলেছে। জোর করে টাকা আদায় করছে আগামী দোল-পূর্ণিমায় শীতলা পূজার জন্যে। সে এবারে একটা কিছু দেখাবে। কিন্তু টাকা আদায় করার পদ্ধতিটা শোনো। মানুষের পাপ কাজের দাম হিসেবে টাকা নেয় সে। মানুষ যদি কোথাও কোন পাপ করল তো ওদের দল আছে, তার চোখ এড়াবে না। কেউ অস্বীকার করলে, শাসাবে। বলবে, যদি না দাও, তাহলে তোমার আর তোমার পরিবারের সবটুকু কেচ্ছা টেনে বের করব। মা-মাসি-বোন-বউ নিয়ে ঘর করো তোমরা। সাবধান হও। তাছাড়া দুর্নাম বানাতে কতক্ষণ, আর সে নিয়ে হৈ-হৈ পড়তেই বা কতক্ষণ। পূজোর দিন যতই এগিয়ে আসে ওদের জুলুম ততই বাড়ে। লোকজন এসে লখীন্দরকে ধরলে লখীন্দর বলে, 'আমি জানিনি বাবু, আমি জানিনি। আমাকে বলনি উসব।' আর ব্যথায় সে বিবর্ণ হয়ে যায়।

একদিন সে ছেলেকে ডেকে ধমকায়। আর চুপ করে থাকতে সে পারে না। পাড়ায় পাড়ায় রটে গিয়েছে, তার ছেলে 'খেমটা-নাচ' করাবে, কবি বসাবে। যত রকম বাজনা বাদ্যি আছে সব করবে। এটা কি করে সইবে লখীন্দর। যা কোন কালে

হয়নি, সেটা এবারে হবে কেন। আর তার দায়িত্ব তার ছেলের উপরেই পড়বে বা কেন।

'ওরে, উসব খারাপ কাজ করতে নাই। খারাপ কাজ করলে চরিত্তি নষ্ট হয়। তার চেয়ে তরা যত পারু বাজনা বাদ্যি কর। থালে লোকে কিছু বলবেনি।'

সুধীর চটে লাল হয়। 'কুন শালা বলবে আমার চরিত্ত খারাপ। কুন শালার ঘরে নজর দিছি আমি বলু সে।'

সুধীরের ঐ মুখ-পাতালামো গেল না। বাবার কাছে মুখ খাটো করতে নেই, একথা কিছুতেই মনে রাখবে না সে।

'ওরে সে কথা লয়। তোদের এই কাঁচা বয়েস, কখন মানুষের মতিগতি টলে কেউ সে কথা বলতে পারেনি। ত একটু সাবধানে থাকবি।'

সুধীরকে বাধা দেবার ক্ষমতা নেই যখন, তখন যতটা পারে ওকে সাবধান করে দিতে চায় লখীন্দর। সুধীর কিন্তু কথাটা উড়িয়ে দেয়। বলে, 'উ মতিগতি আমার ঠিক থাকবে। সে লিয়ে তমাকে আর মাথা ঘামাতে হবেনি—'

পূজো কাটল মহা ধুমধাম করে। কদিন গাঁয়ের লোক খুব মাতামাতি করলে। পাশাপাশি কয়েকটা গ্রামে একটা হৈচৈ পড়ে গেল। সুধীর ধন্যবাদ পেলো অনেক। হ্যাঁ, একটা ছেলে বটে। লখীন্দর কিন্তু কিছুতেই এটাকে প্রসন্ন ভাবে নেয়নি। কি করেছে সুধীর? শুধু কয়েকটা ছোঁড়াকে মাতিয়েছে মদ খাইয়ে। তাই অন্যান্য বছরের মতো সে মন্দিরে যায়নি মায়ের 'বিল্বপত্ত' নিতে। বাড়ি থেকে প্রণাম জানিয়ে বলেছে, 'মা, অকে সুমতি দাও। অকে ভাল কর মা।'

কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য হয় সে সবাই মেতেছে এই ব্যাপারে। এমন

কি শীরষের জমিদার বাবু পর্যন্ত পুজোর সময় এসেছিলেন। বলে গেছেন, ছেলে-ছোকরারা যদি এই নিয়ে আনন্দ পায়তো তা নিয়ে আমাদের বলবার কি আছে। সুধীরকে ডেকে উপদেশ দিয়েছেন যাতে সুষ্ঠুভাবে কার্য সমাধা হয়। কোনো গোলমাল যেন না হয়। তাছাড়া সুধীরকে দেখা করতে বলেছেন একবার তাঁর সাথে। উৎসাহ দিয়ে গেছেন পিঠ চাপড়ে।

এটা লখীন্দর বোঝে না। তার এই কদিনের পড়াশুনোর ফলে ওদেরকে শত্রু বলে ভাবতে শিখেছে ও, কিন্তু এই রকম একটা কাজে ওরা উৎসাহ দেবে এটা সে ভাবতেই পারেনি। হয়তো সে নিজেই ভুল বুঝেছে। ছেলে হয়তো তার ঠিকই করছে। কিন্তু যখনই সে ভাবে যে এই পূজোর জন্যে পয়সা আদায়টা ভক্তিভাবে হয়নি, জোর করে মানুষের পাপের সুযোগ নিয়ে মোটা মোটা টাকা ভয় দেখিয়ে আদায় হয়েছে, তখন কিছুতেই সে সায় দিতে পারে না। তাতে যতই তার ছেলের গ্রামের মধ্যে প্রতিপত্তি বাড়ুক, সে ততই ব্যথা বোধ করে। কেমন যেন মনে হয়, এটা তারই লজ্জা।

কিন্তু এই সময় দুটি আকস্মিক ঘটনাতে সুধীরের কার্যক্রমে কেমন যেন ভাঁটা পড়ে। প্রথমটা হল এই। সেই বছর প্রকিওরমেণ্ট শুরু হয়েছে। বাঁধা দামে ধান বিক্রী করতে বাধ্য করা হচ্ছে কৃষকদের। সরকারের গুদামে সেই দামে ধান পৌঁছে দিতে হবে। এ নিয়ে তীব্র অসন্তোষ উঠল চারদিকে। কৃষকরা মাথা নেড়ে বললে, না, তা হতেই পারে না। কৃষকদের মূলধনই উন্মূল হবে না তাতে।

সরকার কিন্তু শুনল না সে কথা। যেখান থেকে পারে যেমন করে পারে তারা আদায় করতে লাগল ধান। সুধীর গোরুর গাড়ীতে করে ঘাটালে ধান বেচতে যাচ্ছিল। ঘাটাল পৌঁছোবার মাইল তিন

আগে সরকারের লোক সে ধান আটক করে নিয়েছে। বাঁধা হিসেবে দামও দিয়েছে অবিশ্যি।

সুধীর সেখান থেকে ফিরে এসেছে। কথা ছিলো ধান বিক্রী হলে সেই টাকার কিছু খরচ করে ঘাটাল থেকে সওদা করে আনবে। অধীরের নতুন বই, টুকী আর তার মায়ের জন্যে শাড়ি, একটা নতুন কোদাল। কিন্তু কিছুই কেনেনি সে, ঘাটাল পর্যন্ত যায়নি। শুধু টাকাগুলি বাবার হাতে দিয়ে চলে গেল। একটা কথা পর্যন্ত বলল না।

প্রাণে বড় বেশি লেগেছে তার। এতদিন কোথাও সে বেকুব হয়নি। সবাই তার কথাই শুনে এসেছে। কিন্তু আজ তাকে অত্যন্ত অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করতে হল। তাই প্রায় সময়ই শুয়ে পড়ে থাকত সে। কারও সাথে কথা বলত না। বাইরেও যেত না। আর এই সময় কৃষকদের প্রায় কিছু কাজ-কর্ম থাকেও না।

লখীন্দর খানিকটে আনন্দিতই হল বলতে হবে। হোক তার টাকার লোকসান, কিন্তু সুধীর যে নিজের মনে ব্যথা পেয়েছে তাতে হয়তো ও খানিকটে শান্ত হবে। ওকে সে বললে, 'তা সবাই যখন দিচ্ছে ত আমরাও না হয় দিলম। তো তাতে অমন ভেঙে পড়লে চলবেনি। মনে কষ্ট করবেনি বাবা, খালে শরীর নষ্ট হবে।' কিন্তু সুধীর কোন উচ্চবাচ্য করল না।

তা নাই করুক, লখীন্দর নিজেই ঘাটাল গেল। সেখানে গিয়ে যে সমস্ত জিনিস কেনবার সমস্ত কিনলো। তারপর বাড়ি ফিরে আসে ও। তখন রাত্রি হয়ে গেছে। কিন্তু কী জানি কেন ওর মাথার মধ্যে একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকে। এসে ও উঠোনটায় বসে।

সুধীর সেই মাত্র বাড়ি ঢুকে ওর কাছে ছুটে আসে।

'জান বাবা আজ কি করেছি? শাঁরবেতে গিছলুম মালীদের ঘর। ও

সেখেনে পুলিসের সংগে হয়ে গেল এক চোট—শালারা জোর করে ধান নিতে এইছিল, ত দিলম হটি' অদের। বলি শুন—'অনেক কথা ছিল। সমস্তটা বলতে বেশ কিছু শান্ত হবার দরকার, সময়ও চাই।

কিন্তু লখীন্দর কিছুই শুনতে পায় না ওর কথা। কেবলই ও 'মাথা যাই' 'মাথা যাই' করতে থাকে। তারপর শুয়ে পড়ে উঠোনটাতে। প্রায় অচৈতন্য অবস্থা।

গ্রামের প্রাচীন কবিরাজ বললেন, অত্যন্ত দুঃশ্চিন্তায় এবং মানসিক পরিশ্রমে ওর শিরঃপীড়া হয়েছে। ঝাঁকরার ডাক্তারও তাই বললেন।

সে যাই হোক, কিন্তু ওর অল্প একটু সেরে উঠতে প্রায় মাস তিনেক লাগল।

ষোল

নীরবে গ্রামের ঘটনাটা সরকারের প্রকিওরমেণ্ট কার্যক্রম নিয়ে ঘটল। সরকার নিদেশ দিয়েছিলেন, কৃষকেরা সাধারণত যে-ভাবে ধান বিক্রী করে সেভাবে চলবে না। একটা নির্দিষ্ট দামে সরকারের গুদামে ধান পৌঁছে দিতে হবে। অবিশ্যি ব্যক্তিগত প্রয়োজন মিটিয়ে যেটা উদ্বৃত্ত থাকবে সেটাই দিতে হবে। নানা দিক দিয়ে কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল। সর্বপ্রথম দাম নিয়ে কথা ওঠে। যে দাম সরকার বেঁধে দিয়েছেন সেটা অত্যন্ত কম। ওতে আসলই উসুল হয় না, লাভ তো পরের কথা। আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে আসলটা যদিও বা উসুল হয়, তাতেই বা কি। কৃষকদের হাতে তো পয়সা চাই কিছু, খরচ খরচা নিশ্চয়ই আছে। পাল-পার্বণে আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ করতে হয়। সারা বছরের কাপড়-চোপড় আছে। মহাজনের সুদ, জমির খাজনা আছে। তাছাড়াও রয়েছে অসুখ বিসুখ; কার ভাগ্যে কোন বছরে অসুখের খাতে কতো খরচ হবে, একথা কে বলতে পারে। এমনও তো হয়, মানুষের জমি জায়গা ভিটে-মাটি সব শেষ হল, সেও শেষ হল। আর এরকম হামেশাই ঘটে। এসব তো গেল প্রয়োজনের দিক। এছাড়া মানুষের সখও আছে, আহ্লাদ আছে। যদি সখ-আহ্লাদের কথা ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে ঐ প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর জন্যেই অন্ততো টাকাকড়ির প্রয়োজন।

সরকার সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। তাদের লোক এসে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে গেলেন। কার কত ধান আছে সেটার হিসেব নেওয়া

হল। তার নিজস্ব প্রয়োজন কতখানি সেটাও হিসেব হয়। তারপর বাকী ধানটুকু উদ্বৃত্ত বলে লিখে নেওয়া হল।

এ ব্যাপারে কৃষকদের নালিশ শোনা যায়।

যে ভাবে ধান মাপা হচ্ছে সেটা বিশ্বাস যোগ্য নয়। দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন দেখতে অভ্যস্ত কৃষকেরা। কিন্তু ফিতে দিয়ে মেপে ওজন বোঝা যায়, এটা কোথাও কেউ শোনেনি। ওদের ধারণা, ওদের ঠকানোর জন্যে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেখানে কৃষক জানে তার একশো মণ ধান আছে, সেখানে একশো পঁচিশ মণ ধরবার মানে কি।

তাছাড়া, ব্যক্তিগত প্রয়োজনের খাতে অমন মেপে মেপে মাথা পিছু হিসেব করলে চলে? অতিথি-অভ্যাগত কুটম্ব-বান্ধব সবারই আছে, তাদের জন্যে কোথায় পাবে তারা? এ ছাড়া বারো মাসে তের পার্বণ, পিঠে পলি, সাওগাত যৌতুক তো আছেই। যদি বলেন. এখন সময় বড় খারাপ পড়েছে, ওসব বন্ধ রাখা উচিত। কই, সে রকম তো মনে হয় না। গেল বারে অত বড় যে দুর্ভিক্ষ গেল, তখনই কি আর পালি-পার্বণ বন্ধ রেখেছিলো কেউ?

এতো গেল হিসেব-নিকেশের দিক। কিন্তু সব চেয়ে কৃষকদের যেটা লেগেছে সেটা হল সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা মা-লক্ষ্মীর অবমাননা। জুতো পায়ে দিয়ে খামারে ওঠা বা ধান মাড়ানো বাপ-ঠাকুর্দার আমলে ওরা শোনেইনি কখনো, এখন কিন্তু স্বচক্ষে দেখ্‌তে হচ্ছে। একটা দারুণ অমংগল যে ঘটবেই সে-সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না।

এত সব সত্ত্বেও যথারীতি সরকারের নির্দেশ আসে, সরকারের লোক যাতায়াত করে। বাধ্য হয়ে তাদের এটা মেনে নিতেই হবে সে সম্বন্ধে ওদের আর কোনো সন্দেহই থাকে না। কিন্তু ওরা অত্যন্ত অসহায় বোধ করে।

এই সময় সারা গাঁয়ে একদিন পোষ্টার পড়ে, গাছের গুঁড়িতে, ঘরের দেওয়ালে, 'জান দিব তবু ধান দিব না।' জান এবং ধানের সংগে যে একটি অতি নিকট সম্পর্ক আছে, সে-কথা ওরা ভালোভাবেই জানে। কিন্তু ধানের বদলে জান দেওয়া ব্যাপারটা তো অতি সহজে হয় না। আর সরকারের নির্দেশ অমান্য করতে হলে এছাড়া আর উপায় নেই। আর, অমান্য না করলেও তো ধান দিতে হয়, সেটা বেঁচে মরারই সামিল। কী করবে এ-সম্বন্ধে ওরা কোন স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। ফলে ক্রমশ বিভ্রান্ত হয়ে ওঠে, আর বিভ্রান্ত হলে যা হয় ভেতরের গরম ওদের বেড়ে যায়। অতি তুচ্ছ কারণে লোকের সংগে ঝগড়া করে, বউ ছেলেকে ধরে ঠেঙায়। অজুহাতে বা বিনা অজুহাতেও।

এই গোলমালের মধ্যেও এখানে ওখানে আলোচনা চলে কী ভাবে এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যায়। যাদের উদ্বৃত্ত ধান আছে তাদেরই সব চেয়ে ক্ষতি, তাদেরই এ-নিয়ে সব চেয়ে বেশি মাথা ব্যথা। কিন্তু তাদের বুকে অত সাহস নেই। হাজার হোক অল্প-সল্প গুছনো সংসার তাদের, দুটো পাঁচটা আসবাব পত্র আছেই, সেই সংগে গড়ে ওঠা প্রাণের মায়া একটু বেশি রকম।

একটা কিছু সম্ভব হলে হতেও পারতো যদি দিন-মজুর পোয়াটেক-চাষীরাও ওদের পেছনে দাঁড়ায়। তারা কিন্তু অতটা আগ্রহ দেখালে না। বললে, 'আমাদের কি। মাথা নেই তার মাথা ব্যাথা।' এই সময় গোবিন্দ, সতীশ আর তাদের অন্যান্য কর্মীরা গ্রামে ঘুরে ঘুরে ওদের বোঝায়। ব্যাপারটা তো ওইভাবে দেখা যায় না। দেখা উচিতও নয়। এই সরকার আমাদের সবারই শত্রু একথা তো সবাই জানে। সেবারে ক্ষেতমজুর আন্দোলন আমরা করলাম, সেটা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তো নয়, অথচ শান্তি-শৃঙ্খলার নামে

আমাদের ওরা আক্রমণ করলে। আমাদের কর্মীদের জেলে পুরলে। আজ হয়তো প্রত্যক্ষভাবে দিন-মজুরদের ওপর আক্রমণ আসছে না, কিন্তু অন্যদিন আসবে। যতদিন এই সরকার থাকছে, ততদিন আক্রমণ আসবেই। তাই আঘাতের পর আঘাত করে এই সরকারকে দুর্বল করতে হবে।

অতএব সঙ্ঘর্ষ বাধে।

সরকারের নির্দেশ অমান্য করল শীরষে গ্রাম। ইতিমধ্যে দু'একজন যারা ধান দিয়ে দিয়েছিলো, তাদের কথা আলাদা। কিন্তু অধিকাংশই ধান পৌঁছে দিল না।

তারপর একদিন সরকারের লোকজন সশস্ত্র পুলিস-বাহিনী নিয়ে হাজির হলেন। আপসে ধান না দিলে জোর করে নেওয়া হবে।

গ্রামের লোকজন এসে চারপাশে ভিড় করে দাঁড়াল। বাবু, তা কি আর হয়, আপনারা বিবেচনা করে দেখেন, ঐ দামে ধান বিক্রী করলে চলে কি করে।

মাসি-বাড়ি থেকে সুধীর লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ওর দেখাদেখি অন্য ছেলে ছোকরারাও ছুটতে থাকে। সুধীর এখন অল্প-বিস্তর বিখ্যাত লোক। ওর ভক্ত এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে অনেক ছড়িয়ে আছে। তারা ওর পাশে ভিড় করে দাঁড়ায়।

ও বলে, 'উটি হচ্ছেনি, বাজার দরে ধান কিন, ত দিয়ে দিচ্ছি।'

ও দাবী করে, 'আমাদিকে বুঝিয়ে দাও দিকি, ঐ দামে আমাদের চলে কি করে।'

লোকজন কম জোটেনি। বলতে গেলে পুলিসের ঐ ছোট্ট দলটুকু একরকম ঘেরাও হয়েই গিয়েছিলো। তাই অফিসার-ইন-চার্জ বললেন, 'কিন্তু আমরা তার কি জানি। আমরা তো হুকুমের চাকর, আমাদের সরকার য়া বলবেন, তাই করতে হবে—'

'তা তুমি যদি জানবেনি, ত তুমি এলে কেনে। তমার সরকারকেই পাঠি' দাওগে।'

সবাই হো-হো করে হাসে।

এই হাসির একটা অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বয়স্ক লোকেরা কৌতূহলেই হোক, বা যে জন্যেই হোক ওদের চারপাশে দাঁড়িয়ে ছিলো বটে, কিন্তু সব সময়েই একটা ভারী আশংকা ছিল। এখন ওরা খানিকটে হাল্কা বোধ করে। ছোকরারা, বিশেষ-করে সুধীর ভক্তেরা আরো বাচাল হয়ে ওঠে। নানারকম প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে তাদের।

অফিসার-ইন-চার্জ অতি সতর্ক লোক। এ সমস্ত প্রশ্নোত্তরের ভিড়ে তিনি লক্ষ্য করছেন ঠিকই যে, চারপাশে তখন লোকের ভিড় বাড়ছে। বনের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় লোক আসছে, দূরে মাঠের মধ্যে দেখা যায় অন্ত গ্রাম থেকে লোক ছুটে আসছে। হয়তো কৌতুহলবশে আসছে ওরা, কিন্তু জনতা যত বাড়ে, বিপদের সম্ভাবনা ততই বেশি। এখনই একটা কিছু দরকার।

সামনে সুধীর দাঁড়িয়ে নানা রকম বে-ধরক প্রশ্ন করে চলেছে, আর, ওর কথাবার্তা উৎসাহিত করছে জনতাকে। বললেন তিনি, 'তোমাকে আমি গ্রেপ্তার করলাম।'

'হুঃ, করলেই হল আর কি। ধানের কি হল সেইটে বল আগে।'

জনতার মধ্যে কেউ কেউ হাসল। কেউ কেউ এমন শব্দ করল যে সেটা আর্তনাদ বা বিস্ময় তা বোঝা গেল না।

অফিসার বিব্রত বোধ করলেন। আর দেরী করা উচিত নয়।

'আমি এই জমায়েত বে-আইনী ঘোষণা করলাম।'

বলে কি ইংগিত করলেন যেন। বন্দুক-ধারীরা সরে দিয়ে গোল হয়ে

দাঁড়াবার চেষ্টা করল। জনতার দিকে মুখ করে, নিজেদের দিকে পেছন করে পরস্পর।

'এখান থেকে চলে যাও। হঠো। বাড়ি যাও।' ক্রমাগত লাল হয়ে উঠ্ছেন অফিসার।

'যদি না যাই বাপু। কি করবে।'

'শাট আপ।' অফিসার রুলের ডগা দিয়ে ঠেলে সরাতে চাইলেন ওকে। সুধীর রুলটা কেড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। উনি রিভলবার বের করার আগেই হাতটা ধরে ফেলল ওঁর।

একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হয়। বিরাট জনতা আর কয়েকজন মাত্র পুলিস বলে সহসাই গুলি করতে সাহস পায় না ওরা।

আত্মরক্ষা করে কোন রকমে পালাবার চেষ্টা করে।

কিন্তু হট্টগোলে ওদের দুটো বন্দুক খোয়া যায়। জনতা ছিনিয়ে নিয়ে আত্মসাৎ করেছে।......

অফিসার-ইন-চার্জ সেদিন রাত্রে তাঁর বাসায় প্রায় উন্মাদের মতো পায়চারি করছিলেন। মাঝে মাঝে চুল টেনে ছিঁড়বার উদ্যোগও ছিল তাঁর।

অমন একটা বড় ব্যাপার ঘটবে, সেটা তিনি আশংকা করতে পারেননি। কেউই পারত না। অত অল্প পুলিস নিয়ে যাওয়াটা যে কী নির্বুদ্ধিতা হয়েছে, সেটা বলা যায় না। সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে এমন হবে সেটা কে বলতে পারত। এখন সমস্ত দোষটা তাঁর ওপরই পড়বে। দুটো বন্দুক খোয়া গিয়েছে। এটা তাঁর নামে রেকর্ড হয়ে থাকবে। ভবিষ্যৎটা কি? ছিঃ ছিঃ।

তবে, এই ব্যাপার নিয়ে এমন কিছু যদি করা যায়, যা ঐ কলংকটাকে (হ্যাঁ কলংক ছাড়া আর কি) ব্যালান্স করবে, তা হলে অন্য কথা। কি এমন করা যায়? অবিশ্যি থানায় পৌঁছেই সংগে সংগে তিনি

পুলিস দল পাঠিয়ে দিয়েছেন, সমস্ত এলাকাটাকে ঘিরে রাখবে। তাছাড়া আর কিছু ঠিক এখনই করা যায় না।

এক একবার তাঁর মনে হয়, অত অরক্ষিতভাবে না গেলেও হত। সহসা তার মনে পড়ে, এই কয়েকদিন আগেই দু'একদিনের এদিক ওদিকে আরো দুটি ঘটনা ঘটে গিয়েছে। একটা অবিশ্যি ঘটেছে আমনপুরে। সেটা তাঁর এলাকায় নয়। আর একটা ধানগাছিয়ায় ঘটেছে।

আমনপুরের কাছারিতে এক প্রজার হেলে-বলদ আটকেছিলো জমিদার বাবুরা। প্রজাটি খাজনা দিতে পারেনি বলে। তো প্রায় পাঁচশো লোক এসে সেই বলদ জোড়া কেড়ে নিয়ে গেছে।

আর ধানগাছিয়ার ব্যাপারটাই বা কি। প্রায় হাজারখানেক লোক নব মল্লিকের ধান লুঠ করতে গিয়েছিলো। ভাগ্যক্রমে পুলিস-পেট্রল হাজির হয় সেখানে, তাই রক্ষে।

আর ঐ দুটি ঘটনার সংগে আজকের ঘটনাটা যোগ দাও। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি এই তিনটের মধ্যে কোন যোগসূত্র খুঁজে পান না। কিন্তু উচ্চপদস্থরা সেটা কি বুঝবেন। পরিষ্কার তাঁরা বলবেন যে, শেষের ঘটনাটা কালমিনেশন অব দি টু।

হ্যাঁ। কালমিনেশন ছাড়া আর কি। দুটো বন্দুক খোয়া যাওয়াটাকে পুলিস-বাহিনীর চরম অমর্যাদা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে। তার চেয়ে শেষ পর্যন্ত ফাইট দিলেই হত। কিন্তু ওই হতভাগা লোক দুটো, হাত থেকে বন্দুক ছাড়ল কী করে। মরে যেতে পারল না তার আগে? ভীতু, ভীতু। ওদের দেখাবেন তিনি মজাটা।

ওপর থেকে নির্দেশ এল। যে কোন রকমে পরিস্থিতিটাকে আয়ত্তে আনতে হবে। যত পুলিস তাঁর দরকার ততটাই পাবেন। এই সময় কৃষকদের মেজাজ ঠিক থাকে না। কাজেই খুব সাবধান হয়ে যেন কার্যক্রম ঠিক করা হয়। ওপরওয়ালা দেখা করবেন।

একটি জিনিসের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে : এই সময় কৃষকদের মাথার ঠিক থাকে না। লাইনটার নিচে লাল কালির দাগ। সত্যিই তাই। নানা দিক দিয়ে বিব্রত হতে হয় ওদের। ধান খামারে তোলার সংগে সংগে মহাজন-মালিক-পোষ্যপরিজন নানাদিক থেকে দাও দাও করবে। আর যখন দেখা যায় সারা বছরের আশা আকাঙ্ক্ষার শেষ ফল যেই কে সেই তখন আর মাথা ঠিক রাখা যায় না। যাই হোক অফিসার ইন-চার্জ শান্ত হবার চেষ্টা করলেন। ভেবে দেখতে লাগলেন, এমন কিছু করা যায় কিনা যাতে তাঁর কলংক-ভঞ্জন হবে। তরুণ মানুষ তিনি, সারা ভবিষ্যৎটাই তো এখনো বাকী। আর একই পদে তো চিরকাল পড়ে থাকা যায় না।......

ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করছিলো গোবিন্দ।

দিনচারেক কেটে গেছে, এখনো সাধারণের উত্তেজনা কমেনি। অমন ভীতু মধ্যবিত্ত কৃষকেরা পর্যন্ত উৎসাহে ডগমগ করছে।

পুলিসও বিশেষ কিছু করতে পারছে না। শুধু এলাকাটা ঘিরে আছে মাত্র। তা ছাড়া, করবারই যে কি আছে, এই অবস্থায় কিছু করতে গেলেই উল্টে মার খাবে ওরা। সেদিনকার ঘটনাতে কৃষকরা ভেবেছে যে ওরা একটা ভীষণ জয় করেছে। আর সেই জয়ের আনন্দে ওরা এতই মশগুল যে, এখন কিছু বললেই, ওরা মেরে ভূত করে দেবে।

অবিশ্যি, এত অল্প পুলিস দিয়ে ব্যাপারটা এগোচ্ছে না বলে পরেও এই রকম থাকবে তা নয়। ইতিমধ্যেই খবর পেয়েছে ওরা যে বহুসংখ্যক পুলিস এনে অঞ্চলটাকে শায়েস্তা করা হবে। আর সে সংখ্যাটা যে বড়ই হবে সেটা অনুমান করা যায়। গাঁয়ে ঢুকতে হলে বেশ কিছুদিন দেরী করতে প্রস্তুত ওরা, কিন্তু অপ্রস্তুত হয়ে আর ঢুকবে না এটা বোঝাই যায়।

তার আগেই যতটা সম্ভব কাজ এগিয়ে দেওয়া দরকার।

এটা অবিশ্যি পরিষ্কার বোঝা যায় যে পুলিস ক্রমে বেধড়ক গ্রেপ্তার শুরু করবে। সাধারণ কর্মী বা কৃষকেরা সবাই তো আণ্ডারগ্রাউণ্ড থাকতে পারে না, সেটা সম্ভবও নয়। তাই যেমন করে হোক গ্রেপ্তার করতে এলে পুলিসকে ঠেকাতে হবে।

ইতিমধ্যে সতীশ খবর এনেছে শ্যামগঞ্জের। শ্যামগঞ্জের দুই জোতদার রামু পাল আর হরি চক্রবর্তী খোঁজ করে করে নাম পাঠাচ্ছে পুলিসে। আমনপুর, ধানগেছে আর শীরষে এই ঘটনায় জড়িত এমন একশো জনের নাম ইতিমধ্যেই পাঠিয়েছে ওরা। তাদের গতিবিধির খবরও দিয়েছে। পুলিস সেই অনুযায়ী গ্রেপ্তার শুরু করেছে, ইতিমধ্যে করেওছে কয়েক জনকে।

'আশ্চর্য। এই দালালগুলোকে থামানো দরকার।'

শুধু এরা দুজনই তো নয়, এ গ্রামে অনেক ছড়িয়ে রয়েছে ওদের মতো লোক। বড় বড় পুলিসবাহিনীকে ভয় করে না ওরা। কিন্তু এই ঘরশত্রু বিভীষণদের সব চেয়ে ভয় ওদের। যারা গ্রামের মধ্যেই আছে গ্রামের নাড়ীনক্ষত্র সব জানে, তাদের এড়ানো শক্ত।

স্থির হয় যে, একটা শোভাযাত্রা বের করবে ওরা কৃষক সভার নাম দিয়ে। ওই লোকগুলিকে সাবধান করে দিয়ে আসবে যে, যদি তারা এরপর দালালি করেই তাহলে তাদের বাঁচোয়া নেই। তাছাড়া, কৃষক সভার কাজের জন্যে টাকার প্রচুর দরকার। কিছু টাকা আদায় করাও হবে। কিন্তু একটা ব্যাপারে ওরা বড় বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ে। লখীন্দরের ছেলে সুধীর গ্রেপ্তার হয়েছে। লখীন্দরকেও নিয়ে যেত, কিন্তু ও তো এখন ভীষণ অসুস্থ, প্রায় অচৈতন্য অবস্থার মধ্যে কাটায়। তা ছাড়া এই পরপর যে তিনটে ঘটনা ঘটে গেল, তার কোনটার সংগেই ওর যোগ ছিল না। কিন্তু হলে কি হবে, যার ছেলে

এই মহাকাণ্ড বাধাতে পারে, সে কি কম যায়। তা ছাড়া তার নামেও তো কিছু কিছু রটনা আছে। অতএব ওকে অন্তরীণ করা হল, ওর বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে।

সুধীরের সেদিনকার আচরণে ওরা অবাক হয়ে গিয়েছিলো। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছে, সুধীর নিজে অপমানিত হয়েছে বলে এই কাণ্ড করেছে।

'কিন্তু ওকি আর শেষ পর্যন্ত ঠিক থাকতে পারবে। আমি জানি ওর বাবার সংগে ওর বনতনি। ওর বাবা আমাদের দিকে ঝুঁকে ছিল বলে', সতীশ বলে।

ওদের একটা আশংকা হয় যে, সুধীরকে ওরা চাপ দিয়ে সমস্ত আদায় করে নেবে। চাই কি একটা বন্দোবস্ত করে ওর সমস্ত দলটাকে ওদের বিরুদ্ধে লাগাতেও পারে। সুধীরের দলটা তো আর কম নয়, বিশেষ করে ওরা কার্যক্ষমও বটে।

'তাছাড়া অনুতোষ বাবু সুযোগটা কাজে লাগবে। শীরবের জমিদার। তার নিজের গ্রামে ঘটনাটা ঘটল, সরকারের কাছে বে-সরকারী লোক হয়েও ওটা ওর অপমান। সেদিন শেতলাপূজোর সময় ওকে দলে টানবার চেষ্টা করেছিল ও, এ সুযোগ ও ছাড়বে না। হয়তো ওকে মুক্তি দেওয়াবে, আর সেই মুক্তির বদলে ওদের সেবাদলটাকে খাড়া করে নেবে ওরা।' গোবিন্দ বলে।

একটু পরেই আবার ও বলে, 'তাছাড়া লখীন্দরকেও কাজে লাগাতে পারলাম না আমরা। এই সময়েই ওর অসুখ করে গেল।'

মোট কথা ওদের বাপ-ছেলে, বিশেষ করে সুধীরের ব্যাপারটা নিয়ে ওরা উদ্বিগ্ন হয়ে রইল।

সতেরো

দু'দিন পরে একটি শোভাযাত্রা বেরোল। সে দলে পাশাপাশি দু'দশ খানা গ্রাম থেকে লোকজন এসেছে। মোটমাট সংখ্যাটা ঠিক করে বলা যায় না। কারণ, ছোটছোট দল এদিক-ওদিক থেকে তখনও আসছিল। ওদের প্রধান আওয়াজ ছিল : 'দালাল নিপাত যাক' আর ওদের গন্তব্যস্থল ছিলো : শ্যামগঞ্জ।

রামু পাল ও হরি চক্রবর্তীদের বাড়ি বেশি দূরে দূরে নয়। জোরে জোরে হাঁকডাক দিলে শোনা যায়। মাঝখানে কিছু জমি, কিছু আমবন বাঁশ বন আছে।

শোভাযাত্রীরা প্রায় দু'জনকেই এক সংগে ঘেরাও করল।

চক্রবর্তী মশায় প্রায় বৃদ্ধ হয়ে এসেছেন। নানা রকম চিন্তা আর পরিশ্রমে তাঁর গায়ের রঙ্ বিবর্ণ হয়ে গেছে, নইলে এর আগে অতি উজ্জ্বল ছিলেন তিনি।

গতিক দেখে ভড়কে গিয়ে তিনি বললেন, 'আপনাদের কথা শিরোধার্য করলাম। ঐ রকম নোংরা কাজ আর কখনো করব না। দোহাই আপনাদের, আপনারা বিশ্বাস করুন আমার কথায়। আর আপনারা যা চাইবেন আমি দিচ্ছি, শুধু ধনে প্রাণে রক্ষে করুন।'

কিন্তু তার প্রমাণটা কি। তুমি যে এরপরে আর নোংরামি করবে না, সেটা বুঝব কি করে।

'আপনাদিগের হাতের মধ্যেই তো রইলাম। আমার জমিজায়গা ঘরদোর কাচ্চা-বাচ্চা সবই এখানে থাকবে। এটা তো শুধু একদিনের ব্যাপার নয়।'

কথাটা ঠিক।

'কিন্তু আমাদের কৃষক-সভার কাজের জন্মে এক হাজার টাকা দিতে হবে।'

ওক করে একটা শব্দ বেরোয় চক্রবর্তীর গলা থেকে। 'এ-ক হা-জা-র।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ। তাছাড়া কি। কত হাজার টাকা তুমি শুষেছ তার ঠিক আছে।'

'দোহাই আপনাদের, আপনাদের পায়ে পড়ি—ওইটে পারব না।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিতেই হয়। এদের দল থেকে মাতব্বর হয়ে যারা কথা বলছিলো, তারা একটু হেসে নরম হয়ে বললে, 'তা চক্কবত্তীর পো, আমরা সে সকাল ঠিঙে বার হইচি, খাইনি এখনো। কিছু চাল-ডাল দেন।'

সিন্দুক থেকে টাকা বের করতে গিয়ে চক্রবর্তী মশায় বাড়ির মেয়েদের সাথে কাঁদছিলেন, অবিশ্যি গলা বের করে নয়। সেই কান্নাটা আর একবার ঠেলে ওঠে তাঁর। তবু স্থির হয়ে বলেন, 'তা নিন, আমি বস্তা থেকে বের করে দিচ্ছি।'

সত্যিই যারা দূরগ্রাম থেকে সকাল বেলাই বেরিয়ে এসেছে, তারা চক্রবর্তীদের বাড়ি থেকে একটু দূরে একটা শিমুল গাছের তলায় রান্নার আয়োজন করে। চালে-ডালে সেদ্ধ আর তার সংগে নুন। এই যথেষ্ট। বাড়ির থেকে ওরা একটু সরে যাওয়াতে বাড়ির পেছন দিকে নালা পেরিয়ে জংগলে ঢুকলেন চক্রবর্তী পায়খানা যাবার জন্মে। গাড়ু হাতে করে। সেখানে গাড়ু ফেলে রেখে জংগল পার হলেন। পড়লেন গিয়ে বালার মাঠে। সেখান থেকে ছুটতে ছুটতে জয়ন্তীপুর। আর জয়ন্তীপুর থেকে প্রায় ছুটন্ত অবস্থায় চন্দ্রকোণার থানায়।

চক্রবর্তীর শরীরের নানা জায়গা কাঁটার আঁচড়ে, বেনা-পাতার

ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত। শেয়াল কাঁটায় গায়ের গেঞ্জি আর ধুতি সমাকীর্ণ। মুক্তকচ্ছ অবস্থা।

দড়াম করে মেঝের ওপর পড়লেন। 'জল এক গ্লাস। তারপর বলছি।'

ওদিকে পালকে নিয়ে ব্যাপারটা এগোচ্ছে। এক হাজার টাকা তিনিও দিতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তিনি কি করবেন সে সম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না।

'তাও কি হয়। গাঁয়ের বুকের উপর বসে গাঁয়ের শত্রুতা করবেন সেটা কী আর হয়, আপনিই বলুন।'

'আপনারা আমায় বিরক্ত করবেন না। আমি দুদিন অসুস্থতার জন্যে উপোষ দিয়ে আছি। টাকা তো আপনাদের দিলাম। আপনারা যান এখন।' বলে তিনি ঘরের ভেতর চলে যাচ্ছিলেন। ওঁকে আটকাল হাত ধরে।

'আহা, করেন কি, করেন কি। কথা না দিলে আমরা যেতে দিই কি করে।'

জোর করে হাত ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছেন রামু বাবু। হঠাৎ পেছন থেকে একজন চাষী এসে ঠাস করে এক চড় লাগালো, 'শালা, আমরা কি ভেড়ার দল বকবক করছি নাকি।'

মোক্ষম চড়। ঠিক কানটার ওপর পড়েছিলো, গালের কিয়দংশ সে চড়ের আওতায় ছিলো। প্রথমে ছিটকে পড়লেন মাটির ওপর, তারপর ছটফট করলেন। আর মারা গেলেন আধ ঘণ্টা পরে।

প্রথমটা ওরা হকচকিয়ে গেল। অতটা না করলেই হত। কিন্তু যখন শুনল হরি চক্রবর্তী বিশ্বাসঘাতকতা করে পুলিসে খবর দিতে চলে গেছে, বাড়িতে ওকে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন বললে, 'উ শালাকেও অমনি করলে হত। সাপের জাতকে বিশ্বাস নাই।'

অতএব পোষ্টার পড়ে: 'দালাল হুঁসিয়ার। রামু পালের কথা মনে রেখ।'

গোবিন্দরা যা আশংকা করেছিলো, তাই হল।

সেদিন বিকেলেই সদর থেকে আর ঘাটাল থেকে নতুন পুলিস ফোর্স চন্দ্রকোণায় এসে পৌঁছেচে। সন্ধ্যে বেলা রওনা হয়ে রাত্রে তারা শ্যামগঞ্জে এসে হাজির হয়। চক্রবর্তী আর রামু পালদের বাড়ি ঘেরাও করে রাখে। রাত্রের মধ্যেই ঠিক হয় কোথায় কোথায় গিয়ে কাকে কাকে গ্রেপ্তার করবে। চক্রবর্তী প্রায় প্রধান সব কটির নাম আস্তানা বললে।

বাসায় একজনের বাড়িতে সতীশ থাকতো। সে বাড়িতে বাবা-ছেলে দুজন মাত্র। ছেলে দুবার ম্যাট্রিক ফেল করে মাষ্টারি করে। বাবা সাধারণ কৃষক।

ছেলের নাম যতীন। যতীন সতীশের কাছ থেকে তৈরী হয়েছে। সে এই প্রথম কাজ করবার সুযোগ পেলে। ভোরবেলা ওকে উঠিয়ে জানালে অন্তত জন আষ্টেক আর্মড্ পুলিস বাড়ির চারদিকে। যতীন বুঝলে ব্যাপারটা। সতীশকেই ধরতে এসেছে ওরা। ভাগ্য ক্রমে সতীশ সেখানে নেই। কিন্তু নানারকম কাগজ পত্র আছে। যতীন সেগুলো পোড়ালে। তারপর যখন বুঝলে যে পালাবার কোন পথ নেই, তখন ভাবলে, এমনিতে ধরা দিয়ে কোন লাভ নেই, কিছু একটা করাই উচিত।

জানালা দিয়ে ছুঁড়লে ও দুটো হাতবোমা। দুটোই ছিল। কিন্তু আশ্চর্য [illegible] হল। বাড়ির ভেতরকার লোকসংখ্যা এবং ওদের প্রস্তুতি সম্বন্ধে পুলিস দলটুকু কিছুই জানত না। [illegible] পিছু হটতে থাকে

এই সময় গ্রাম থেকেও কারা শাঁখ বাজায়। চারদিক থেকে হৈ হৈ করে ছুটে আসে জনতা। ওরা আসতেই থাকে, আসতেই থাকে। এই ক'দিন উত্তেজনায় কোন কিছু তুচ্ছ ঘটনাটাতেও সমস্ত গ্রাম, অন্তত কয়েকখানা গ্রাম, নড়ে ওঠে।

পুলিসের দলটি প্রথমে স্বাভাবিক গতিতে, তারপর দ্রুত, এগোয়। তারপর ছুটতে থাকে।

জনতাও ছুটন্ত। কিন্তু ওরা আগেই সরে পড়েছিলো বলে পুলিসের নাগাল ধরতে পারে না।

ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার ঘটে, যতীন ওর দুচার বন্ধু-বান্ধব নিয়ে পুলিসের পথে ওৎ পেতে ছিল। হঠাৎ ঝোপের মতো একটা জায়গা থেকে বেরিয়ে এল ওরা। কারো হাতে তীর-ধনুক, কারো হাতে হাত-বোমা। যতীন বললে, 'অন্তত চারটে বন্দুক দাও, তা না হলে তোমাদের বাঁচোয়া নেই।'

দলটিরও তাই মনে হয়, অফিসার সমেত। পেছনের দিকে তাকালো ওরা একবার। অনেক দূরে আছে ওরা এই যা ভরসা। সহসা অফিসার লক্ষ্য করলেন ওদের হাতে তীর-ধনুক আর বোমা মাত্র, আর তাঁর দলের সবারই হাতেই বন্দুক। অতএব কড়াক-পিং।

বোমার ঘায়ে আর তীর বিঁধে মরে গেল একটা পুলিস। অফিসার নিজে তার বন্দুকটা হস্তগত করলেন। আর সেই সংগে মারা গেল যতীন আর তার একটি বন্ধু। বাকিরা পালালো। পুলিসের দলটি মৃতদেহগুলো টান্‌তে টানতে জয়ন্তীপুরে এসে হাজির হয়।

চন্দ্রকোণা থেকে আরো পুলিস ফোর্স রওয়ানা হয়ে এসেছে ওদের সংগে যোগ দেবে বলে। সমস্ত শুনে যাত্রা স্থগিত হল। এই ফোর্স নিয়ে হবে না। তাছাড়া গোলমালের এলাকা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। চন্দ্রকোণা থেকে সদরে, প্রাদেশিক দপ্তরে তার গেল। পাল্টা তারও আসে।

সেই সংগে নির্দেশ। আর এলেন দেবেন্দ্রনাথ সমাজপতি—হোম মিনিষ্ট্রির সংগে তাঁর ঘনিষ্ট যোগ।

তিনি সদরে বা চন্দ্রোকোণায় পুলিস কর্মকর্তাদের সংগে দেখা করলেন ঠিকই। কিন্তু তাঁর প্রধান কাজ শীরষের জমিদার বাবু অনুতোষ সিংহের সংগে। সেখানে রওয়ানা হলেন তিনি।

এই গোলমালের ভেতরে একটা শোচনীয় কাণ্ড ঘটে।

শ্যামগঞ্জের দফাদার বাড়ি আসছিল চন্দ্রকোণা থেকে। কোথায় গিয়েছিল যেন।

পলায়মান পুলিসদলের অফিসার তাঁর সাইকেল ছেড়ে এসেছেন; এত বিপদেও সাইকেলের মায়া তিনি ছাড়তে পারছিলেন না। ছাড়া শক্তও বটে। তাঁর কর্মজীবনের এক রকম সর্বক্ষণের সাথী ঐ সাইকেল। তিনি দফাদারকে বললেন, 'এই, তোদের গাঁয়ে সাইকেলটা ছেড়ে এসেছি আমি। চক্রবর্তীদের বাড়ি। এনে দিতে পারবি?' সে অতসত জানত না। তাছাড়া মনিবগোষ্ঠীর লোক, অতএব বিগলিত হয়ে বললে, 'আজ্ঞে, তা আর পারবনি।' বলে সে ছুটতে থাকে।

ফিরবার পথে সেই কিংকর্তব্য বিমূঢ় জনতা ওকে ধরে। 'শত্তুর, দুশমন।'

হাত থেকে তাদের শিকার ফস্‌কে গেছে। অনেকদূর ধাওয়া করেও পুলিস দলকে পায়নি। অতএব ঐ পা-চাটা কুকুরটাকে ধরো।

শত অনুনয় সত্ত্বেও, ওকে চিরে চিরে কেটে ফেলল ওরা।

আশ্চর্য নৃশংসতা। গোবিন্দ আঙুল কামড়ে, অস্থির হয়ে উঠল। ছিঃ ছিঃ। অত্যন্ত ভুল হয়েছে, অত্যন্ত ভুল হয়েছে। ওদের কেউ থাকলে হয়তো ব্যাপারটা ঘটত না। একটা কলংক হয়ে রইল, এটা ঘুচবে কি করে? ঐ দফাদার, সরকারের সংগে অতি দূরতম সম্পর্ক তো ওর! সে রকম সম্পর্ক তো সবারই থাকে। আপসেই থাকে।

আঠার

এবারে আর আর্মড-পুলিস নয়, রাইফেলধারী জাত-সৈনিক।

দলটা রওয়ানা হল রাত্রেই। সাধারণত রাত্রিতে রওয়ানা হয় ওরা। তার কারণও আছে, প্রাতঃকালে উঠে কৃষকেরা দিনের একশো-রকমের কাজ শুরু করবার আগেই দেখবে ওদের। অতি স্থির মস্তিষ্কে ধারণা করবার সুবিধে পাবে, তাদের কোন পরিস্থিতির মধ্যে কাটাতে হচ্ছে। যা তা ব্যাপার নয়।

চলার তালে তালে বুটের শব্দ হয়। কিন্তু কি রকম নিরুৎসাহ বোধ করে ওরা। কাঁচামাটির রাস্তা দুজন করে সার দিয়ে চলেছে। সাধারণত মার্চ করলে বুটের যে রকম একটা শব্দ হয়, সে অভ্যস্ত শব্দ মোটেই হচ্ছিল না। কেমন ধপাস-ধপাস ধরনের শব্দটা। তাছাড়া, রাস্তা উঁচু নিচু বলে মাঝে মাঝে তাল কেটে যাচ্ছিল।

জয়ন্তীপুর পেরিয়েছে, এমন সময় একটা বিরক্তিকর ঘটনা ঘটে। কতকগুলো গ্রাম্য কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিলো, দলটা প্রায় ওদের ঘাড়ে পড়ে পড়ে, এমন সময় একসংগে অতি কর্কশ ভাবে ঘেউ-ঘেউ কেঁউ-কেঁউ করে উঠ্‌ল কুকুরগুলো। অতর্কিত ভাবে বলে দলের প্রায় প্রত্যেকেই চমকে ওঠে, বুকের রক্ত ছলাৎ করে ওঠে। সামনের জন চারেক তো লাফ দিয়ে ওঠে একরকম। প্রথমটা ওরা কিছুই বুঝতে পারে না, পরক্ষণে সামলে আবার যখন লাইন ফাঁদল তখন কুকুরগুলো সরে গিয়ে পাশের ঝোপঝাড় থেকে চিৎকার

করছে। ওরা প্রায় জায়গাটা পেরিয়ে চলে গেছে আধ-মাইল পর্যন্ত, তখনো কেঁউ কেঁউ করে কুকুরগুলো। কেমন একঘেয়ে কান্নার মতো শোনায়। ওরা যে সেই কেঁপে উঠেছিলো একবার, সেটা এখন নেই; কিন্তু কখনো কখনো যেন হাঁটুর কাছটা একটু দুর্বল মনে হয়। ও কিছু না, ওরা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

দূরে আলো জ্বলছে একটা। বাঁধের ধারেই হবে বোধ হয়। সেই আলোটা ক্রমশ বড় হয়ে ওঠে, তারপর বোঝা যায় কারা যেন আগুন জ্বালিয়েছে। ওইদিকে দৃষ্টি রেখে হাঁটছে ওরা। একেবারে কাছে যখন এসেছে, তখন কতকগুলি লোক চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, 'বল হরি, হরিবোল।'

ওঃ হরি, মড়া পোড়ানো হচ্ছে। এতক্ষণ বুঝতে পারেনি ওরা। কিন্তু আগে হঠাৎ কেঁপে উঠেছিলো বলে তার প্রক্রিয়া খানিকটা ছিলো তখনও। এবারও ওই বিকট হরিবোল শব্দে কেঁপে উঠল ওরা। অবশ্য কেউই লাইনচ্যুত হয়নি।

শ্মশানটা পেরিয়ে গ্রামের মাঠে ওরা নামে।

কিন্তু দুর্ভোগ ছিল ওদের কপালে তখনও। একটা নালার ধারে আল-পথ দিয়ে চলছিল। এবারে আর পাশাপাশি দুজন যাবার জায়গা ছিল না। একজন করে এগোচ্ছিল।

হঠাৎ কালো মতো একটা ঝোপের আড়ালে কি যেন একটা জোর শব্দ হল, আর মানুষের নড়াচড়ার মতো কি দেখা যায়। থমকে দাঁড়ায় ওরা, হাতের রাইফেল উঁচানো। ওদের সন্দেহ থাকে না যে কতকগুলো মানুষ ওখানে লুকিয়ে আছে।

'কোই হ্যায়'? কম্যাণ্ডিং বজ্র গম্ভীর কণ্ঠে হাঁকলেন।

অন্ধকার কেঁপে কেঁপে গেল শুধু।

ঝোপটা বোধ হয় হাত পঁচিশ দূরে হবে। ওরা সেই দিকে তাকিয়ে

স্থির হয়ে রইল। অনেকক্ষণ কেটে গেল, কোথাও কিছু হচ্ছে না দেখে এগোবে কিনা ভাবছে, এমন সময় ডানদিকে ওদের গন্তব্য পথের ওপর কিছু দূরে আবার তীব্র শব্দ হয়।

পরিষ্কার বোমা-ফাটার আওয়াজ। তড়াক করে ফিরে ওরা দেখল, কারা যেন পালাচ্ছে। আবছা আবছা দেখা যায়। সংগে সংগে গর্জালো সব কটা রাইফেল। কিন্তু একটাও আর্ত-শব্দ শোনা গেল না। নিশ্চয় কেউ আহত হয়নি। ধাওয়া করল ওরা সামনের দিকে। প্রায় সিকি মাইলটাক দৌড়বার পরও কাউকে পেল না ওরা। তখন গতি মন্থর করলো।

কিন্তু তাতে কি হবে, এদিকে ওদিকে বোমা-ফাটার শব্দ ওরা আরো বার তিনেক শোনে, আর বার তিনেকই এদিক-ওদিক ছোটে!

ঘাবড়ে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে ওরা। আর ওরা ছোটাছুটি করে না। সোজা পথ ধরে এগোতে থাকে। কাঁহাতক এমন করে নাকাল হওয়া যায়। বিশেষ করে বোমাগুলো যখন তাদের উদ্দেশ করে ছোঁড়া হয়নি।

ভয়ে ওদের তখন গলা কাঠ হবার উপক্রম। কিন্তু কিছুতেই ওরা ব্যাপারটার হদিস পেলো না। ভুতুড়ে ব্যাপার হবে বোধ হয়।

শুধু একটি দল নয়, একের পর এক আসতেই থাকে। মাথায় হেলমেট্, খাটোখাটো সর্ট্স্ আর জামা, রোদ পড়ে পেতলের বোতামগুলো ঝক্‌ঝক্ করে। কিরিচগুলো কিন্তু চোখ ঝলসে দেয় মাঝে মাঝে। কৃষকদের বউ-ঝি ভয় পেয়ে ঘরে লুকোয়, কিন্তু কৌতূহলের বশে ঘুল-ঘুলি বা অল্প খোলা জানালা দিয়ে দেখে। ছেলেরা ভয়ে মায়ের আঁচল চেপে ধরে। যারা একটু বড় হয়ে সাহসী বা ডেঁপো হয়েছে

তারা আর একটু এগিয়ে অথচ ওদের থেকে বেশ কিছু দূরে দাঁড়িয়ে দেখে। কার্যরত কৃষকদের বুকটা দুরদুর করে ওঠে একটু। কেউ বা তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরে। একটি আতংক নামে আস্তে আস্তে।

এদের এই হচ্ছে কাজ। ভয় দেখিয়ে শায়েস্তা করে রাখা। কোন রকম টুঁ-শব্দটি কোর না, তাহলে যমালয়। আর সেটা হলও। ওরা ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠ্‌ল। প্রায় কাজ কর্ম পর্যন্ত বন্ধ।

সে যাই হোক। আসল কাজ কিন্তু ওদের শুরু হল আরো দুদিন পরে। পরিকল্পনা মাফিক। ওদের কাজ শুরু হবার আগে অবিশ্যি ওদের কার্যক্রম সম্বন্ধে গুজব ছড়িয়ে গিয়েছিল।

'বুঝলে দাদা, ঠেলা সামলাও এবরে, অরা ত সব মেরে সাফ করে দিবে। শুনলম, ই দশখানা গাঁয়ের লোককে দাঁড় করি' দিয়ে গুলি করে মারবে। মহা শ্মশান হবে এখেনে, দেখবে তুমি। গিধিণী শকুনি এখানে চলাচল করবে।'

অতি বিষণ্ণ, অতি চিন্তিত, প্রায় অর্ধোচ্চারিত কথাগুলি। ফিসফিস করে বলতে হয়, নইলে কে কোথায় শুনে ফেলবে। গ্রামে নাকি অদৃশ্য একরকম মানুষ এসেছে, তারা ঘুরে ঘুরে খোঁজ নিচ্ছে। মনের কথা মুখ দিয়ে যদি বের করেছ, তা সে তোমার স্ত্রীর কাছেই হোক বা জেঠতুত দাদার কাছেই হোক, সেই অদৃশ্য লোকদের কেউ না কেউ তোমার কথা শুনে ফেলবে। তারপর কি হবে বলা নিষ্প্রয়োজন। আর মুস্কিল হচ্ছে এই, এই সমস্ত লোকদের চিনবার উপায় নেই। তোমাদেরই মতো সাজ পোশাক হাবভাব তাদের।

তবু মানুষকে কথা বলতেই হয়। একেবারে শ্রোতার কানের ঠেকাঠেকি বক্তার মুখ এনে। না বললে বাঁচবে কি করে।

'আচ্ছা, এই যে সৈন্য সব এস্‌ছে এস্‌ছে চলে যাচ্ছে ত অরা যায় কথায় ?'

'সে আমি বলব কি করে। ঘরের বাইর হতে পারছি কেউ? তবে জান কি দাদা, লোকে বলে এই থানাটা উড়ি' দিবে, কেউ বলে, কেশপুর তমলুক উসব রাখবেনি। আবার কেউ বলে মেদিনীপুর জেলাটাই রাখবেনি। বলে উ শালা শয়তানের দেশ, কেউ অকে শায়েস্তা করতে পারবেনি, ত যারই রাজত্ব হউক না কেনে।'

এতসব আশংকা-সত্ত্বেও প্রথম দিন-দুই তিন কিছুই হল না দেখে ওরা ঘাব্‌ড়ে গেল। এই দু'তিন দিন কম সময় নয়। উদ্বেগ এবং আশংকার সময় এক একটা ঘণ্টা এক একদিন বলে মনে হয়। তাছাড়া এদের হাতে কাজ নেই, হাটবাজার যাওয়া নেই। কারো সংগে পাঁচটা কথা বলবার জো নেই। অতএব বিপদ এই আসে এই আসে করতে করতে প্রায় বিপদের আস্বাদ করতে শুরু করেছিল, কিন্তু বিপদ ঘটছে না বলে ওরা তারও বেশি বিমূঢ়তার মধ্যে পড়ে। আর এই অবস্থায় সেটা আরো অসহ্য।

অতএব সূর্য যখন পশ্চিমাকাশে লাল বর্ণ ছড়িয়ে ছড়িয়ে পালাচ্ছে তখন ওরা কাঁচালংকা মেখে বেগুন পোড়া দিয়ে ভাত খায়। গোরুগুলোকে জল দিয়ে আসে, খড় দিয়ে আসে। সারারাত আর দেখবার সময় হবে না। কোন রকমে পেতলের পিদিমে একটা সলতে গুঁজে দিয়ে ধরায়। সে সলতের মাত্র ডগাটাই তেল-ভিজে হয়। পাবে কোত্থেকে? আজ তিন দিন হাটবাজার বন্ধ। আজকে বেগুন পোড়ায় তেল দেওয়া হয়নি, সেই তেল অল্প একটু খরচ করে আজ, আগামী কাল হবে বাকিটা দিয়ে। কিন্তু তারপর? যদি তেলের অভাবে সন্ধ্যে দেওয়া না হয়? কৃষাণী কাঁপে থরথর করে অমংগল আশংকায়। সেই কাঁপা কাঁপা বুক নিয়ে কোনরকমে ঘর ঢোকে এসে, পিঠে যেন কেউ নিঃশ্বাস ফেলে যায়। আপাদমস্তক কাঁথা চাপা দেয়, হাতটা বা পাটা কোন-রকমে বেরিয়ে পড়লে ভয় আরো

বাড়ে, তাড়াতাড়ি টেনে নেয়। বিপদ হচ্ছে ছোট ছেলেটাকে নিয়ে, চার মাসের বাচ্চা। ও কাঁদলে মুখে হাত চাপা দেওয়া হয়। কিন্তু ন বছরের মেয়েটা যদি তাল-পুকুরের শুশনি শাকের কথা জিজ্ঞেস করে, ফোঁস করে ওঠে মা। 'চুপ কর, হারামজাদি' তাও আবার অতি আস্তে। কিছুক্ষণ চুপ-চাপ কাটে, তারপর কৃষাণী বলে, 'ওগো, কালকে আমগাছের ওই গড়েটা কাল করে দিও। জ্বালন এগবারে নাই।'

'শালী, তোর পেটের চর্চা হল আগে! রাতটা বেঁচে থেকে আগে কাটা।'

তারপর উৎকর্ণ হয়ে পড়ে থাকে লোক। একটা মিনিটের জন্যেও ঘুম আসে না। গভীর রাত্রে কোন সময় হয়তো লাফ দিয়ে ওঠে ও, তারপর বাঁশের জানালার ওপর থেকে চটের পর্দা সরিয়ে বাইরে চোখ চালায়।

'কিগা, কি হল,' বউ উঠে আসে।

'শালী, তোর অমুক হল' হঠাৎ মুখ খারাপ করে লোকটা, 'শালী কুপীটা নিবিয়ে দে।' কোন রকমে ঘরটার ও-প্রান্তে গিয়ে আলোটা এক ফুঁয়ে নিবোয় বউ। শাড়িটা কখন গা থেকে নেমে গেছে, কোন রকমে জড়ানো আছে কোমরটায়। কিন্তু সেদিকে নজর দেবার এটা সময়ও নয়, ক্ষেত্রও নয়, ফিরে এসে আবার বেকুবের মতো শুধোয়, 'কি ?'

বলে ডান হাত দিয়ে লোকটার বাঁহাতের কনুয়ের ওপরটা ধরে।

'ঐ দেখ—ঐ জামগাছটার বাঁদিকে—'অনেকদূরে ছুটি আলো গর্জন করতে করতে চলেছে, 'ঘর্ ঘর্র্র্…'

মটরগাড়ী!

একটা নয়, দুটো নয়, কুড়িটা নয়, পঞ্চাশের ওপর হবে হয়তো।

আস্তে আস্তে কোথায় চলে গেল। না বোধ হয়, আলোগুলি নিবিয়ে দিলো ওরা।

তারপর একসময় চুপচাপ। লোকটা বিছানার ওপর ফিরে আসবে কিনা ভাবছে, কিন্তু আসা হল না।

বউয়ের গা-টিপে ডান হাতের আঙুল বাড়িয়ে সামনের রাস্তাটার দিকে দেখালে। বউয়ের হাতের মুঠিটা আরো শক্ত হয়ে ওঠে, লোকটার কানের কাছে ওর নিশ্বাসের শব্দ আর গতি দুই বেড়ে যায়। পুলিসের দল কোথায় যেন যাচ্ছে।

এই রকম কয়েক দল গেল। কোথায় গেল, কেন গেল জানবার উপায় নেই।

বেশ কিছুক্ষণ কোন কিছু শোনা যায় না, তারপর কোথায় যেন একটা আর্ত চীৎকার। দূরে, অনেক দূরে। বোঝা যায় না এই গ্রামে না অন্য কোথাও। তারপর সে চীৎকার থেমে যায়।

এর পরের বারে শোনা যায় কান্না। কোন স্ত্রীলোক কাঁদছে। এবারে আরো কাছে। ঐ কান্নাটা বোধ হয় এগিয়ে আসছে। না, ঐ কান্নাটা নয় বোধ হয়। আরো একজন যোগ দিয়েছে।

কোথাও গোলমাল হচ্ছে যেন একটু। কোন্‌দিকে হবে? ওটা যেন পেছন দিকে।

এই রকম করে ঘণ্টাখানেক কাটবার পর গ্রামটা যেন কোঁকাতে থাকে। অতি বিলম্বিত চাপা কান্না, আর মাঝে মাঝে অতি যন্ত্রণার চিৎকার। শুধু পড়ে পড়ে শোনো। যদি একলা বিছানায় থাকো, তাহলে বালিশ জড়িয়ে ধরবে, নয় তো, বউ থাকলে তোমাকে জড়িয়ে থাকবে বউ। তোমার আশংকার কথা যদি মুখ ফুটে বলো যে, হয়তো এ বাড়িতেও অমন কান্না উঠ্‌তে পারে, বউ অমনি কেঁদে উঠ্‌বে, 'তোমার পায়ে পড়ি, অমন কথা বোলোনি—'

এক সময় আবার তড়াক করে লাফিয়ে জানালার ধারে যেতে হয়।
সেই বাসগুলো ফিরে যাচ্ছে।
এবারের শব্দ আরো কম। নিশ্চয় বোঝাই হয়েছে।
'লোক ধরে লিয়ে গেল—'
তখন সকাল হয়ে গিয়েছে। বউ সেদিকে কান দেয় না, ও দড়াম করে লক্ষীতলায় পড়ে কাঁদে আর চেঁচায়, 'হে মা লক্ষী, তুমি রক্ষে করেছ মা, তুমি বাঁচি দিছ। হে ভগমান—'
কিন্তু সমস্ত দিন একটা শব্দও শোনা যায় না। সত্যি সত্যি যেন মড়ার মত পড়ে থাকে গ্রামটা। কিন্তু কানে কানে কথা ছড়ায়, উহুঁ এক হাজার, উহুঁ পাঁচ হাজার লোক নিয়ে গেছে। কিন্তু সে তো বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেউ বললে একশো। সেটাও তো বিশ্বাস করা যায় না।······

নিশাপর্বের পর শুরু হল দিবা-পর্ব। দিন দুই পরে।
ছোট্ট পাড়াটার সব পুরুষগুলোকে একত্র করা হল, মনে করো রাধু চাষীর খামারে। তারপর বলা হল, 'বল, তোদের মধ্যে কারা ছিলি সেদিন শোভাযাত্রায়? যদি না বলিস, তাহলে সব কটাকেই নিয়ে যাবো।'
চারদিকে সৈনিকগুলি ঘিরে দাঁড়িয়েছে। একেবারে রাইফেল উঁচানো অবস্থায়। সেদিকে ওরা তাকায়, তারপর পরস্পরের দিকে। একজন ইতিমধ্যে বলে, 'মাখন, তুমি সত্যি কথা বল। তমার জন্যে আমরা সবাই মরি কেনে?
'তা আমার নাম বলবে বৈ কি। কিন্তু তমার ভাই-পো বংকু, তার কথাটা বেমালুম চেপে গেলে চলবেনি?'

তা ছাড়া, অর ভাইপোর কথা কেনে,—বুকে হাত দিয়ে অর নিজের কথাটা বল্। কি, তুমি আমার কাছে বলনি, যে তখন যদি আমি থাকতম, লাঠি মেরে মাথাটা ছিঁচে দিতমনি ?'

'তমার কথাটা ? তমার কথাটা বল আগে।'

এইভাবে ঐ ছোট্ট দলটুকুর সবাইয়ের নামে অভিযোগ তো উঠ্লোই, তাছাড়া, যারা ঘেরাও হয়নি তাদের নামেও উঠ্ল। অতএব গ্রেপ্তার করো সব কটাকে।

দিনে রাতে এই পাইকারী হারে গ্রেপ্তারে অবিশ্যি একটা বাধা এসে দেখা দেয়। পুরুষরা সবাই, আর, মেয়েদের কিছু অংশ জংগলে পালিয়ে যায়। নিশাপর্বের আগে থেকেই কিছু কিছু পালাতে শুরু করেছিল, তারপর দিবাপর্বের সময় পালাল দলে দলে।

কিন্তু যাদেরকে পেছনে ফেলে রেখে গেল, তাদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক।

'বল শালি, তোর বেটা কোথায় ? তোর পুরুষ কোথায় ?'

স্ত্রীলোকেরা শুধু কাঁদল, পুলিস আসার আগে, আসার সময়, প্রশ্ন শুধোলে পর, আর ওরা চলে গেলেও কাঁদে। পুলিস দল গত্যন্তর দেখে না। প্রথম অশ্লীলতম গালাগাল দেয়, তারপর লাথি মারে, চুল ধরে হাত ধরে টানে। তারপর যে অত্যাচারের জন্তে সমস্ত সমাজটাই অপমানিত বোধ করে, সেই চরম অপমানও চলে।

অতঃপর স্ত্রীলোকেরাও বনে পালিয়ে যায় পুরুষদের কাছে।

কিন্তু একটা ভুল করে গিয়েছিলো। গোয়ালে গোরু, ছাগল, আর ভারীতে ছিল হাঁস মুরগি। বন্ধ করা অবস্থায় পড়ে ছিলো তাড়াতাড়িতে খুলতে পারেনি। আগন্তুকরা যতগুলো পারল হাঁস-মুরগি শেষ করল কিন্তু গোরুগুলো অনাহারে তৃষ্ণায় চিৎকার করতে শুরু করল। তারপর মরে গেল একদিন। জনশূন্য গ্রামে দুর্গন্ধে মানুষ ঢুকতে পারত না।

ছেলে গরু হারানোর চেয়ে বড় আঘাত চাষীর কাছে আর নেই। তার ওপর, তাদের জংগলে চলবে কি করে, খাবে কি। তার ওপর অনুপস্থিত কৃষকদের বাড়ি-ঘর ক্রোক করা হল। তাই ফিরে আসতেই হয়, প্রথমে দু'একজন, তারপর দল বেঁধে। এসে আত্মসমর্পন করলে, 'হুজুর আমাদের মা-বাপ, যা ইচ্ছে কর।'

অবশ্য প্রায়ই এর উল্টো রিপোর্টও আসে।

স্ত্রীলোকরাই প্রধান অংশ গ্রহণ করে ব্যাপারটায়। কিছুতেই তারা কারো খবর দেবে না। স্বামী হয়তো খিড়কির ধারে বন দিয়ে পালাতে চায়, কিন্তু, ওধারে বড় ছেলের গায়ে সংগীনের খোঁচা চলেছে সদরে।

'মাগি, তোর ভাতারের খবর দে। নইলে তোর বড় ছেলেকে মেরে ফেলব।'

'খপর দিব কি করে বাপ। জানব, থালে ত দিব। ছেলাকে আমার রাখ কি মার, সে তমাদের হাত।'

এ রকমও হয়েছে, পাড়ার মেয়েরা বঁটি, কুড়ুল, ঝাঁটা, কাটারি নিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছে একটা সশস্ত্র দলকে। ওরা একটা গুলি ছুঁড়বারও সময় পায়নি। সমস্ত অভিযানটা যিনি পরিচালনা করছিলেন, সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস, মেদিনীপুর,—তাঁর কাছে এটা রহস্য। কিন্তু সে কথা পরে হবে।

ছোট্ট ন'বছরের ছেলে। জিজ্ঞাস করা হল, 'বল তোর বাপ কোথায়? নইলে দেখেছিস বন্দুক।'

'মারবে তো মারো।' বলে দু'কোমরে হাত দিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়ায়। হাসি পায় ওর বীরত্ব দেখে, কিন্তু আশ্চর্য। সত্যিই আশ্চর্য!

কিন্তু যে রহস্যের কথা বলছিলাম। অজস্র গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কিন্তু আসল কর্মী যারা তাদের দু একজন ছাড়া কেউই ধরা পড়েনি। রুই কাতলারা তো নয়ই। গাফিলতি কার? পুলিসগুলো ওদের কায়দা করতে তো পারেইনি, বরঞ্চ অনেকক্ষেত্রে নাস্তানাবুদ হয়েছে। ওরা গুলি করে না মেয়েদের ওপর। অফিসার-ইন-চার্জ অনেক সময় গুলি করবার আদেশও দেননি। কারণ, যদি আদেশপ্রাপ্তরা অস্বীকার করে। একবার যদি তিনি অপমানিত হন তাহলে তাঁর কাজ চালানোই দুরূহ। অধীনস্থ কর্মচারীদের মনোভাবেরও খোঁজ নিতে হয়, তারা তো মানুষ, ভালো-মন্দের জ্ঞান অল্প-বিস্তর থাকবেই তাদের।

এ রকম হামেশাই ঘটে যে, পুলিসরা জনতার ওপর গুলি ছোঁড়েনি বলে পরে গর্ব করেছে। ঠিক এই কথাই একটি পুলিস জনৈক অন্তরীণ কর্মীর কাছে বলেছিলো।

'এটা যে বাড়াবাড়ি হচ্ছে সেটা আমরা বলছি। কিন্তু দেখেন কী আর আমরা করতে পারি। আমরা হুকুমের চাকর। তবু একটা কথা বলি, দেখেছেন তো সবই, আমাদের গুলিতে আর ক'টা মরেছে?'

এই মনোভাব গড়ে উঠল কী করে? সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অব পুলিস, মেদিনীপুর,—এ কথা অনেকবার ভেবেছেন। কিন্তু কোনো সন্তোষ জনক জবাব পাননি। কিন্তু ওদের মনোভাব যে এরকম আছেই সেটা একটা ফ্যাক্ট, সেটাকে মেনে নিতে হবেই। তাই এই বর্তমান অভিযানে, তিনি নতুন পুলিস এনেছেন, অন্য প্রদেশের পুলিস। তাদের দিয়ে গ্রেপ্তার করিয়েছেন।

যে সমস্ত পুলিস এখানকার নানা ক্যাম্প (এরকম-ক্যাম্প অনেক আছে, এ সমস্ত ঘটনা ঘটবার অনেক আগে থেকেই) আগলায়

তাদের ওপর বিশ্বাস নেই তাঁর। তিনি জানেন, এরা প্রথম দুদিন ঠিক থাকে, তৃতীয় দিন পাঁজারীর কাছ থেকে একটা শশা চেয়ে নিয়ে মুড়ি দিয়ে খায়, চতুর্থ দিনে গাঁজা টানতে টানতে গল্প করে মধু গয়লার সংগে। পঞ্চম দিনে গাঁয়ের বউ-ঝি নিয়ে গাল-গল্প রসিয়ে রসিয়ে। এরা কখনো পারে তাদের ঐ অতি পরিচিত লোকগুলির ওপর বন্দুক ছুঁড়তে ?

সরকার অবিশ্যি জনসাধারণের সংগে পুলিসের যোগাযোগ বাড়াতে বলেছেন। কিন্তু যাদের ঐ সাধারণের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে তাদের দ্বারা কাজ পাওয়া যাবে না। অবিশ্যি গণসংযোগেরও দাম আছে একটা, সেটা তিনি স্বীকার করেন।

কিন্তু আসল কাজের বেলা অত্যন্ত সংযোগহীন দল আমদানী করতে হবে। তাই তিনি করেছিলেন। কিন্তু তারাও কি করে মেয়েদের ওপর গুলি চালায় না ? হাস্যকর ভাবে ঝাঁটা বঁটির সামনে পশ্চাদ-পসরণ করে ?

তার কারণ অবিশ্যি কিছু নয়। ছেলেবেলা থেকে ওরা মেয়েদের সম্বন্ধে যে ধারণা নিয়ে আসে সেটা যাবে কোথা থেকে। সামাজিক নীতিবোধের ভূত চড়ে থাকে ওদের ঘাড়ে।

আশ্চর্য। মানুষকে দিয়ে অনেক কিছু করাও যায়, অনেক কিছু করা যায়ও না। এইটে তার কাছে সব চেয়ে ইরিটেটিং ওআণ্ডার !

কিন্তু হতে পারতো, যদি শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সংগে সংগে তাকে আর্মিতে এনে ভর্তি করা হতো। হতে পারতো হয়তো। কিন্তু সেটা তাঁর হাতের বাইরে।

উনিশ

ঘাটাল শহরের কুঠিবাজার এলাকার ভেতরে চত্বরের মতো জায়গা আছে একটা। অবিশ্যি চৌকো নয়, বাঁধানোও নয়। এক কালে ইট সুরকি দিয়ে কিছু একটা করা হয়েছিলো। এখন এক পশলা বৃষ্টি হলে এক বিঘৎ জল জমে। একটু শুকনো হয়ে গেলে ধুলো উড়ে চারপাশের দোকানী আর খদ্দেরদের লাল করে দেয়, তাদের শ্বাস রোধ করে। আর যখন হাজা-শুকো কিছুই নেই তখন চট্‌চট্‌ করে এঁটো শালপাতা, গোরুর উচ্ছিষ্ট খড, তাতে কয়েক লক্ষ মাছি।

তারই এক ধারে ধানের দোকান একটা। কাদের হবে যেন। কোন এক বড় মহাজনের বলেই জানা গেছে। সেই ধানের দোকানের সামনে বিশ হাত লম্বা তিন হাত চওড়া ছোট্ট একটা চাতাল। সেই চাতালে শ'-দেড়েক চাষী বসে বসে মুড়ি চিবোচ্ছে। মনে হয় অতি নিশ্চিন্ত, কোথাও যাবার পথে এখানে একবার বসে বিশ্রাম করে নিচ্ছে আর কি।

প্রত্যেক পনেরো দিন অন্তর তাদের একবার করে হাজিরা দিতে হয় ঘাটালের আদালতে। তারা সরকারের আসামী, কিন্তু এখনো অভিযুক্ত হয়নি। অভিযুক্ত হবার আগে হাজতে থাকতে হয়, কিন্তু এরা জামিন পেয়েছে। আর তারা যে ফেরার নয়, সেইটা বোঝাবার জন্যে এই রকম মুখ-দেখানোর দিন পড়ে। প্রত্যেকবার তাদের যাতায়াতের বাস-ভাড়া, এখানে খাবার খরচ, উকিলের ফি, সব মিলিয়ে খরচ কত! তার ওপর সেদিনকার রোজ নষ্ট তাদের।

উকীলরা প্রথমেই বলেছিল তাদের, 'হতভাগারা, তার চেয়ে হাজতে থাক, জেলে যা। বরঞ্চ দু'বেলা খেয়ে বাঁচবি। তা না করে এত খরচ পাবি কোত্থেকে?'

'সি বাবু জানিনি, ভগমান সি একটু জুটি' দিবেন।' মাথা চুলকে মহা বিব্রত হয়ে উকীলবাবুর তক্তপোষের একধারে মাটির ওপর বসে কৃষকটি বলে। পাঁচহাত ধুতি একটা পরনে, গায়ে পৈতৃক আমলের অতি পুরনো শত ছিদ্র কালো দামী কোট। কোলের উপর ছাতা, সেই ছাতাটা গামছা দিয়ে জড়ানো যার এক খুঁটে কৃষক-বউয়ের দেওয়া পান-বাঁধা, নয়তো মুড়ি শশা পোঁটলা করা। হাত দুটো প্রায় জোড় করে বলে, 'জেলে যেতে পারবনি বাবু, উটি পারবনি।'

'শোন গো শোন তোমরা একবার। বলি, জামীন তো দিলাম না হয়, কিন্তু এই পনের দিন ছাড়া মুখ দেখানোর খরচ জোগাবি কী করে। আজকাল কোর্টে যে রকম ঝামেলা, তার ওপর কবে তোদের নামে চার্জশীট আসবে, তারপর মামলার শুনানী। সে শুনানীও যে চলবে কতকাল, তাই বা কে জানে।'

কিছুক্ষণ বিভ্রান্ত হয়ে যায় কৃষকটি। মনে মনে দুটো দিকই ওজন করে দেখে। একদিকে কালো অন্ধকার ভয়ংকর জেল (জেল বললে এই বিশেষণগুলি আপনিই ওদের মনে আসে), আর অন্যদিকে তার বউ ছেলে, তার জমি জমা, তার রোজকার কাজ। না, সে জামিনই চায়। তাতে তার দুটো চারটে বাসন-কোসন যদি বিক্রী করতেই হয় তো সে কিছু মনে করবে না। হয় তো, উকীলবাবু যা বলছেন, সেটা সত্যি যে এক সময়, তাদের মামলার শেষ হবে যখন তাদের জেলে যেতেই হবে। যে অপরাধ তারা করেছে, তাতে এমনি রেহাই পায় না কেউ। তবু, তবু ভালো। বন্দী হয়ে থাকবার চেয়ে সেটা ভালো।

'তবে অই হবে। তোমরা আগে সর্বশান্ত হও, তারপর যাও জেলে।' ওদের হিসেবী বুদ্ধি দেখে উকীলবাবুরা হাসেন।

অতএব ওরা পনেরো দিন ছাড়া একবার আসে। ওদের আসার কবে যে শেষ হবে ওরা জানে না। তাছাড়া দল ওদের ক্রমশ ভারী হয়। নতুন নতুন ধরে আনা হচ্ছে, নতুন যোগ করা হচ্ছে ওদের দলে, তারপর শুধু ঘাটাল আদালতেই নয়, আদালতের এলাকা অনুযায়ী কাদেরও পাঠানো হয় সদর আদালতে। তাদের দলও খুবই বড়ো, ঘাটালের দলের থেকেও বড় হবেই।

একদিন ওরা একটা নোটীশ দেখে, ঘাটালে। অন্যান্য জায়গায়ও দেওয়া হয়েছে, সেটা তারা পরে জেনেছিল। কিন্তু প্রথম নজরে পড়ে তাদের ওখানেই। ঘাটালের নদী শীলাবতীর পোলের মাথায়, আদালতের ওপারে। সরকার ঘোষণা করেছেন, পলাতক আসামীদের যারা সন্ধান দিতে পারবে, তাদের প্রত্যেকের জন্যে এত টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। তারপর সেই আসামীদের নামের এক লম্বা ফিরিস্তি। ফিরিস্তি দেখে ওরা অবাক। তাদেরই প্রিয় নেতাদের নাম। অতি পরিচিত, প্রত্যেক দিনকার কাজে ওদের সংগে তাদের যোগ ছিলো।

আর আশ্চর্য। প্রত্যেকেই ওটা পড়ে, কিন্তু কেউই সে নিয়ে কোন আলোচনা করে না পরস্পরের সংগে। যেমন ওদের ঠিক তেমন তেমন করবার পর প্রস্থান করে।

কিন্তু নানা রকম মন্তব্য, জিজ্ঞাসাতে বিব্রত হয়ে পড়ে ওরা। মোটর ষ্টাণ্ড থেকে নদীর পোল পর্যন্ত আসতে আসতে পড়ে দু'সারি দোকান। পোলের মাথার কাছাকাছি পোস্তার সরু গলি, তার দুপাশে দোকানদার আর চ্যাংরা কর্মচারী।

"এই লাও গো, কমুনিষ্ট (উচ্চারণ অকারান্ত) এল।'

'শালা, দেখলে মনে হয় মেনি বেড়াল। ইদিকে পুলিস মারে। ওগো বাবাগো—'

কোনো অতি ফাজিল ছোকরা, বয়েস দশ পেরেবে না, এগিয়ে এসে হয়তো কারো হাতটা একটু নাড়া দিয়ে বলে, 'ও জ্যাঠা তমরা কি করেছিল বল না? এঁ্যা?'

কোনো দোকানদার, বয়েস হয়তো কুড়ি-বাইশ, হেঁকে বলে, 'ওগো, গেঞ্জি লিবে, সরেস-গেঞ্জি—' ওরই মধ্যে যারা খবরের কাগজ নিয়মিত ভাবে পড়ে, বা যারা খবরের কাগজের এজেন্ট, তারা বলে, 'দেশের সব জায়গায়ই ওই হচ্ছে। কোথায় তুমি জোড়া তালি দেবে বল।'

এই সব কথা ওরা অনেকটা বোঝে, অনেকটা বোঝে না। কেবল তারা যে একটা কৌতূহলের সামগ্রী হয়ে উঠে এখানকার লোকগুলির কাছে, সেটা বুঝতে পারে। আর লজ্জায় কেমন হয়ে যায়। মনে হয়, নিশ্চয়ই একটা বোকামির কাজ করেছে।

কোর্টের সবুজ-মাঠে ছড়িয়ে ছড়িয়ে বসে ওরা। একটা বড় শিরিষ গাছ, আর আম গাছ ছায়া মেলে রয়েছে অনেকখানি জায়গার ওপর। ওদের অধিকাংশই সেই ছায়ায় বসে। গাছের ওপর কাক ডাকছে। দক্ষিণ দিকে ইস্কুল, সেখানে এই মাত্র ঘণ্টা পড়তে হৈ হৈ করে ক্লাশে ঢুকে নিশ্চিন্ত হল। প্রজাপতির মতো ছেলেগুলো লাফিয়ে বেড়ায়, মার্বেল খেলে, ছুটোছুটি করে। একটা ফুলো-ফুলো গাল ছেলে তার দাদার সংগে ওদের দেখতে এসেছিল। কী সুন্দর ছেলেটি; অমন সুন্দর ছেলে আর দেখেনি ওরা। ইচ্ছে হয়েছিলো দুহাতে তুলে আদর করবে, কিন্তু হাতের যা ছিরি—ফাটা, চামড়া-ওঠা। ছেলেটা যন্ত্রণায় মরুক শেষ কালে। কিন্তু ওর দাদা, সেও সুন্দর সে অদ্ভুত কথা বলছে। শুনে বিশ্বাস হয় না। বলে 'আপনারা যা

করেছেন এর চেয়ে ভালো কাজ হয় না। এই দুঃখপূর্ণ পৃথিবীতে আপনারাই শান্তি আনবেন।'

কালো কালো চোখ, ঠোঁট দুটি লাল, চওড়া কপাল ওর। ধীরে বলে কথাগুলি। গলার স্বর তো নয়, যেন মধু ঝরে পড়ছে। আহা রোজ যদি ছেলেটির সংগে দেখা হয়।

ওরা একটু সরে আসে বসে বসেই এগিয়ে ঘন হয় চারিদিকে। আর একটু বসেন আপনি। আরো দুটা কথা বলেন।'

'আমাকে আপনি বলতে হবে না। 'তুমি বলুন। কত ছোট আমি আপনাদের থেকে।'

ওরা তীব্র প্রতিবাদ করে, 'না, না। তাকি হয়। আপুনি কত বড়লোকের ছেলে। আপুনি বড় হলে লাট হবে, জজ হবে। আর আপনার ভাই হবে রাজা, আমাদিগের রাজা হবে। না কিগো খোকা-বাবু।'

একটু চুপ করে থাকে, তারপর বড় বড় জলের ফোঁটা তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে আসে। ও নিজে পকেট থেকে রুমাল বের করে চশমা খুলে চোখ মোছে।

'হ্যাঁ। তাইতো। বড় হলে লাট হব আমি, জজ হবো।'

ওরা ব্যথা পায়। এক হলকা কান্না গলার মধ্যে ঠেলে আসে, 'কাঁদছ আপুনি? আমরা মুখ্যু মানুষ, কি বলতে কি বলেছি।'

'ছিঃ ছিঃ। ওকথা বলবেন না। আমার চোখের দোষ আছে। মাঝে মাঝে ভীষণ জল কাটে।'

এমন সময় একজন উকিল হন্তদন্ত হয়ে আদালত-কক্ষের দিকে এগোচ্ছিল। ছেলেটিকে দেখে না থেমেই বললে, 'কিগো রণু বাবু এ আবার গর্ভ-যন্ত্রণা কেন? কমিউনিষ্টদের দলে?' কাকাবাবু, ভাববেন না। হীরে কয়লার খনিতে গেলে কয়লা হয় না।'

'তাই নাকি?' খানিকটে অপদস্থভাব আর খানিকটে ক্রোধ ওঁর চোখে মুখে ফুটে ওঠে।

ছেলেটি সে দিকে খেয়াল করে না। বলে, 'কিছু মনে করবেন না। খবরের কাগজে আপনাদের খবর বেরোয় না বলে, আপনাদের বিরক্ত করে গেলুম।'

পরে অবিশ্যি ওরা শুনেছিলো ওর কথা। ইস্কুলের সেরা ছাত্র। কোলকাতার কে এক বড় ব্যারিষ্টারের ছেলে, এখানে মাসি-বাড়ি এসেছে। এখানেই অনেক দিন আছে।

আশ্চর্য!

কিন্তু জিনিসটা ওদের ভাবিয়ে তোলে। ওরা জানতো, যে কেবল-মাত্র ধান-বিক্রীর ব্যাপার নিয়ে প্রতিবাদ ওঠে, তারপর সেটা দাঁড়ায় গিয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে। কিন্তু তারা যে, ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা করতে চলেছে সে কথাটা ওরা বুঝতে পারে না। বুঝবার ক্ষমতাও নেই। কিন্তু ওই ছেলেটিকে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে যায় না। বোধ হয় তাই হবে, তাই হবে।

অজান্তে ওদের ছাতি ফুলে ওঠে। এই দুপুরের বাতাসটা অতি ভালো। বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়।

বিশ

দেবেন্দ্রনাথ সমাজপতিকে অভ্যর্থনা করার ভার অনুতোষ সিংহ তাঁর একমাত্র কন্যা সুলেখার ওপর দিয়েছিলেন।

আর এই ভার পেয়ে সুলেখা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলো। এই এত বড় বাড়িতে সে প্রায় একা। বাড়িতে মা নেই, বোন নেই, ভাইও নেই। বাবা ছাড়া কেউই এমন নেই যার সংগে দুদণ্ড কথা বলা যায়। বাড়িতে একগাদা চাকর-চাকরানী, তারা রাঁধে বাড়ে খাওয়ায়। আর তাদের সংগে যোগাযোগ রাখা মানেই তাদের ধমকানো, নয়তো প্রসন্ন হয়ে বকশিস করা। দুটো পিঠ-চাপড়ানো কথা বলা। অবশ্য একমাত্র সংগী তার অনুতোষ বাবু, কিন্তু তিনি নানা কাজে এত বেশি ব্যস্ত থাকেন যে তার দেখা পাওয়াই ভার, দুটি মনকে কাছাকাছি এনে অনুভব করতে হলে যে সময়টুকু দরকার, সে সময় পাওয়া তো দূরের কথা। মাঝে মাঝে অবিশ্যি রাত্রিতে তাঁর সংগে দেখা হয়, তখন এত বেশি ক্লান্ত থাকেন যে বেশির ভাগ দিনই কন্যার কুশল সম্বন্ধে মামুলি প্রশ্ন করেই ইতি কর্তব্য শেষ করেন। মাঝে মাঝে গান গাইতে বলেন। আর গান গাইতে বললে সুলেখার আর আনন্দের সীমা থাকে না। কিন্তু এ ব্যাপারে এক অদ্ভুত খেয়াল রয়েছে তার। সাধারণত বাড়িতে তো কেউ-ই থাকে না চাকর বাকররাই ভিড় করে আসে ওর গান শোনার জন্যে। ও তাদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু এতই ভালো ও গায়, চাকর বাকরেরা নিচে থেকে নিস্তব্ধ হয়ে গান শোনে। কিন্তু যেদিন

ও জানতে পারে, ওরা চুরি করে ওর গান শুনেছে, তখন ক্ষেপে গিয়ে ওদের নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে। ওর গান যে ওরা শুনবার উপযুক্ত সে কথা ওর মনেই হয় না। তাছাড়া অধিকাংশ লোককেই ও মনে করে অতি অপদার্থ।

বাবাতে-মেয়েতে মাঝে মাঝে জামাইয়ের সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়। জামাই আমেরিকায় শিল্প-সম্বন্ধে পড়াশুনো করতে গেছেন। সেও তো আজ বছর চারেক হল। মাঝে মাঝে চিঠি পত্র আসে তাঁর। অমুতোষ বাবু আর সুলেখা দুজনের কাছেই আসে। কিন্তু আশ্চর্য একই কথা তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেখেন, অমুতোষ বাবুর চিঠিতে থাকে একটা রিপোর্টিংএর আবহাওয়া, আর সুলেখার চিঠিতে আর একটু আত্মীয়তা। আর তাঁর চিঠির বিষয়; কী আশ্চর্য রকম ভালো লাগছে তাঁর ঐ দেশটা। নতুন পড়াশুনো ভালোই লাগছে। পরীক্ষায় তিনি শীর্ষে যাবেন এই হচ্ছে তাঁর ধারণা। ভারতবর্ষের সংগে ওখানকার তুলনা করে আপসোস করেন।

পিতাপুত্রীতে নিজের নিজের চিঠির খবরের অন্যকে ভাগ দিতে চেয়েছেন। কিন্তু হুবহু মিলে গেছে দুজনেরই বক্তব্য। সুলেখা প্রথম প্রথম অত্যন্ত ব্যাথা বোধ করত, একটু পৃথক ধরনের চিঠি কী সে আশা করতে পারে না? কিন্তু জামাতার ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে অমুতোষ বাবু এতই উচ্ছসিত হয়ে উঠ্‌তেন যে, সুলেখা নিজের ব্যথার কথা বলতে পারতো না। আজকাল অবিশ্যি তার উল্টো-টাই হয়েছে। ক্রমাগত একই কথা শুনে শুনে, আজকাল নিজেই বলে, 'আঃ, উনি যেদিন সফল হয়ে আসবেন!'

অর্থাৎ একান্ত একলা হয়ে থাকলে যা হয়, সময়টা অত্যন্ত ভারী হয়ে বেদনার মতো তার বুকের ওপর চেপে থাকে। আর ঠিক সেই জন্যেই এই অভ্যর্থনার ভার পেয়ে আনন্দিত হয়ে ওঠে।

সমাজপতি আসবেন বিকেলে, কিন্তু ও সকাল থেকে আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ঠিক সকাল থেকে বলা ভুল হবে, কারণ আগের দিনেই ও ঘরদোর আসবাব-পত্র ঝাড়া-মোছা ধোয়া-ধুয়ি করিয়ে নিয়েছে। কোথায় কোন টেবিলটা দেয়ালের কত কাছে থাকবে, বা লাল রঙের আলমারীটার মাথায় থাকবে পুতুলটা না এমনি খালি থাকবে। কারণ, ঘর সাজানো তো আর যাতা ব্যাপার নয়, একটা রীতিমতো আর্ট। বিশেষ করে, সুলেখা যখন আর্কিটেকচরল ডিজাইন সম্বন্ধে এককাল কিছু পড়াশুনো করেছে।

বিকেলের আগে সারা দিন ধরে চেষ্টার ফলে নিজেকে আশ্চর্য রকমে সাজিয়ে তুলল সুলেখা। নানা রকম আয়োজনের ভিড়ে চোখে পড়ে ওর খোঁপায় গোল করে জড়ানো গোড়ে-মালা, বেলফুল দিয়ে, ডান হাতের কব্জি-বন্ধ, কপালে গোল কুঙ্কুমের চারপাশে অতি সূক্ষ্ম অতি সুন্দর চন্দনের গোলগোল ফোঁটা।

ঠিক দরজার মুখেই সুলেখা সমাজপতির কপালে দিলো চন্দনের টিপ, তারপর ক্ষীর-মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন, তারপর অন্য কথা।

সমাজপতির আপাদমস্তক খদ্দরে মোড়া। খাঁটি বাঙালীর মতো মুখ চোখ চলা-ফেরা। কিন্তু প্রশংসা করে ব্যাপারটাকে বললেন, 'হাউ চার্মিং!'

বাড়ির চাকরানীরা কিন্তু অবসর পেয়ে গড়িয়ে পড়লো হেসে।

'অমা, আমরা ভেবেছিলম কি একটা ব্যাপার হবে। কেউ কেটা লিচ্চয় এসবে সেই জন্যে এত কাণ্ড। লোকটার মুখটা দেখছু, বাঁদর বাঁদর। ওমা, এই জন্যে এত সাজ-গোজ, এত!'

'দেখনা যেয়ে ঐ লোকটাকে লিয়ে গলে পড়েছে মাগি। বাপে-বেটিতে লোকটাকে কি পেইচে।'

সন্ধ্যেবেলা ওরা তিনজনে তিনতলার একটা ঘরে বসে কথাবার্তা

বলছিলো। সমাজপতি বললেন, 'আপনার সংগে আলাপ করে অত্যন্ত খুশি হলুম।'
সুলেখার চোখ-মুখ অতি শান্ত দেখাচ্ছে। নরম নরম গাল কালো বড়োবড়ো চোখ। সেই চোখে নতুন ঔৎসুক্য। সে বললে, 'আমিও অত্যন্ত আনন্দ পেলাম।'
বললেন সমাজপতি, 'আপনাকে দেখে আমার কেবলই সংঘমিত্রার কথা মনে পড়ছিল।'
'তাই বুঝি। কেন?'
'ঠিক বলতে পারিনি। কিন্তু এই সন্ধ্যে মুহূর্তে আমরা কেবলই শান্তির কথা চিন্তা করি বলে বোধ হয় সে-রকম মনে হয়ে থাকবে। তাছাড়া আপনি চন্দনের ফোঁটা দিলেন, অভ্যর্থনা করলেন খাঁটি ভারতীয় পদ্ধতিতে তখন একথা না মনে হয়ে উপায়ই ছিল না।'
কন্যার প্রশস্তিতে পিতা গর্ববোধ করেন। 'ওর এসব নিজের পরিকল্পনা। ও নিজেই সব কিছু করেছে। ও বলছিলো, ব্যাপারটা ঘরোয়া, কিন্তু ঘরের তো একটা কল্যাণ-বোধ মানুষের রয়েছে, সেইটে দেখানো চাই।'
সমাজপতি বললেন, মজার ব্যাপারটা দেখুন। এতদিন যেটা ছিল ব্যক্তিগত ভাবে, সেটা আজকে সামাজিক দিক দিয়ে অনুভব করতে হচ্ছে। দুটো চন্দনের ফোঁটা, আর একটা মাংগলিক অনুষ্ঠান হয়তো কোন এক খামখেয়ালী শিল্পীর ব্যাপার ছিলো একদিন, কিন্তু ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে সেটার অসাধারণ সামাজিক মূল্য দাঁড়িয়েছে। সেই মূল্যবোধ এতদিন ছিল না, যে কোন কারণেই হোক সেটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। আমাদের এখন কর্তব্য সেইটেকে ফিরিয়ে আনা।'
সুলেখা নিজের হাতের ওপর চিবুক রেখে কথাগুলো শুনছিলো। ও

বললে, 'আপনার কি মনে হয় না যে পরাধীনতার ফলেই এই রকম একটা আত্মবিস্মৃতি আমাদের ঘটেছিল? অবিশ্যি, পরাধীনতার যে সমস্ত কুফল সেগুলো একে একে দূর হবার সংগে সংগে এই আত্ম-বিস্মৃতিটাও যাবে। অম্বুতোষ বাবু আলোচনার ধারাটা ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। সেদিনকার ঘটনাটা এতো জীবন্ত এখনো যে এখন অন্য কিছু প্রসংগ নিয়ে আলোচনা তাঁর কেমন যেন ধাতস্থ হচ্ছিল না। দেবেন্দ্রবাবুও তো সেই উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছেন। এই রকম একটা গোলমাল মফঃস্বলে প্রায়ই হয়, এবং তার জন্যে সেক্রেটারিয়েট থেকে লোক ছুটে আসে না। ওপর থেকে এমন একটা কিছু গুরুত্ব এইটের ওপর দেওয়া হয়েছে, যেটা তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না। তাই প্রথম থেকেই আশা করছিলেন ঐ প্রসংগে কোন কথা উঠবে এবং তিনি প্রয়োজন বুঝে সুলেখাকে উঠে যেতে ইংগিত করবেন। কিন্তু ওদের কথাবার্তা সেদিকে মোটেই ঘেঁসছে না। তাছাড়া আলোচনার ধারা দেখে মনেই হয় না যে, কেবল একজন 'মহিলা'র সম্মান রক্ষার জন্যে শিষ্টাচার করছেন। ওদেরকে রীতিমতো আগ্রহান্বিত দেখায়। তাই আলোচনাটায় তাল রাখবার জন্যে তিনি বলেন, 'সুলেখা মা আমার যে বললেন, পরাধীনতাই আমাদের আত্মবিস্মৃতির একমাত্র কারণ, সেটা বোধ হয় ঠিক নয়। আমাদের সামাজিক অবনতিটাও দেখতে হবে।'

'ঠিক তাই। এসবের মূলে কি আছে সেটার সম্বন্ধে আমাদের আগেকার মতামত যাই থাকুক না কেন নতুন করে স্থির মস্তিষ্কে সেটা ঠিক করতে হবে। এটা অবশ্যি সত্যি যে, দেশের মধ্যে অনেক অভাব অভিযোগ ত্রুটি রয়েছে, সেগুলোকে দূর না করতে পারলে, কোন মহত্তর কিছুর দিকে মনোযোগ দেওয়া যায় না। অথচ দেশে যদি শান্তির আবহাওয়া নিশ্চিন্ত ভাবে না থাকে তাহলে সে ত্রুটিগুলি সংশোধন

করে কোন গঠনকার্য চলিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় কোন মতেই।' বলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকালেন।

'আমিও তাই মনে করি।' সুলেখা বললে, 'ঠিক এই আর্জই আপনাদের কাছে আমি পেশ করছি। দেশে শান্তি রক্ষার ভার আপনাদের ওপর। সেটা আপনারা যে-কোন রকমে করুন। এই আমাদের গ্রামেই ঘটল প্রকিওরমেণ্টের ঘটনাটা। কি ভয়ানক! কিন্তু আমি অবাক হয়ে গিয়েছি ওদের কাজ দেখে। কিন্তু দোষ ওদের দিতে ইচ্ছে করে না। ওরা যে কত ছোট সে আপনি ধারণা করতে পারবেন না। আমি দেখেছি নিজে। এতটুকু বিদ্যে-বুদ্ধি-শিষ্টাচার-সহিষ্ণুতা নেই ওদের। ওরা শুধু খাওয়া-পরা পেলেই বর্তে যায়। আপনি দিন ওদের ভাত কাপড়, ওরা তারপর আর চাইবে না কিছু। তাই ভাত কাপড় দিয়েই ওদের শান্ত রাখতে হয়। গীতায় ভগবান বলেছেন, দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়। তার অর্থ আমি এই বুঝি, ওদের মতো লোকদের দান করে শান্ত রাখতে হয় তবেই যা কিছু সুন্দর যা কিছু মহৎ তার অনুশীলন সম্ভব। আপনাকে বলি কথাটা, সেদিনের সেই ঘটনার পর ছাদে দাঁড়িয়ে গ্রামের দিকে তাকাতে পারিনে আমি। আপনাকে আমি দেখাব, কী সুন্দর আমাদের গ্রাম। আমি দূরে তালবনের ফাঁক দিয়ে কৃষককে মাঠে যেতে দেখেছি। গাঁয়ের মেয়েরা ধান-কাটা জমিতে ঘুটে কুড়িয়েছে। নয় তো কলমি বনে নেমে তুলেছে শাক। সে সৌন্দর্য গেল কি করে? এখন গ্রামের দিকে তাকাতে পারিনে আমি। কি নোংরা, কি জঘন্য! এর জন্যে আপনারাই দায়ী, আপনারাই।'

সুলেখার কণ্ঠস্বরটা ভারী মনে হয়। ও বাঁ হাতের রুমালটার একটা কোণ মুখের মধ্যে পুরে আস্তে আস্তে চাপ দিতে থাকে।

সমাজপতি একটু ইতস্তত করবার পর বলেন, 'আপনার সংগে আমার সম্পূর্ণ মতের মিল আছে। কিন্তু সব দিকটাই দেখুন। গীতার যুগের দরিদ্রের সংগে আজকের যুগে দরিদ্রের আকাশ পাতাল তফাৎ। তখনকার দিনে একটা সামাজিক শিক্ষা ছিল, তাতে ওরা অল্পেই সন্তুষ্ট হতো। একটা পরার্থপরতা ছিলো প্রত্যেকের মধ্যে। অবশ্য সে শিক্ষা আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আপনাদের কাছে আসা।'

সমাজপতি থামলেন একটু। তারপর বললেন আবার, 'আপনাদের গ্রামের ঘটনাটাই ধরুন—'

সুলেখা বাধা দিলে, 'কিন্তু কৃষকরা কি ঠিক কথাই বলেনি? ঐ বাঁধা দামে ধান বিক্রী করে সত্যিই চলে কি করে।'

'আপনি সমস্তটা ভেবে দেখছেন না। হয়তো ওদের একটু অসুবিধের মধ্যে পড়তে হবে, কিন্তু বাধ্য হয়ে আমরা এই কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। যদি প্রকিওরমেণ্ট না হয়, তাহলে সমস্ত শহরের খাদ্যব্যবস্থা ভেঙে পড়বে! আর তখন এর চেয়ে হাজারোগুণ অশান্তির মধ্যে পড়ব আমরা। তার চেয়ে এইটে কি ভালো নয়? বেশি অশান্তির চেয়ে কম অশান্তিই ভালো।'

সুলেখা বললে, 'কিন্তু আপনারা বিদেশ থেকেও তো খাদ্য আমদানী করতে পারেন? আর করাও হয়।'

নানা-কারণে বিদেশ থেকে কোন কিছু আমদানী করা আমাদের এখন চলবে না। খাদ্য-শস্য তো নয়ই। বরঞ্চ রপ্তানি বাড়ানোই এখন আমাদের দরকার।'

সুলেখা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। মনে হয় ভেতরে ভেতরে ও খানিকটে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। তারপর অকস্মাৎ ও বলে, 'আমি হয়তো বুঝিনে, বুঝিনে আমি। কিন্তু ওরা কখনো উত্তেজিত হয়ে

উঠবে, কথা কইবে, এ আমি সইতে পারিনে। ওরা চুপ করে থাকলে, নিজের কাজ করে গেলে ওদেরও ভালো আমাদেরও ভালো। এই আমার কথাই বলি। বাড়ির চাকর চাকরানীরা একতিল যদি কাজ বন্ধ করেছে, তাহলে আমি সইতে পারিনে। আমার ইচ্ছে রাত্রেও কাজ করে ওরা। আমি জানি রাত্রে কাজ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তবু আমার ওই ইচ্ছে হয়, কি করব আমি। জানেন, আমি ওদের সংগে কথা বলিনে। আমার গান যদি ওরা শোনে আমি ওদের তাড়িয়ে দিই। ছোঃ, ওরা গান বুঝবে? ওদের জন্য নয় এসব। তার চেয়ে নিজের কাজ ওরা যদি করে, সেইটেই ভালো। আমি বড় বেশি একলা, বড় বেশি—দিন না আমায় কিছু কাজ। জানেন, আমি সারাদিন টিয়ে পাখি, কুকুরছানার সংগে কথা বলে কাটাই।'

হঠাৎ থেমে গেল সুলেখা। ওর সমস্ত শরীরটা কাঁপছে। একটা ভয়ংকর কান্নার বেগ ও থামাচ্ছে বোঝা গেল।

অসুতোষ বাবু আর সমাজপতি দুজনেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

'আপনি একটু শান্ত হোন। চুপ করুন একটু।'

একটু পরে সামলে উঠল সুলেখা। বললে, 'আমি লজ্জিত! আমার আচরণে কিছু মনে করবেন না আপনি। আমি বরঞ্চ একটু বাইরে যাই। পরে আসব।'

ওরা দুজনে বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। কথা তুললেন অসুতোষ বাবু, 'বড় বেশি একলা থেকে থেকে মা আমার অমনি হয়ে গেছে। নইলে ওর মতো মেয়ে হয় না।'

'সে আমি আলাপ করে বুঝেছি। আমিও সেই কথা বলছিলাম, একলা একলা না থাকতে দিয়ে ওঁকে কিছু কাজে লাগিয়ে দিন। শান্তি-প্রতিষ্ঠার কাজে ওঁকে দিন। আপনাদের এই অঞ্চলেই।'

অসুতোষ বাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

'সাধারণ লোক এত অল্পেতেই ক্ষেপে ওঠে কেন। একদল প্ররোচক আছে যারা সব সময় এদের ক্ষেপিয়ে নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি করতে চায়। আমাদের উচিত সাধারণ লোককে বুঝিয়ে দেওয়া যে এই সব প্ররোচকদের পাল্লায় পড়লে দেশের সমূহ ক্ষতি। আমাদের বক্তব্য তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। যে কোন উপায়ে শান্তি রক্ষা করা চাই।'

'কিন্তু তাতে কি কিছু হবে? যে-রকম ক্ষেপে আছে ওরা হয়তো আমাদের কথা শুনবে না।'

'যাদের কথা শুনে আমাদের কথা ওরা শোনে না তাদের সরাতে হবে। কিন্তু এখনই নয়। একটু একটু করে আমরা ওদের শায়েস্তা করব। মানুষ আজকাল একটু বেশি সচেতন হয়ে উঠেছে স্বীকার করতেই হবে। তাই হঠাৎ জোর প্রয়োগ করলে কিছু হবে না। কিন্তু এটা ঠিকই, ধীর এবং শান্তভাবে কাজ করলে শেষ-কালে আমরা জয়লাভ করবই।'

অতঃপর শান্তি অভিযান এবং সরকারী কার্যক্রম নিয়ে ওঁরা দুজনে আলোচনা করলেন। অসুতোষ বাবু নিজে জমিদার কাজেই জমিদারী প্রথা সম্পর্কে সরকারের মনোভাব নিয়েও আলোচনা করলেন ওরা। এ সম্বন্ধে সরকারী একটা পরিকল্পনা আছে সেটাও জেনে নেন।

পরিশেষে, সমাজপতি বলেন, 'সমস্ত কিছু ব্যাপার আজকে নতুন করে দেখতে হবে। জমিদারী কিংবা শিল্পোন্নয়ন যাই বলুন না কেন আমরা আগে যা ভেবেছি সেটা ভোলা দরকার। এর জন্যে প্রধানত দায়ী পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক অবস্থা। তাছাড়া, স্বাধীন জাতি হিসাবে আমাদের একটা দায়িত্বও রয়েছে। আমরা একঘরে হয়ে থাকতে পারিনে। তাতে আর যাই হোক না কেন আত্মঘাত হবে।'

উনি আবার বললেন, 'আসলে কি ব্যাপার জানেন। আজকের এই

সমস্যাগুলোই তো ব্রিটিশের আমলে ছিল। সেটার প্রতিকারের উপায় আমরা তখন একভাবে চিন্তা করেছি। সে-কথা দেশবাসীকে জানানোও হয়েছে। বিনা প্রতিবাদে সরল-বিশ্বাসে ওরা সেটা গ্রহণ করেছিল, কোন দিন সন্দেহ করেনি। আজকে যে ওরা এমনভাবে মাথা নাড়া দিয়ে উঠেছে, তাতে ওদের দোষ দিইনে। কারণ, একরকম দাওয়াইয়ের কথা শুনে শুনে অভ্যস্ত ওরা। আজকের অবস্থায় যে সে দাওয়াই চলবে না সেটা বুঝতে পারছে না। আমাদের মধ্যে আর ওদের মধ্যে একটা পাথর জমেছে, সেটা ভুল বোঝাবুঝি। সেইটে সরালেই সব হবে।'

'কিন্তু কী কী কারণে এই পরিবর্তন এলো বলে আপনার মনে হয়? অবিশ্যি, পরিবর্তনের প্রকৃতিটা কিছু কিছু বোঝা যায়। কিন্তু তার সমস্ত দিকটা মোটামুটি না বুঝলে—'

'নানা কারণের মধ্যে অর্থ নৈতিক-রাজনৈতিক কারণই প্রধান। আর শাখা-প্রশাখা, সমস্যা উপসমস্যা নিয়ে সে এক বিরাট ব্যাপার—' সেই বিরাট ব্যাপারের মোটামুটি কাঠামোটা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন সমাজপতি। তারপর বলেন, 'থাক, এসব কথা। এখন প্রত্যক্ষ কাজের কথা হোক। ধানগেছের অজয় রায় সেখানকার পুলিস-পোষ্টিংটা পারমানেণ্ট করবার জন্যে দরখাস্ত করেছেন। আপনার কি মনে হয়, সেটা করা দরকার? আমি তাহলে রেকমেণ্ড করব।'

আশুতোষ বাবু আপাতত তাঁদের পরস্পরের মনোমালিন্যের কথাটা ভুলতে চান। বিশেষ করে, এখন ওকথা মনে করবার কোন হেতু নেই।

কিন্তু তার জবাব দেবার আগেই সমাজপতি কথা বললেন। স্থানীয় একটা ম্যাপের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ভ্রূ কুঁচকে আছেন তিনি।

বললেন, 'আমার মনে হয় আবেদনটা মঞ্জুর করাই ভালো। তাছাড়া, তাছাড়া—' আরো একটু ঝুঁকে পড়েন তিনি ম্যাপটার ওপর, 'যতদূর মনে হয়, এই সমস্ত এলাকাটা সামলাতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে, অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হবে। সবচেয়ে কাছে বোধ হয় চন্দ্রকোণা থানা, কিন্তু অতদূর থেকে সমস্ত কিছুর ওপর নজর রাখা সম্ভব নয়। তাই ধানগাছিয়া যদি কো-অর্ডিনেশন সেণ্টার হয়, তাহলে বোধ হয় ভালোই হবে। অবস্থানের দিক দিয়ে জায়গাটা শেফ বলে মনে হচ্ছে।'

অমুতোষ বাবু সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানান। এ পরিকল্পনা অত্যন্ত ভালো।

যাবার আগে পই পই করে বললেন সমাজপতি, 'এ অঞ্চলে সমস্ত লোককে আমাদের বক্তব্য বিষয় বোঝাবার ভার আপনার ওপর। আপনি তো সমস্ত বিষয় শুনলেন, অজয় বাবু বা ওঁর মতো অন্যান্য প্রভাবশালী লোকের সংগে দেখা করুন। তাঁদেরকে বুঝিয়ে দিন অন্যকে বুঝিয়ে দিতে বলুন।'

পরিশেষে সুলেখার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেলেন, 'আপনার মেয়ের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে গেলাম। এই ধরনের চিন্তা আমরাও করেছি যে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা শান্তির, তা সবাইকেই টানে। কিন্তু তার জন্যে সাধারণ লোকদের শান্ত রাখা দরকার। তাতে লাভ উভয় দলের। আমরা একথা যেন না ভুলি।'

একুশ

নানাকারণে অজয় রায়ের মানসিক অবস্থা অতি শোচনীয় পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এতদিন তাঁর নিজের উপর একটি দৃঢ়-বিশ্বাস ছিলো সেটা প্রচণ্ডভাবে নাড়া খেয়েছে। আজকাল যেন মনে হয়, তিনি যা করেন, তা ঠিক তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী নয়। আর অবাঞ্ছিত কাজ করার একটা হীনমন্য-ভাব তো আছেই। অর্থাৎ বাধ্য হয়ে তাঁকে কোন কাজ করতে হয়, এটা কল্পনা করতেও লাগে। কোনদিন তিনি কারো কথা শোনেননি, যদি সেটা তাঁর মনঃপুত না হয়। তাঁর ঠাকুর্দা, তাঁর বাবা দুজনেই গ্রাজুয়েট, কিন্তু তিনি মাট্রিকের পর আর পড়েননি। লোকে নিন্দে করেছিলো, বাবাও বলেছিলেন, 'সে কিরে, তোরা কোথায় আমাদের ছাড়িয়ে যাবি, তা না করে পেছিয়ে পড়লি যে। লোকে কী বলবে।' জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'ছোঃ, কিসে কি হয়, সেটা ওরা কী বুঝবে!'

তাছাড়া কাজকে তিনি মনে করতেন লক্ষ্য সিদ্ধির সহায় হিসেবে। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে এগিয়ে চলো, তাতে অনেক রকম কাজ তোমায় করতে হবে। ভালোও, খারাপও। কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য যদি ভালোই হয়, আর তার প্রতি যদি তোমার আস্থা থাকে, তাহলে জানবে ছোট কাজের পাপ তোমাকে স্পর্শ করবে না। কিন্তু অনাবশ্যক ক্ষুদ্রতা, বা নিতান্ত লোভের ক্ষুদ্রতা তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না। তাঁর ধারণা, তাতে মানুষ ছোট হয়। সেই ছোট-কাজগুলি মানুষকে চেপে ধরে, তার অগ্রগতি রুদ্ধ করে।

এটা অবিশ্যি ঠিকই, যথাযথভাবে সব কাজগুলি করে যাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এদিকে ওদিকে ভুলত্রুটি ঘটবেই। কিন্তু সে ত্রুটি সামলে উঠ্‌তে কতক্ষণই বা।

কিন্তু আজকাল তাঁর মনে হয়, তাঁকে অনাবশ্যক ছোট-কাজ করতে হয়। বাধ্য করা হয় তাঁকে। আর এই চেতনাই তাঁকে কাহিল করে তুললো।

এই ধানগাছিয়াতে নব-মল্লিকের ধান লুঠ নিয়ে যে ব্যাপারটা ঘটলো তারপর প্রয়োজন বোধে একটা পুলিস ক্যাম্পের জন্যে তিনি দরখাস্ত করেছিলেন। আজকাল বলা যায় না কিছু, একদল হতভাগা কেবলই চাষাদের খুঁচিয়ে খাড়া করছে, কখন কী ঘটবে কে জানে। সে অনেক দিনের কথা। তারপর শীরিষের ঘটনা ঘটেছে, শ্যামগঞ্জের ঘটনা ঘটেছে।

তাঁর বাড়ির পাশেই, হাত পাঁচেক ব্যবধান, একটা কাছারীর মতো ছিলো। সেইটিতে পুলিস ক্যাম্প হয়েছে। তিনি যখন দরখাস্ত করেছেন, প্রধানত তাঁরই ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যখন পুলিস ক্যাম্প হয়েছে, তখন তাদের একটা ঘাঁটির বন্দোবস্ত করতেই হয়। অতএব, তাঁর কাছারীটা ছাড়া উপযুক্ত স্থান আর হয় না।

আর, শীরিষের ঘটনা ঘটার পর, ধানগাছিয়াতে এক রকম থানাই বসেছে, আর তাঁর কাছারীই হয়েছে কো-অর্ডিনেশন সেণ্টার। পুলিসের সংখ্যা বেড়েছে; হাবিলদার নয়, অফিসার এসেছেন একজন, আই-বি-রা সংবাদ আদান-প্রদান করেন। খবর আসে, সেই অনুযায়ী নির্দেশ যায়।

প্রথম প্রথম সয়ে গিয়েছিলো। হাবিলদার আর তার দুচারজন সহকর্মী এই নিয়ে ছোট্ট দলটুকু ছিল। বিশেষ কিছু চোখের ওপর ঠেকত না। কিন্তু যতই দল বড় হতে থাকে, ততই তাঁর অসহ্য

হয়ে ওঠে ব্যাপারটা। তাঁর মনে হয়, হঠাৎ তিনি বেখাপ্পা ধরনের লোকের চোখে পড়ছেন। তাঁরই প্রয়োজনে এত সশস্ত্র পুলিস তাঁকে ঘিরে রয়েছে। অতি অসহায় কোন প্রাণীর মতো নিজের চারদিকে পাহারার দেয়াল তুলে জবুথবু হয়ে আছেন তিনি। কিন্তু এমন করে থাকা তাঁর চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিরোধী।

নিরাপত্তা অবিশ্যি তিনি চান। কিন্তু সে নিরাপত্তা সবার থেকে অন্য রকম হবে কেন। কই, আর কারো বাড়িতে তো থানা বসেনি।

এই জিনিসটা অহরহ তাঁকে ক্লান্ত করে তোলে। বাইরে বেরোও তোমার সামনে ওরা খৈনি ডলছে, জানালা দিয়ে তাকাও, বন্দুকের নল পরিষ্কার করছে। বিছানায় চুপচাপ শুয়ে থাক, ওরা সিয়ারাম সিয়ারাম হাঁকছে।

এই কি তিনি চেয়েছিলেন ?

কত কল্পনা ছিলো তাঁর ছেলেবেলায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ট্রাক্টর চালিয়ে চাষ করবেন। তার জন্যে একসংগে অনেক জমি দরকার। আর, কাজেও তিনি সেই দিকে এগোচ্ছিলেন। নিজের গ্রামে অনেক জমি কিনেছেন তিনি, বেশি দামও দিতে কুণ্ঠিত হননি।

তাঁর পরিকল্পনা ছিলো, দেশ থেকে ম্যালেরিয়া দূর করবেন। ইস্কুলে প্রবন্ধ লিখে পুরস্কার পেয়েছিলেন, তার এক জায়গায় ছিলো, 'সপ্তাহে একদিন গ্রামের সমস্ত বালক-বালিকা যুবক-যুবতী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মিলিয়া ম্যালেরিয়া বিতাড়ন করিব। কচুরীপানা ধ্বংস করিব, খানা ডোবা ভরাট, করিব—' গ্রামের লোকেরা সুস্থ সবল হবে, প্রত্যেকের ঘরে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থাকবে, এই তিনি কল্পনা করতেন। তিনি অনেক জমির মালিক যখন হবেন, তখন প্রজা বসাবেন না, তাতে মানুষকে অধীন করা হয়। তার চেয়ে মজুরী দেবেন তাদের।

আর তাদের 'বোনাস' দেবেন। খবরের কাগজে লণ্ডনের কোন এক কোম্পানীর বোনাস দেওয়া ব্যাপারে একদিন ফলাও করে লেখা হয়েছিলো। তিনি পড়ে বলেছিলেন, 'বাঃ, বেশ তো!'
অর্থাৎ নিজের শুধু নয়, সংগে সংগে দেশেরও উন্নতি করবেন। আর এটাতো তাঁর বিশ্বাস, একদিন তাঁর দেখাদেখি সবাই সে আদর্শ গ্রহণ করবে। ফলে ভারতবর্ষ সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হবে।
কিন্তু সে আশা গেল কোথায়? প্রথম প্রথম বেশ চলছিল। কিন্তু তারপরে কোথায় যেন ভাঁটা পড়ে। যতই তাঁর জমির পরিমাণ বাড়ে, তখন সেগুলোকে রক্ষা করবার জন্তে তাকে আরো সাবধান হতে হয়। শেষ পর্যন্ত পুলিস পাহারার মধ্যে তাঁকে থাকতে হয়েছে।
তাহলে কাজ হয় কিছু? চব্বিশ ঘণ্টাই যদি তুমি ভয়ে ভয়ে কাটালে কাজ করবে কী করে। না, কোনো ভবিষ্যৎ নেই তাঁর। সমস্ত জীবনের কল্পনা তাঁর ব্যর্থ হল।

এক-একবার মনে হয়েছে, ওই সব ক্যাম্প-ফ্যাম্প তুলে দেন। তাতে যা হয় হবে। দরকার তো ছিলো কেবলমাত্র তাঁর ধানের গোলা সামলানো নিয়ে। তা যদি লুঠ হয় তো হোক। কিন্তু এমনি এক পরিবেশের মধ্যে থাকা, এ অসহ্য।
তাছাড়া, যে কোন দিন কাজে আসবে সে তো মনে হয় না। যা শোনা যায়, সেটা সত্যি হলে, ওদের সাহসের দৌড় তো খুবই। দিনে-দুপুরেই নাক ডাকিয়ে দেয় ওরা, রাত্রে মেয়েরা এসে বঁটি দিয়ে গলা কেটে দিলে তারপর হয়তো বলবে, 'কোই হায়?'
হরিকে একবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কথাটা বলেছিলেন। হরি শুনেই পান-চিবানো জিব বের করে মাথা নেড়ে বলেছিলো, 'তাও কি হয়!

আজকালের ব্যাপার বাবাজী, লোক থরথর করে কাঁপছে কখন কি হয়, কখন কি হয়। আর ঐ সময় আপনার মাথায় এই কথা ঢুকল কি করে। তবে, ঐ যে বললেন, অদিকে দিয়ে কাজ হয় না কিছু সে কথা আলাদা। তবু, কাজ অদিকে দিয়ে করিয়ে নিতে হয়। তারও দাওয়াই আছে। দাওয়াই সবেরই আছে, বাবাজী, কেবল জানতে হয়—'

সে দাওয়াই একদিন প্রয়োগ করল হরি নিজেই। পুলিস অফিসারের হাতে মালতী মেয়েটাকে ঘুষ দিয়ে।

মালতী যেদিন হরিকে এসে বললে, 'আমাকে একটা ঝি-গিরি দেন। রজগার আর হচ্ছেনি। না খেয়ে আছি—' সেদিন হরি বিশ্বাসই করতে পারেনি। আর কেউ হলে আত্মহারা হত, কিন্তু হরি, তৎক্ষণাৎ ওকে এনে অজয়ের বাড়িতে লাগিয়ে দিলে। বললে, 'বাবাজী, মেয়েটাকে রেখে দিলম। হাতে-পায়ে ধরে কান্নাকাঠি করলে, খেতে পাচ্ছেনি—'

'কিন্তু ঝি আর আমাদের কি হবে? কুল-বৌ (তাঁর সম্পর্কীয় ভাতৃবধূ) আর মণি (তাঁর ভাগনী) তো রয়েছে—' তিনি সমস্ত ব্যাপারটা বুঝলেন। কিন্তু হরির ব্যক্তিগত লোভের তদারকি করায় তাঁর তখন মন ছিল না, এক সময় যদিও একটু নজর রাখছিলেন।

হরি বলল, 'তা কি করে হয়, আজকাল কাজ বেড়েছেনি? অরা জুটিতে পারবে কি করে?'

হরিকে বুঝতে বাকী ছিল তখনও। ও আরো এক কড়া চাল চাললে। সেদিন থানা থেকে অফিসার-ইন-চার্জ এসেছেন তদারক করতে। চা খেতে খেতে হরির সংগে গল্প করছেন। এমন সময়, মালতী জল আনতে যাচ্ছিলো মোনা-দিঘিতে, হরি ডেকে বললে, 'কেটলীটা নিয়ে যাও তো মালতী।'

মালতী আসতেই বললে, 'এই ইনি আজ সারা দিনরাত এখানে থাকবেন। যখন যা দরকার হবে, দিয়ে যাবে তুমি। চা, খাবার সময় .ভাত—বুঝলে?' অফিসারটিকে বলেন, 'খুব ভালো মেয়ে, আলাপ করে আপনি দেখবেন। লেখাপড়া জানে একটু একটু, গরীব বলে তাই ঝি-গিরি করছে।'

এই জঘন্য নীচতাকে অজয় নিজের বলেই মনে করেন। আজকাল তাঁর চিন্তা এমনই হয়েছে, তাঁর কাজ বা তাঁর সংক্রান্ত কোন কিছুর জন্য যে যাই করুক না কেন তার দায়িত্ব তিনি নিজে অনুভব করেন। তিনি ভেবেই পান না, চারদিকে এত অকর্তব্য-বোধ এলো কি করে। এই ঘুস না পেলে তোরা কি কাজ করতে পারতিস নে? ছিঃ ছিঃ!

কিন্তু ক্রমশ তিনি অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। তাঁর আর গায়েই লাগে না যে, অফিসারই আসুক তার ওপরওয়ালাই আসুক, মালতীকে চা দিয়ে আসতে হয়, ভাত দিয়ে আসতে হয়। কিন্তু সাধারণ পুলিস-গুলোর অবস্থা দেখে হাসেন উনি। ওরা টেরচা করে তাকায়, কিন্তু যেখানে বড় বড় ওপরওয়ালাদের ব্যাপার, সেখানে মাথা গলায় কী করে? কিন্তু কখনো যদি সুযোগ পায় কথা বলবার দিন উজাড় করে দেয়। আর আশ্চর্য, মালতী ওদের সংগেই কথা বলে বেশি, প্রাণ খুলে আলাপ করে।

একটি পুলিস কিন্তু একদিন বেসামাল হল। মালতী জল আনতে বেরিয়ে গেছে, ও বললে, 'দাঁড়া ভাই, একটু পায়খানা ফিরে আসি' বলে জোর পায়ে এগিয়ে একটা তালগাছের তলায় ধরল মালতীর হাত। মালতী কি করত বলা যায় না, কিন্তু কয়েকজন চাষা দেখতে পেয়ে হৈ হৈ করে উঠল। বেটা সিপাইটাকে ধরে মার লাগাতে লাগাতে টেনে নিয়ে এলো ওদের ঘাঁটিতে। 'বিচার চাই।'

গায়ের বৌ-ঝিরা তাহলে থাকবে কি করে? শুধু এইটেই নয়, আরো অভিযোগ ওদের আছে। মাঝে মাঝে পুলিসগুলো এখানে-ওখানে উঁকিঝুঁকি মারে, সেটা কী আর ওরা দেখেনি।

অতএব, বিচার হল। তার আগে অনুতোষ-বাবু পুলিসের আচরণের নিন্দে করে চিঠি পাঠালেন। পুলিসটির শাস্তি হল কারাবাস।

কিন্তু ওর সহকর্মীরা খেপে গেল। ওরা নিম্নপদস্থ বলে তাদের বেলাতেই যত শাস্তি। গুমরে গুমরে ছিলো তারা। তারপর একদিন ঘটনা একটা ঘটালে।

তখন কোন অফিসার ছিলেন না, অজয় বাইরে কোথায় গিয়েছেন, পাশাপাশি হতভাগা চাষার দলও নেই। শুধু মালতীকে নয়, ফুল-বৌ আর মণিকে নিয়ে কাছারী ঘরে ঢুকে ওরা দরজা বন্ধ করে দিলে। ওরা তিনজনে স্নান করতে যাচ্ছিল।

অজয় প্রথম দিন গুম হয়ে বসে রইলেন। দ্বিতীয় দিন কাঁদলেন (এই প্রথম)। তৃতীয় দিন সদরে, আর প্রাদেশিক দপ্তরে দরখাস্ত পাঠালেন, 'ক্যাম্প উঠিয়ে নিন। আমার আর দরকার নেই। এর পর ক্যাম্প আমার এলাকায় রাখা সম্ভব হবে না।' আসল কারণটা উহ্য রেখেছিলেন, সেটাতো তাঁর মান-অপমানের প্রশ্ন। কিন্তু সরকারী কাজে আইন আছে, মান-অপমানের প্রশ্ন নেই। জবাব এল, 'দরখাস্তে দাবীর অনুকূলে যথেষ্ট যুক্তি দেখানো হয়নি।'

এদিকে সেই অঞ্চলটার সমস্ত জোতদার-মহাজন মায় অনুতোষবাবু পর্যন্ত হাঁ হাঁ করে উঠলেন।

'সে কী করে হয়। সমস্ত অঞ্চলটার নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র হচ্ছে ওটা। সমস্তটার শান্তি এখানে ওটা থাকা না থাকার ওপর নির্ভর করে।'

অতএব...।

বাইশ

মালতীর এই অদ্ভুত আত্ম-সমর্পণের খবর সে নিজে জানতো, আর জানতো তারা যাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু কারণ এটা কি সেটা সে নিজে ছাড়া কেউ জানে না। জানবার চেষ্টাও করেনি। হরি অবিশ্যি তার স্বভাবসুলভ ভংগিতে বলেছিলো নিজে নিজে, 'ও আমি জানতম। মেয়ে-মানুষ, প্রথমটা অমন না-না করবেই, তারপর ধরা দিতেই হবে।'

মিনতি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেনি। অবিশ্যি সে কেবলমাত্র জানতো যে, মালতী চাকরী করতে গিয়েছে। কিন্তু কারণটা যে কী তা সে জানত না। সে বলেছিল, 'আর চলছেনি ভাই, টাকাকড়ি না হলে খেতে পাবনি।' কিন্তু সেটা কী সত্যি? মালতীকে দেখবার মতো কেউ ছিল না, তাতে সে একদিনের জন্যেও দুঃখ করেনি। ও নিজের ভার নিজেই বয়েছে। তার রোজগারের প্রধান পথ ছিল সেলাই আর বোনা। মফঃস্বলে অবিশ্যি এদুটোতে বিশেষ পয়সা আসার সম্ভাবনা খুবই কম, তবু ওতেই কোন রকমে চলে যেতো। তাছাড়া মুড়ি ভাজতো সে, কিন্তু কোনদিন মোট মাথায় করেনি। বলতো, 'উটি আমি পারবনি।'

মালতীর এই স্বাবলম্বিতা বরঞ্চ মিনতির ভালোই লেগেছে। মিনতির ধারণা পুরুষের গলগ্রহ হয়ে থাকার কোন অর্থ নেই। পুরুষের থেকে মেয়েরা ভালোবাসা চায়, কিন্তু সে ভালোবাসা তো তাদের গলায় ঝুলে থাকলে পাওয়া যায় না। ওর ধারণা, দুপক্ষের কোন দিক

দিয়ে কেউ যদি ছোট হয়ে যায়, তাহলে, ভালবাসা সম্ভব নয়! অবিশ্যি একমাত্র নিজেকে ভরণ-পোষণ করতে পারলেই যে মেয়েরা বড় হয়ে গেল, তার কোন মানে নেই। সব দিক দিয়ে মানুষকে সৎ হতে হবে। তার জীবনের কোথাও যেন কোন গলদ না থাকে। সে তার স্বামীকে এক জীবিকা ছেড়ে আর এক জীবিকা গ্রহণ করতে অনেকবারই বাধ্য করেছে। ঠিক এই জন্যেই। এ নিয়ে লোকে তাকে কত নিন্দা করেছে, কিন্তু কিছুতেই সে নিজের মত বদলায়নি।

সে যাই হোক, মালতীর এই হঠাৎ অন্তর্ধানের কোন হদিশ সে পাচ্ছে না। মালতী চলে যাবার পর সে বুঝলে, ওর সংগে যে কদিনেরই আলাপ হোক না কেন, মনের দিক দিয়ে অনেকখানি কাছে চলে এসেছে ওরা। দুজনের ভালো লেগেছে দুজনকে। ভালোবেসে ফেলেছে। কিন্তু কেন ও চলে গেল?

কদিন থেকে ওর মন ভালো নেই মিনতি বুঝতে পেরেছিলো। সেদিন রাত্রে মালতীর কান্না দেখেই বুঝেছিলো সে, ওর ভেতরে একটা নিদারুণ আঘাতের বেদনা রয়েছে। মিনতি জান্‌তে চেয়েছিলো কিন্তু জানায়নি। নিজের দুঃখের কথা কোনদিন বলেনি ওকে। অবিশ্যি, নিজের দুঃখের কথা বলাটাই বা কেমন, তাতে কেমন যেন হীনতা থাকে। তাই, ওর নিকট-বন্ধুর সমস্ত কথা জানতে পারতো না বলে ব্যথা একটা থাকতই, কিন্তু মালতীর ঐ গুণটিও ওকে ভাল লাগত।

মালতী যে চলে গেল, তাতে মিনতির দুঃখ হয়েছে কিন্তু একটা দিক দিয়ে বলও সে পেয়েছে। সে এখানকার লোকগুলির আত্মিক দৈন্যে ব্যথা পায়, অস্থির হয়ে ওঠে। তারপর অতিষ্ঠ হয়। মনে করে চলে যাবে। এখান থেকে চলে যাবে। কিন্তু যাবেই বা কোথায়? সেখানে যদি তাই হয়?

কিন্তু মালতীর একই অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সে কেমন করে টিকে আছে? আর, মালতী যদি টিকে থাকতে পারে, তাহলে সেই বা পারবে না কেন?

অবিশ্যি, মালতীর থেকে তার অভিজ্ঞতা আরও ব্যাপক। মালতীকে ওরা শুধু লোভের বস্তু করে দেখেছে, সব পুরুষই সব মেয়েকে ঐ ভাবে দেখে কিন্তু আরো অজস্র দিকে এই নীচতা সে দেখেছে। এক একবার সে এতই বিচলিত হয়ে পড়েছে যে, তার মনে হয়েছে সে শ্বাসবন্ধ হয়ে মারা যাবে।

কিন্তু আজ তার মনে হয়, যেন সে টিকতে পারবে। পারবে হয়তো। কতবার সে বলেছে মনে মনে, 'ওরা যদি ছোট হয়, তাতে আমার কি? আমি যদি ঠিক থাকি তাহলেই সব হবে। হে ভগবান, তুমি আমাকে সমস্ত নীচতার ঊর্ধ্বে ঠিক থাকবার শক্তি দাও। আমি যেন ওদের ঘৃণা না করি। ওদেরকে ছোট বলে তুচ্ছ না করি। আমি যেন বিশ্বাস করতে পারি যে, ওরা একদিন ভালো হয়ে উঠবে। হে ভগবান তুমি শক্তি দাও।'

কিন্তু কোন অসতর্ক মুহূর্তে নিজেকে হারিয়ে ফেলে সে। এই সেদিন-কার কথাটাই ধরা যাক। বেশ গান গাইছিলো সে, হঠাৎ ছেলেগুলো বিব্রত করলো ওকে। কিন্তু সে ভেবে দেখল না যে, ওদের কি দোষ। ওরা কি জানে। যেমন ওরা শিক্ষা পেয়েছে, তেমনই আচরণ করবে। কিন্তু ওদের ঘৃণা করে নিজেই ছোট হয়ে গেল সে। নিজেই হীন হয়ে গেল।

তা হলে? তাহলে কী করবে সে? প্রাণপণ চেষ্টা করে ওদের ভালোবাসতে। শত ত্রুটি সত্ত্বেও ও যেন বিচলিত না হয়।

আরো একটি জিনিস সম্বন্ধে তার মত বদলায়। মেয়েদের রোজগার সম্বন্ধে। সে প্রথমে বিশ্বাস করত, স্বামী-স্ত্রীর দুজনেরই সংসার বঁধন,

তখন তুজনকেই তার ভার নিতে হবে। তাই, সে মালতীর কাছে সেলাই বোনা শেখা শুরু করে দিয়েছিলো। কিন্তু বাধা দিলেন তার স্বামী। বললে, 'এসো কাজ বদল করে নিই। তুমি বরঞ্চ আমার পাঠশালাই চালাও, সে বিদ্যেতো তোমার আছে। আর আমি ঘর-কন্না করি।'
'অমন কথা বলছ কেন। ঘরে তুটো পয়সা আসে, সেটা কী তুমি চাওনা?'
'বাঃ, পয়সা চাইব না কেন। কিন্তু তুমি যে ভাববে, আর একজনের সাহায্য নিলে নিজে ছোট হয়ে যায়, এটা মানিনে। সেই ভেবেই তো তুমি কাজ করছ। আমিও আজ থেকে তাহলে প্রতিজ্ঞা করি, তুমি যদি রেঁধে দাও আমি খাব না। চাষী যদি ধান বোনে আমি তৈরী করব না—'
একটু কাছে এসে বললেন, 'লক্ষীটি ভেবে দেখ তুমি, এই করে কি মেয়েদের সম্মান বজায় থাকে? দেখ, কলকাতায় আমি অজস্র মেয়েকে রোজগার করতে দেখেছি। কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত জীবন দেখো, আমাদের গেরস্থ ঘরের মেয়ের থেকে তারা কি বেশি সম্মান পেয়েছে লোকের কাছে? তারা কি বেশি সুখী। বরঞ্চ অনেকক্ষেত্রেই তাদের সম্মান আরো নষ্ট হয়েছে। কেন এমন হয় আমি ঠিক বলতে পারব না তোমায়, কিন্তু হয় এমনই। হয়তো এটা আমাদের সমাজের দোষ, আমাদের ঐতিহ্যের দোষ। হাজার হাজার বৎসর এই অবস্থা চলে এসেছে বলে তার বাইরে যেতে পারিনে।'
মিনতি কথাটা মেনে নিয়েছে। অবিশ্যি সেলাই বোনা সে ছাড়েনি, কিন্তু আগে যে উদ্দেশ্য নিয়ে সে করত, সেটা নেই।

একদিনের একটি ঘটনায় তার জীবনের মোড় ফিরে যায়। আমাকে সে অস্থির হয়ে ওঠে। এতদিন সে পথ পাচ্ছিল না, কী করে

সে হীনতা থেকে নিজেকে বাঁচাবে, কী করে মানুষের ওপর বিশ্বাস সে হারাবে না। একটি মাত্র ঘটনায় সেটায় সন্ধান সে পায়। অবশ্য ভেতরে ভেতরে নিশ্চয়ই সে তৈরী হয়েছিল, এগিয়ে এসেছিলো এদিকে, তা না হলে এমনটি হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, কত ঘটনাই তো ঘটে, তার মধ্যে একটি বিশেষ ঘটনাই বা কেন পথের সন্ধান দিতে পারে ?

সে বুঝতে পারে, এই যে মানুষ এত ছোট হয়ে রয়েছে, তার জন্তে তাদের দোষ নেই। পারিপার্শ্বিক অবস্থাই তার জন্তে দায়ী। ঐ ছোট ছোট ছেলেগুলির কথা তার মনে পড়ে। তারা তো যা দেখে তাই শেখে। তাই, যদি সত্যিকারের ভালো চাওয়া হয়, তাহলে ওদেরকে বদলাতে হবে। ওদের সামনে ভালোটা তুলে ধরো, তাহলে দেখবে ওরা ভালো হচ্ছে। যে অমৃতের স্বাদ পায়নি, তাকে কী করে সে সম্বন্ধে বোঝানো যায় ? হ্যাঁ, মিনতি নিজে ওদের মধ্যে কাজ করবে, ওদেরকে মানুষ করে তুলবে। কারণ ওদের থেকে সরে থাকলে ওরা তো ভালো হবেই না, উপরন্তু যারা ভালো তাদের টেনে নামাবে। আর সে অভিজ্ঞতা তো মিনতির আছে।

অবিশ্যি, হয়তো ধুলো-কাদা হাতে লাগবে। কিন্তু তাছাড়া উপায় নেই। আবর্জনা পরিষ্কার করতে হলে তা তোমাকে করতেই হবে। আর যে আনন্দ তুমি পাবে, তাতে ঐ ধুলোই তোমার আভরণ হয়ে উঠবে। অর্থাৎ, ওদেরকে যদি তুমি না বদলাও, তাহলে, পাবে না তুমি সার্থকতা। সত্যোপলব্ধি তোমার হবে না। তুমি ছোট হয়ে যাবে।

যে ঘটনায় ওর এতখানি মানসিক পরিবর্তন হল, সেটা হলো এই :

সেদিন মাঘ মাসের সকাল বেলা। ওর স্বামী সেদিন কোথায় [illegible]।

টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। গতকাল রাত্রে বৃষ্টি হয়ে পথ অতি পিচ্ছল। ও সেই পথের দিকে তাকিয়ে গুনগুন করে গাইছিল। 'ওহে সুন্দর, মরি মরি—' ওর ডান হাতটা দরজার ওপর। বাঁহাতটা শাড়ির তলায় ঢাকা পড়েছে। এই কদিন ওর কী হয়েছে জানিনে, কিন্তু কেবলই ও-দুটো গান গাইছে, 'ওহে সুন্দর মরি মরি' এবং 'এই লভিনু সংগ তব সুন্দর হে সুন্দর।'

হঠাৎ একটা শব্দ হতে ফিরে দেখে, নবীন পড়ে গেছে সামনের নালাটা পেরোতে গিয়ে।

ওদের বাড়ির পাশের নালাটা জলে ভরে গিয়েছিল।

নবীনের মায়ের অসুখ বেড়েছে। ডাক্তারকে বাড়িতে এনে দেখাবার সাধ্য নেই। তাই এই দুর্যোগেও ওকে নিয়ে ডাক্তারখানায় যেতে হচ্ছে। মা আগে পড়েছে, জলে হাবুডুবু খাচ্ছে। নবীনের চোখ ছিল মিনতির ওপর, হঠাৎ মা পড়ে যাওয়ায় বেসাবধানে এলো-পাথড়ি বাঁচাতে গিয়ে নিজেও পড়েছে।

'আহা, আহা—' বলে মিনতি ছুটে গিয়ে বুড়ীকে তোলে। নবীনের সাহায্য নিয়ে ওকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে আসে। কাপড় বদলে ওর স্বামীর একটা ধুতি পরতে দেয়।

নবীনের অবস্থা বর্ণনাতীত। এই মিনতিকে কতদিন শীষ মেরে ইংগিত করেছে ও। পাজামা-সার্ট পরে সিগ্রেট টানতে টানতে ওর বাড়ির পাশ দিয়ে চোখ মেরে গেছে। আজ সেই মিনতির সামনে ওর এই দুর্দশা। ও যেন রক্তহীন হয়ে গেছে। ওর সমস্ত প্রাণশক্তি শুষে নিয়ে কেউ যেন কাঠ করে দিয়েছে ও'কে। তাই মিনতি যদি মায়ের ডান হাতটা তুলে ধরতে বলে, ও বাঁ পাটা টিপতে শুরু করে; কাপড়টা নিংড়োতে বললে, চুল নিংড়ে দেয়।

আর মিনতির আচরণও আশ্চর্য। নবীনের মুখ দেখলে ও ঘৃণায়

মরে যেত একদিন, কিন্তু আজকে ওর মুখ একটি মৃদু হাসিতে ভরে গেছে। এত অসহায় ওরা? ওদের ওপর করুণা হয়।

সারাদিন মালতী চুপ করে ঠায় বসে রইল। রান্না-বান্নাটা কোন-রকমে সেরে।

কেন জানি না, ওর মনে পড়তে লাগল কেবলই পাড়ার ছোট-ছোট ছেলেগুলির কথা। দুএকটি ছোট ছোট ঘটনাও মনে পড়ে সেই সংগে।

মালতীর সংগে তখন প্রথম আলাপ। সে জিজ্ঞেস করলে 'তোমার নামটি কি ভাই।'

'মিনতি'

একটি ছেলে চটপট বানান করে ফেললে, 'মিনতি, ম'এ হ্রস্বই, দন্ত্য ন ত'এ হ্রস্বই—মিনতি।' বলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কেন জানি না, সেই কথাটা এখন বারবার করে ওর মনে পড়তে থাকে।

আর একদিন একটি ছোট্ট মেয়ে এসে অনেকক্ষণ ধরে ওর সংগে কাটালে। ওর চুল বাঁধা দেখলে অতি আগ্রহের সংগে। তারপর বললে, 'তুমি খুব সুন্দর।'

মিনতি নিশ্বাস নিয়ে বুক ভরিয়ে ফেলে।

'ওরে, তোরা কত সুন্দর তাত জানিস নে। তোরা যে কতো সুন্দর সে তোরা জানিস নে। তোরা যে সুন্দর দেখতে চাস সে সুন্দর আমি তোদের দেখাব।'

যে মেয়েটি একদিন তার সংগে সুর মেলাতে গিয়ে বিব্রত করেছিলো, তাকেই প্রথম ও শেখাতে আরম্ভ করল, 'এই লভিনু সংগ তব, সুন্দর হে সুন্দর—'

তেইশ

লখীন্দর বিছানা থেকে উঠে বসল মাসখানেক পরে। চলা-ফেরা করতে দুমাস লাগল, মাঠে যেতে আরো একমাস।

কবিরাজ বলছেন, কোন-রকম চিন্তা করবে না লখীন্দর। তাহলে আবার তুমি ঘুরে পড়বে।'

তাই লখীন্দর কোনোরকম চিন্তা করে না। ও শুধু চুপচাপ বসে থাকে। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক তো অলস থাকতে পারে না, তাই ক্রমশ চিন্তার স্রোত মাথার মধ্যে ঢুকতে শুরু করে। আর সেটাকে ঠেকানোর জন্যে ছেলে-মেয়ে নিয়ে গল্প করতে বসে।

মাথায় যখন তার অসহ্য যন্ত্রণা হত, তখন তো নয়ই, যখন সেই যন্ত্রণাটা বন্ধ হল, তখনও কিছু দিনের জন্যে কোন চিন্তা ছিল না লখীন্দরের। সে কেমন একটা ফাঁকা ফাঁকা ভাব, ঘটনার পারম্পর্য হারিয়ে একাকার হয়ে যেতো। তার মস্তিষ্ক এতই দুর্বল ছিলো, যে কোনো কিছু সম্বন্ধে ধারণা করতে অনেক সময় লাগত। হয়তো টুকি জায়গা করে তার জন্যে উঠোনে দিয়েছে ভাত, আর কলমি শাক ভাজা একটু, তার সংগে লাউ-ডাঁটার ঝোল। 'বাবা ভাত খাবে এস।' বলার পর টুকির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকবে লখীন্দর, তারপর বুঝতে পারবে যে তাকে ভাত খেতে ডাকা হয়েছে। ভাত খেতে খেতে হয়তো সামনের দিকে পেঁপে গাছটার দিকে তাকায় লখীন্দর। একটা কাঠ বিড়ালী এডালে-ওডালে ঘোরাফেরা করছে। সেই দেখতে গিয়ে বাকি সব ভুলে যায় সে,

তারপর কাঠবিড়ালীকেও ভুলে যায়। টুকি অকিঞ্চি তাড়া লাগায়, 'বাবা, খাওগো। মাছি বসে গেল।'

'হ্যাঁ মা, খাই।'

একটু একটু করে ওর বল ফিরে আসে। আর সেই সংগে মস্তিষ্কের শক্তিও বাড়ে। এখন আর ভাত খেতে ডাকলে বুঝতে দেরী হয় না, বরঞ্চ ভাতের আশায় বসে থাকে ও। 'মা টুকি গো, রান্না হল?' ও ভাত খায়, আর কাঠ বিড়ালীটাকে দেখে। পেঁপে গাছ থেকে নেমে ওটা পাশের করঞ্জা গাছে উঠল, একটা কাক উড়ে গেল করঞ্জা গাছটার থেকে, তারপর সামনের আলু জমির বেড়াটায় গিয়ে বসে। সেই বেড়াটার ধার দিয়ে একটা ছাগল মাঠের দিকে যায়, কালোতে সাদাতে ছোপ-ছোপ ওটার রঙ, গায়ের রঙ লাগচে। ওরা বেশ সুখে আছে।

মাঠের রঙ তখন জষ্টির রোদ্দুরে তামাটে। বেশিক্ষণ তাকানো যায় না, কেমন মাথা ঘুরে যায়। তারপর আজকাল কি মাঠে লোকজন যায় না? গোরুবাছুর কই?

'মা টুকি, হাত ধুবার জল দেগো—'

'দিই বাবা, অতি দূর থেকে যেন ওর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। নিস্তব্ধ দুপুরের মধ্যে ওর কণ্ঠস্বরটা অতি একাকী বলে মনে হয়।

ও জিগ্যেস করে, 'হ্যাঁরে, তোরা মাঠে-ঘাটে আর যাউনি না কি? গোবর কুড়াতে যাউনি, কি গরুবাছুর লাড়তে?'

'কেনে, যাবনি বাবা, যাইত।'

'তবে দেখ দিকিন, মাঠে একটা জনপ্রাণী নেই কেনে? একটা গোরু-বাছুরও নাই।'

'কি রোদটা হইচে দেখছনি? এই রোদে আবার কেউ বেরায়। মরে যাবে যে। বিকাল বেলা আমরা যাই।'

'কই, তাওত দেখিনি। ওরা কখন যাই?'

'হ্যাঁ গো বাবা, বিকালে যাই। দেখবে তুমি।'

অতএব বিকেলে ডান হাতে একটা লাঠি, আর মাথায় লাল গামছা ফেলে লখীন্দর উঠোন থেকে বাইরে নামে, সেখান থেকে সীমানার বেড়া পেরিয়ে সামনের চটিটার একটা অশথ গাছের তলায় বসে মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সূর্য অস্ত যেতে দেরী নেই আর বেশি। দূরে পদ্ম-দিঘীর পাড়ের নিচে যে সাদা জমিটা আছে, সেটা চকচক্ করে উঠেছে। এক ঝাঁক পাখি দূর থেকে উড়তে উড়তে লখীন্দরের মাথার উপর দিয়ে কোথায় চলে গেল।

পুরণো দিনের কথা লখীন্দরের মনে পড়ে। এই মাঠ এমনি সময় একদিন গমগম করত। কত লোক যাতায়াত করত। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে এ গাঁ থেকে অন্য গাঁয়ে আসত যেত লোকজন। কত গোরু-বাছুর হাম্বা-হাম্বা করেই মাতিয়ে রাখত।

লখীন্দর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। 'গাঁটা খাঁ-খাঁ করছে।

কেমন একধরনের নিঃসংগতা বোধ করে লখীন্দর। যেমন ওর বুকটা কেউ চেপে ধরে আছে। যেমন কেউ পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে নিয়েছে। স্বপ্নে যেমন হয়, কেবলই নিচে পড়ে যাচ্ছে যেন, কেবলই নিচে।

এই অস্বস্তিটুকু দূর করবার জন্যে টুকি আর অধীরকে ডাকে ও।

'বিনন্দরাখালের গল্প জান? শুন তবে।'

অতি দুঃখিনীর ছেলে বিনন্দ রাখাল। লক্ষ্মীর পূজো করে অন্ন অবস্থা ভাল হল। শ্মশান-মশান সব ভেঙে চাষ করল সে।

লক্ষ্মীর প্রতি ভক্তি থাকার জন্তে যেখানে সে ধান বোনে সেখানে ধান লাফিয়ে ওঠে। শেষে রাজা হয়ে গেল সে।
বিরাট রাজা তাকে শেষ পর্যন্ত অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্তা দিয়ে আপ্যায়িত করলেন। বুঝলে বাবা, লক্ষ্মীর উপর ভক্তি রাখতে হয়, তাহলে সব হয়।
'আর একটা বল, বাবা—'
'আচ্ছা। বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্প জান? শুন তবে—'
এক সময় লখীন্দরের ভালো লাগে না আর। ওরা যতই জেদা-জেদি করে ও ততই বলে 'কাল আবার বলব—' শেষকালে ধমক লাগায়। কিন্তু পরের দিন ওরা যখন আবার বলে, তখন ওর আর বলতে ইচ্ছে করে না। কি হবে এসব বলে।
এক সময় ছেলেগুলোকে পাশে বসিয়ে কোলে শুইয়ে কত আরাম পেত সে। কিন্তু এখন ওরা পাশে এসে যদি আগডুম-বাগডুম করেছে, কী চোঁচামেচি করেছে একটু ও ধমকে উঠবে, 'যা, বিছানায় শুগে যা—'

এই সময় লখীন্দরের ওপর সরকারের নতুন নির্দেশ এল। অন্ত-রীণ অবস্থায় প্রত্যেককে হপ্তায় একবার করে থানায় হাজিরা দিয়ে আসতে হয়। লখীন্দরের কঠিন অসুখের কথা বিবেচনা করে সরকার এতদিন ওকে রেহাই দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন তো সে চলাফেরা করতে পারে, অতএব তাকে হাজিরা দিতেই হবে।
যদিও তার শরীর এখনও খুব দুর্বল, তবুও বাধ্য হয়েই থানায় যায়। ওদের গ্রাম থেকে থানা কমসে কম মাইল ছয়েক হবেই। তাই প্রথম দুবার ও পাল্কীতে করে যায়, তৃতীয় বারে হেঁটে।

অতি ভোরে তখনও কাক-কোকিল 'বার' দেয়নি সেই সময় বেরিয়ে গেল ও। গামছা আছে দরকার হলে ভিজিয়ে মাথায় দেবে। ছাতাও আছে সংগে। অক্কো তার অনেক পরে বেরোল হাঁজিয়া দিয়ে চলে এলো সংগে সংগে। কিন্তু লখীন্দর দুপুরটা কাটাল ওখানে, তারপর বিকেলে রোদ্দুরের তেজ কমতে আবার রওনা হল।

অনেকের ওপরেই অন্তরীণ আদেশ আছে দেখা গেল। আবার একই দিনে সবাইয়ের হাজিরা দেবার নির্দেশ নেই, বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন লোক আসে। কিন্তু ঝাঁকরার ডাঃ সোমনাথ আর দোকানী মনোহর সিংএর ওপর কেন এই আদেশ হল তা বোঝা যায় না। অতি নিরীহ মানুষ ওরা, কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই। অবিশ্যি, হিসেব করলে সবাই তো প্রায় নিরীহ মানুষ, গেলবারের গোলমালের সময় ওদের কারো কোন সুযোগ ছিল না। শুধু সরকার সন্দেহ করে এই আদেশ দিয়েছেন।

কারো কারো সংগে কথা হল। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ওদের মধ্যে সৌহার্দ্য ছিল কেমন একটা। দেখলেই গলাগলি করবার অবস্থা। কিন্তু এখন অতি সাবধানে, সন্তর্পণে কথা বলে সব।

'জান লখীন্দর, একটি লোক বাকি নাই এই দশখানা গাঁয়ে। কোনরকম শাস্তি প্রত্যেকেই পেয়েছে। যারা অন্তরীণ হয়নি, তারা ধরা পড়েছে। এদের সংখ্যাই বেশি। আর এদের অবস্থাই সব চেয়ে খারাপ। পনেরো দিন ছাড়া ওদের ঘাটাল-মেদিনীপুর ছুটতে হয়, পাঁচ মাস হয়ে গেল ওদের এখনো মামলা রুজু হয়নি। যেতে আসতে টাকার শ্রাদ্ধ হচ্ছে; ঢেঁকি বিক্রী পর্যন্ত করছে কেউ কেউ। দেশটা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।'

লখীন্দর বাড়ি ফেরে। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। কোক

রকমে উঠোনে বসে, একঘটি জল খায়। মাথাটা দপদপ করছে। দেখ, আবার কি হয়।
লখীন্দরের হঠাৎ মনে হয়, ও আর বাঁচবে না। আর, তাওতো অস্বাভাবিক নয়। বুড়ো হয়ে গেছে সে, এখন তো তার যাবার সময় হয়েছে। হাঃ ভগবান!
সেদিন শোবার সময় বউকে ডেকে বললে, 'বস একটু।'
তারপর বললে, 'আমার এবরে যাবার সময় হয়ে এল। কিন্তু ছোট ছেলেটা আর মানুষ হলনি। যাক, ভগমান মানুষ করবে। ই কটা দিন শান্তিতে কাটাতে পারলেই হল—'
'উকথা বলতে নাই—'
লখীন্দর প্রসংগান্তরে যায়। 'বলি, বউ, তুই নাকি কাঁদু সুধীরের জন্তে? টুকী বললে '
নিজেই আবার বলে, 'কান্তে নাই ছেলার জন্যে। থালে অমংগল হয়। আর সুধীর ত কুছু খারাপ কাজ করেনি। ভাল কাজই সে করছে। ভালয় আছে সে, আমি খবর পেইছি। ত পাঁচজনের যদি মংগল হয় তাতে, তা সে গেলেই বা। কাজটা ত ভাল।'
সুধীরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার সময় কোন রকমে ফাঁকি-দিয়ে পালিয়ে এসেছে ও। এসে গোবিন্দর কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে।
লখীন্দর শুধালে, 'কিন্তু, তুই আর উ-কথা ভাববিনি বল।'
গৌরী বললে, 'না আর ভাববনি।'
কিন্তু কথা রাখতে পারেনি গৌরী।
একদিন রাত্রে চুপ করে পড়ে আছে লখীন্দর, এমন সময় ও শুনতে পায় কে যেন অতি মৃদুমৃদু কাঁদছে। অতি আস্তে টেনে টেনে। প্রথমটা ও ভেবেছিল, পাঁয়ের অন্য কেউ হবে হয়তো, কিন্তু পরে বুঝলে,— না, বাড়িতেই কাঁদছে। তার আর সন্দেহ রইল না যে গৌরী ছাড়া

অমন করে আর কে কাঁদবে। ও আস্তে আস্তে নিচে নেমে গেল। দরজাটা একটু ফাঁক করা আছে, তার ভেতর দিয়ে দেখা যায় গৌরী বালিশে মুখ রেখে কাঁদছে। ও কি বলছে অনেক চেষ্টা করে বুঝলে লখীন্দর: 'আমার সনার সংসার গেল…হা বাবা, সুধীর রে…' আর সব কী বলছে বোঝা যায় না।

লখীন্দর আস্তে আস্তে গিয়ে ওর পিঠে হাত রাখল।

গৌরী বুঝতে পারেনি, তাই এক রকম লাফিয়ে উঠল ও। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে কান্না বন্ধ করে লখীন্দরের পা জড়িয়ে ধরলে, 'না না, আমাকে তুমি মেরনি. আর আমি কাঁদবনি। এই তমার পা ছুঁয়ে বলছি।'

লখীন্দর কি জানি কেন হঠাৎ ভালপাতা হয়ে ওঠে, 'পা ছাড়। আমি কি তোকে মারতে এসেছি। এমন কথাটি বললি তুই আমাকে? কখনো আমি তোর গায়ে হাত তুলেছি? ছিঃ ছিঃ। কাঁদ তুই যত পারু, ঝকমারি করে এসেছিলম আমি।'

ছিঃ ছিঃ মেয়েটা তাকে এই বুঝল। সান্ত্বনা দিতে এসেছিল লখীন্দর, কিন্তু, মেয়েটা ভাবলে তাকে শাস্তি দিতে এসেছে। কি নোংরা মন ওর।

কিন্তু পরক্ষণেই ওর উত্তেজনা শান্ত হয়ে আসে। গৌরীর ওপর ওর রাগ তো থাকেই না, উপরন্তু ওর সংগে কটু-ব্যবহার করেছে বলে লজ্জিত হয়ে পড়ে। আহা, মেয়েটা ভয়ে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে কেমন অসহায় ভাবে তার পায়ে জড়িয়ে ধরেছিল। তাকে আবার অপমান করে?

তার মনে পড়ে, কী জন্তে কাঁদছিলো গৌরী। তার সোনার সংসার ছারেখারে যাবে এই তার আশংকা। সত্যিই তো, এই আশংকার কারণ আছে বৈ কি। লখীন্দর তো বুড়ো হয়ে গেছে, তার আর

শক্তি নেই। তা ছাড়া, সে এখন আগেকার মতো কী সংসারে মন দিতে পারে? না তো। কত-রকম চিন্তা তার সংসারে। তার ওপর যোগ্য ছেলে সুধীর চলে গেল। এখন কী ভরসায় ও বুক বেঁধে থাকে? সুধীরকেই বা মানুষ করবে কী করে। টুকিটার বিয়ে হবে কী করে।

যতদিন বাড়ির কর্তা বেঁচে আছে ততদিন এসব চিন্তা করতে নেই, অমংগল হয়। তবু, গৌরী এই চিন্তা করেই হয়তো অমন কেঁদেছে, আর, ধরা পড়ার ভয়ে পা জড়িয়ে ধরেছিল তার। তার কী দোষ।

না, এমন ভাবে আর থাকলে চলবে না।

তার পরের দিন ও মাঠে গিয়ে হাজির হয়। জমির আগাছাগুলো কোদাল দিয়ে কেটে ফেলে। এবারে ভালো করে জমি তৈরী আর হবে না। এর আগে লাঙল দিতে পারলে হত, কিন্তু তার অসুখ, আর সুধীরও ছিল না, তাই চাষ পড়েনি। লখীন্দর দেখল, অল্পবিস্তর প্রায় সবারই ঐ অবস্থা।

লখীন্দর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। এবারে চাষ-বাসের অবস্থা তাহলে এই। মানুষ বাঁচবে কী করে। সে যাই হোক, নিজেরটা সামলানো আগে দরকার। সুধীর নেই বলে ও মুনিষ খুঁজতে বেরোল। কিন্তু, পেল না। অনেক মজুর পালিয়ে গেছে দেশ ছেড়ে। তারা রোজ আনত রোজ খেত, গোলমালের সময় কাজ বন্ধ হয়ে গেলে খায় তারা কী? যারা তখনও ছিল, যে যার নিজের কাজে ব্যস্ত।

চিন্তা করে থই পায় না লখীন্দর। কি হবে তাহলে?

ওর ভেতরে সেই অসহিষ্ণু ভাবটা আবার ফিরে আসে। কোথাও সে দু-দণ্ড দাঁড়াতে পারছে না। কোন দিক দিয়ে সে শান্তি পাচ্ছে না এতটুকু। চারদিক নিরুপায়। যে দিকে ও চোখ ফেরাচ্ছে, সেদিকটাই ফাঁকা বলে মনে হচ্ছে।

সেই একা একা মনে হয় তার। আর এইটেকেই সব চেয়ে ভয় করে সে। অসুখের পর তার ঐ এক অদ্ভুত অনুভূতি হয়। আর প্রায়ই সে স্বপ্ন দেখে, অনেক উঁচু থেকে পড়ে যাচ্ছে সে, অতি নিচে, অতি বেগে···কোথায় ?

গৌরীর কাছে গিয়ে বসে লখীন্দর। সবেমাত্র গৌরী কাজকর্ম সেরে ছেলেদের ঘুম পাড়িয়েছে। লখীন্দর ওর হাতটা ধরে বসে রইল, মাঝে মাঝে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল পিঠে। গৌরী প্রথমটা কিছু বুঝলে না, তারপর বললে, 'যাও, শুতে যাও তুমি। তমাকে আলো দেখি' দি চল।'

'না, বউ, আমি শুবনি এখন। তুই একটু কাছে বস আমার। তুই বসলে আমি একটু আনন্দ পাই।'

আবার লখীন্দর হাত বুলিয়ে দেয়। 'তুই বড্ড রগা হয়ে গেছু বউ।'

অতি সন্তর্পণে এগোয় লখীন্দর। মনে হয় অতি-সূক্ষ্ম তারে ঝুলছে তাদের এই ভালোবাসা। অতি মোলেয়েম করে তাকে নাড়া চাড়া করতে হবে। এতটুকু নিশ্চিত বিশ্বাস নেই কোথাও। এতটুকু উচ্ছ্বাস বা আনন্দের ভার সইবে না। ক্ষীণ একটি জলরেখা বালির সমুদ্র পেরিয়ে এগোচ্ছে। কে জানে হঠাৎ কোথায় শেষ হয়।

'তোদের জন্তেই বেঁচে আছি। তরা সুখে থাকবি বলে তবু খাটাখাটুনি করতে ইচ্ছে যায়। তবে, বউ, ই কথা তরা মনে রাখবি, তদের মুখ চেয়েই আমি আছি। আমাকে হীন-ছিন করিসনি—আমাকে দুটো মিষ্টি কথা বলে সন্তুষ্ট করবি। তাতেই আমি খুশি। আমি যদি দু'দিন উপাস দিই তাতে কুছু আমার খেদ নাই, কিন্তু তরা হেলাফেলা করলে আমি মরে যাব, মরে যাব।'

চব্বিশ

সেদিন ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে সন্ধ্যা-বেলা। সেই মাত্র সন্ধ্যে হয়েছে, তবু চারদিক ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। লখীন্দর চুপ করে উঠোনে বসে বৃষ্টি পড়ার শব্দ শুনছিল। বৃষ্টি পড়ার কতো-রকম মিষ্টি শব্দ যে বেরোয় তার ঠিকানা নেই। পেঁপে গাছের পাতায় বৃষ্টি পড়ে এক রকম শব্দ হবে, করঞ্জাগাছের পাতায় আর এক-রকম, আর আম গাছের পাতায় আরো এক রকমের। আর সব মিলে সে এক অদ্ভুত শব্দ। এত আনন্দ দেয়। লখীন্দর এই বৃষ্টির শব্দ শুনতে খুব ভালোবাসে তাই। সে চোখ বুজে শব্দ শুনে বলে দিতে পারে কোন পাতায় কী রকম শব্দ।

ওদের বাড়ির চারদিকে একটা কঞ্চি আর বাতা দিয়ে বেড়া-দেওয়া। তার ফটকটায় কেউ কি নড়ল? অন্ধকারে ঠাওর হয় না, কিন্তু বোধ হয় কে যেন দরজাটা ঠেলল। হ্যাঁ, পরিষ্কার শব্দ হয়। এমন সময় কে আর আসবে।

সেই মূর্তিটি কাছে এসে বললে, 'লখীন্দদাদা!'

'কে, সতীশ। এস ভাই এস—'

'একটু আস্তে। তোমাকে উঠোনে পেয়ে খুব ভালো হল। ভিতরে থাকলে কী অসুবিধেই না হত, বাড়ির ছেলে-মেয়েরা জেনে যেত—'

'তুমি এসেছ বলে খুব আনন্দ হচ্ছে ভাই। কতদিন তোমাদিকে দেখিনি। দাঁড়াও, তমাকে একটা কাপড় এনেদি, তুমি ভিজা জামা-কাপড় খুলে ফেল।'

'হৈ-চৈ কোরনি। জানোত আজকালকার খবর—'

দুজনে বসল ওরা। লখীন্দর কেমন আছে জিজ্ঞেস করল সতীশ।

'কেমন আর থাকব ভাই। আমাদের আর কি, আমরা ত পা বাড়িয়ে দিছি—'

'সে কথা কে বলতে পারে। বাঁচা-মরার কথা নয়, মানুষকে যতদিন বাঁচতে হয়, ততদিন কাজ করতে হয়। আর কর্মের প্রয়োজনেই শরীরধর্ম পালন করা দরকার।'

যাক সে কথা।

সতীশ বললে, সুধীরের খবর সে নিয়ে এসেছে। ভালোই আছে। লখীন্দরের খবর জানতে চেয়েছে সে।

লখীন্দর হঠাৎ চুপ করে যায়। তারপর বলে, 'তাকে বলবে, আমার অবস্থা ভাল নয়।'

'লখীন্দদাদা, একটু আগে যে কথাবার্তা হচ্ছিল, তাতে আমি মনে করেছিলম যে তুমি ভাল আছ।'

'ভাল আছি সে আমিই আছি। তাকে বলবে, যে বাবা-মায়ের কি হল না হল দেখেনি, তার অত খবর লিবার ঘটা কেনে।'

সতীশ এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর শান্তভাবে বললে, 'আচ্ছা, একথা আমি তাকে বলব।'

'আর তাকে বলবে, সে যেন ঘর-মুখো না হয়।

'আচ্ছা, তাও বলব।' তারপর বললে, 'আমি তাহলে আজ আসি। আর একদিন আসব।' বলে সতীশ উঠোন থেকে নেমে পড়ে। দু' এক পা এগিয়েছে, এমন সময় লখীন্দর অত্যন্ত আগ্রহ ও অনুনয় করে ডাকলে, 'ভাই, শুন, শুন—'

সতীশ ফিরে এসে উঠোনে ওঠে।

'তমরা সব কেমন আছ বললে নি? তমাদের কাজ-কম্ম কেমন চলেছে?

'তোমার আজ মন ভালো নেই, লখীন্দদাদা। আর একদিন এলে কথাবার্তা হবে।'

'তা কি তার হয়। কতদিন পরে তমাদিকে দেখলম। তমাদের দুটা কথা শুনি।'

সতীশ বলে, সেই কথাই ত বলতে এসেছিলম। শোন তবে। আমরা অতি বে-কায়দায় পড়েছি, কোন-রকম কাজ-কর্ম আর হচ্ছেনি। একরকম চারদিকে সব চুপ চাপ। তাই জানতে এসেছিলম, এখানকার অবস্থা কেমন। তুমি তো এখানে রয়েছ, কিছু কাজ করার সম্ভাবনা আছে কি? লখীন্দর অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর শুধোলে, সতীশ, তুমি কি মনে কর আমি আর তোমাদের কাজ করতে পারব?'

'আমরা তোমার ওপর অত্যন্ত ভরসা রাখি।'

'সত্যি বলছ?'

'লখীন্দদাদা, তোমার প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে। প্রত্যেক সমস্যাকে তুমি একেবারে সোজাসুজি দেখতে পাও। তুমি যদি সত্যই কাজ কর, তাহলে আমাদের চেয়ে অনেক ভাল করতে পারবে।'

কি জানি ভাই। কিন্তু এখন আমার নিজের উবরে একটুও ভরসা নাই। এখন আমি কিছু করতে পারিনি। সতীশ বলতে পার কেনে এমন হল?'

'অসুখ করে তুমি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছ। সেই জন্তে বোধ হয়।'

'তাই হবে হয়ত।' বলে চুপ করে রইল লখীন্দর অনেকক্ষণ। তারপর বললে, 'আমার এখন ভয় হয়। মনে হয় আমি একলা।

আমার চারপাশে কেউ কথাও নাই। আমি মরে যাব ভাই, মরে যাব। আমর দ্বারা কিছু হবেনি।

সে আবার বললে, 'আর দেখ সতীশ, মিত্যুকে আমি কুনুদিনও ভয় করিনি। আগে ভাবতম, মানুষকে ত মরতেই হবে একদিন, তাতে দুঃখ কী। ইস্তি-পুত্ত-কন্যার মুখ দেখে যে মরতে পারে, তার তুল্যি আনন্দ নাই। কিন্তু এখন আমি ইস্তি-পুত্তকে ভালবাসতে পারিনি। ওরা আমার যেন কেমন পর হয়ে গেছে। আর আমার ইস্তির কথা শুন। উ আমাকে পর ভাবে, আমার উপর তার কুনু নিভ্ভর নাই। অথচ, কুনুদিন আমি অদিকে পর ভাবিনি অরাও ভাবেনি।'

'তুমি খুব কষ্ট পাচ্ছ লখীন্দদাদা, বুঝতে পারছি। কেন তোমার এই পরিবর্তন হল?'

'ওই যে বললম, কেউ কারও উবরে নিভ্ভর করতে পারছেনি। তুমি এখেনের মানুষের খবর জানতে চাইছ ভাই, ত সবাইয়ের হইছে অমনি। একথা মানলম, যে সবাই রজগার করছে, তার ইস্তিপুত্ত পিতিপালন হচ্ছেও। কিন্তু ঐ ধর কাছিত ধরে আছি। আমি রজগার করলম, তুমিও খেলে। কিন্তু তমায়-আমায় কথা নাই। স্বামী স্তিতে কথাবার্তা নাই। না, না, কথা কইছে ঠিক। তবে পেরাণের কথা নাই আর কি। ই হইচে কি জান কেউ সব মানুষগুলোকে খুঁটিএ কষে বেঁধে রেখেছে। তারা দেখতে পাচ্ছে। ই অকে, কিন্তু কাছে যেয়ে দুটা কথা বলা আদর-স্নেহ হচ্ছেনি। বুঝলে সতীশ, মানুষে মানুষে মিল নাই। যে যার নিজের কথাই ভাবছে, আর ঘুরপাক খাচ্ছে। সতীশ কেনে এমন হয় বলতে পার?'

'পারি। এই সমাজ-ব্যবস্থার জন্যে এমন হচ্ছে। সেই জন্যেই

আমরা বদ্‌লাতে চাই এইটে। কিন্তু একথা তো তোমার বোঝার নয়। দেখ, আমরা অনেক বই পড়েছি, অনেক জ্ঞান পেয়েছি, তার থেকে বললাম কথাটা। কিন্তু হয়তো তোমার অভিজ্ঞতার সংগে মিলবে না। যতদিন না মিলছে, একথা বুঝবেও না তুমি। তার চেয়ে তোমাকে নিয়ে যাব একদিন। গোবিন্দদা অনেক জানে শোনে, অনেক দেখেওছে। সে হয়ত তোমাকে ভাল বুঝিয়ে দিতে পারবে।'

সতীশ উঠ্‌ল। আর বেশি দেরী করা হবে না। বৃষ্টিও থেমে গেছে। লখীন্দর ওর সংগে এল একটুখানি। বললে, 'অথচ দেখ, মানুষ যদি মানুষকে না ভালবাসতে পারল, থালে এ পিথিমী শ্মশান হয়ে গেল। আজ. মানুষের একটুও আনন্দ নাই, মানুষ শুকি' যাচ্ছে।' লখীন্দর তারপর প্রসংগান্তর করে। তোমারে মিনতি করি ভাই সুধীরকে আমার উসব কথা বলোনি, আমি ভাল আছি বলবে। তখন নিজের উপর রাগে বলেছিলম। সুধীর আমার খুব ভাল কাজ করেছে। উ আগে কুপথে গেছল, এখন সে পথে নেই সুধীর। আমার অতেই খুব খুশি। বলবে তাকে আমার কথা।'

পরে বললে, 'আমাকে নিয়ে যেও একদিন।'

লখীন্দরের ওপর যে অন্তরীন থাকবার হুকুম ছিলো, সে সম্বন্ধে তার ধারণা ক্রমশ বদ্‌লে গিয়েছে। প্রথমে তার মনে হতো, ওটা কিছুই নয়। তার চৌহদ্দির বাইরে সে আর যাবেই বা কেন। বুড়ো-বয়েসে দৌড়ঝাঁপ করবার তো দরকার হয় না, বাকি কটা দিন শান্তিতে নিরিবিলি কাটিয়ে দিতে পারলেই হল।

তারপর তার মনে হয়েছে, এ-আদেশ সত্যিই তার বন্ধন। তুমি যদি অন্য পাড়ায় গিয়ে কারো সংগে গল্প করেছ, তাহলে ওরা সন্দেহ করবে। অথচ, মানুষের সংগে মানুষের দেখা-সাক্ষাৎ কথা-বার্তা

বন্ধ হয়ে গেলে মানুষ, বাঁচবে কী করে। এমন কী, তোমার আত্মীয় কুটুম্বের সংগে যদি রাস্তায় দেখা হলে পাঁচটা সুখ-দুঃখের কথা বল তাহলেও সেটা দোষের হবে।

সে নিয়ে লখীন্দরের আশংকাও ছিলো। খামকা কে-কোথা কি মনে করবে সেটা সে পছন্দ করত না। পরে, নিজের এই দুর্বলতায় নিজেই সে লজ্জিত হয়েছে।

মাসখানেক আগে সে দরখাস্ত করেছিলো, অন্যত্র চলে যাবার অনুমতি তাকে দেওয়া হোক। শরীরটা একটু ভালো করবার জন্যে তার বোনের বাড়ি সারেঙ্গায় চলে যাবে। হ্যাঁ, ওখানকার জল-হাওয়া ভাল, সেখানে গেলে ওর ভালোই লাগবে। সে জানত, ওখানেও তাকে থানায় হাজিরা দিতে হবে। তাহোক, তবু স্থান বদল করলে মনটা ভালো হবে একটু। এখানে এক তিলও আর ভাল লাগছে না।

অনুমতি অবশ্য এল। কিন্তু তখন ও ধানবোনা শুরু করেছে। কতক জমি হল, কতক হল না। এ বছরের হালই হয়েছে ঐ, চাষবাসের 'বাড়া' নেই। লখীন্দর ভেবেছিল বোনার পালাটা শেষ করে কিছুদিন তো কাজ নেই, তখন গেলেই চলবে। কিন্তু গেল না ও। ভালো লাগ্‌ছে না আর।

এই—এইটেই হচ্ছে যত সর্বনাশের গোড়া। কোন কিছু তার ভালো লাগে না। ভাবে এটা করলে শান্তি পাবে, কিন্তু পায় না, তারপর ওটাতে যায়, তাতেও সেই। সে আর এমন কী কথা বাবু, নিজের স্ত্রী-পুত্রকেই সে ঝঞ্ঝাট বলে মনে করতে শুরু করেছে।

তাহলে দোষ দিবে কাকে। তোমার মনটাই যে তোমার বশে নেই।

অতএব লখীন্দর মরিয়া হয়ে ওঠে, তার এই "অন্তরে-বাহিরে"র লড়াই শেষ করবার জন্যে। কিন্তু যতই খেপে ততই বিপর্যস্ত হয়।

এই সময় তার দেখা হয় কৃষ্ণমোহন ঠাকুরের সংগে। তিনি তখন অমুতোষ বাবুদের শান্তি-অভিযানে কাজ করছেন।

'কি লখীন্দর, ভাল আছ। অনেক দিন পরে তোমার সংগে দেখা—'

'আপুনি ভাল আছেন? আপনার কথা অনেক দিন শুনিনি। আপনাকে দেখে আনন্দ পেলম—'

'বেশ বেশ—তুমি আমাদের কোন মিটিংএ গিয়েছিলে লখীন্দর? যাওনি? শরীর খারাপ ছিলো বলে যেতে পারনি? হ্যাঁ, তাইতো দেখছি।'

লখীন্দর বলে, 'কিন্তু আপনাদের কথা শুনেছি। উ আপনারা করতে পারবেন নি। আমার ইটাই মনে লেয়--'

ঠাকুরমশায় উৎসাহিত হয়ে ওঠেন, 'চল, চল—ঐ গাছটার তলায় বসি। তোমার সংগে কথা বলে আনন্দ পাওয়া যায়। এস।

বসবার পর লখীন্দর বললে, 'শান্তি আপনারা করবেন কি করে। মানুষের মনেই শান্তি নাই—'

'কিন্তু সে শান্তি আনতে হবে। আর আমরা যা করছি তাছাড়া অন্য পথ নেই। মানুষের শান্তি নেই, সে তো দেখাই যাচ্ছে। আমারও তাই মত। আগে মানুষের মনটাকে ঠিক করা দরকার তবেই তো সব হবে—'

আবার তিনি বললেন, 'তাছাড়া দেখ, এই অশান্তির জন্য দায়ী কারা। কোন এক পক্ষকে সম্পূর্ণ দোষ আমি দিতে চাইনে। দুদলই এর জন্য দায়ী। একদল বিদ্রোহ করল, আর একদল দমিয়ে দিল,—লাভের ভাগে, দুদলের ব্যবধান বেড়েই যেতে থাকে ক্রমশ। কেউ কারো কথা শুনছেও না, বুঝছেও না।'

এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হল। সরকারের আক্রমণের ফলে এই হয়েছে, না কৃষকদের নিজেদের অপরাধে এই হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়,

আগে ঠাকুর মশায়ের সামনে লখীন্দর বিশেষ কোন কথা বলত না, বললেও, ছাত্রের প্রশ্ন শুধোত, তার উত্তর জেনে নিত। কিন্তু এখন সে অনর্গল বকে যাচ্ছে। এতদিন চুপ করে থেকে তার বক্তব্য অনেক বেশি বেড়ে গেছে বলে মনে হয়।

'আমি আপনাকে বলি, দাদাঠাকুর, চাষীদের দিকে চেয়ে দেখেন, ত সবাই মন-মরা। বলি, এখনত আর পুলিসের মারও নাই, গোলমালও নাই। কিন্তু দেখেন কাজকম্ম করছেনি অরা, চাষ-বাস ভাল কচ্ছেনি। আর হবে বা কি করে। কত লোক চলে গেছে গাঁ ছেড়ে, যারা আছে, তাদের হাত-পা সব বাঁধা। আপনি হয়ত বলবেন, তুদিন পরে ঠিক হয়ে যাবে। উটি হবেনি, দাদাঠাকুর, কেনে না মানুষের মন ভেঙে গেছে। জানলম কিসে? ত বলি শুনেন, যে লোক তার হাতের কাজ করতে ভালবাসেনি, হাতে কেস্তে লিয়ে হাঁ-করে আকাশের চিল গণে, সে লোকের মন ভাল নাই, দাদা। দেখেন আপুনি, চাষের উব্‌রে কটা চাষীর মন আছে?'

বলে লখীন্দর চিন্তিত হয়ে পড়ে। কেমন বেদনাতঁ দেখায় তার মুখখানা।

'তবে ইটা আমি স্বীকার যাব দাদাঠাকুর। হয়ত দিন গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু গতবারে চাষীদের কথা ত লেয্য ছিল, তাদের উব্‌রে জোর করা হল কেনে? কখন কি হবে সে ত কেউ বলতে পারেনি। আর সেই জন্যেই ত চাষীদের মনে ফুর্তি নাই।'

সহিষ্ণু হয়ে কথাগুলি শুনলেন কৃষ্ণমোহন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন:

'তুমি ঠিক বলেছ, লখীন্দর। আমি স্বীকার করছি, সরকারী নীতির জন্যেই এই গোলমালটা প্রধানত ঘটেছে। পৃথিবীতে সব সময়ই একদল লোক আছে, যাঁরা অন্যের উপর জুলুম চালায়। কিন্তু তার সমাধান তো মারামারি কাটাকাটি করে নয়। সে তো চিরকাল চলে আসছে, কিন্তু এতদিন পরেও কি কিছু সুরাহা হল? হবে না লখীন্দর,

ওপথে হবে না। আমার ঐ এক কথা, পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে অর্থাৎ শান্তি দিয়ে শান্তি আনতে হবে। আমরা জমিদারের সংগেও কথা বলি, আবার প্রজার সংগেও কথা বলি। আর শুধুতো এখানেই নয়, আমাদের দেশের সর্বত্র, আর পৃথিবীর সব জায়গায় আমরা এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের এ নিয়ে দৃঢ় বিশ্বাস আছে। যা ন্যায্য তা একদিন জিতবেই।

'উ হবেনি। অমন করে হবেনি, দাদাঠাকুর। আমার এই মন বলে—'

এর পরে আর কথা বিশেষ এগোয় না। কেউ কারুকে বোঝাতে পারছে না যখন, তখন বেশি এগোনো সম্ভবও নয়।

এক সময় কৃষ্ণমোহন উঠে বলেন, 'এখন তাহলে আসি লখীন্দর। পরে আবার দেখা হবে।'

লখীন্দর দাঁড়ায়, আগের মতোই দাদাঠাকুরের পায়ের ধুলো নেয়। তারপর খানিকটা লজ্জিত হয়ে বলে, আপনার মুখের উবরে অনেক কথা বলেছি, মাথার ঠিক নাই আমার, কিছু মনে করবেননি। অত্যন্ত ব্যথা পাচ্ছি আমি দাদাঠাকুর। পেরাণে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। তাই বলছিলম দাদাঠাকুর, আপনারা অনেক জানেন, অনেক দেখেছেন, দেখেন যদি সেই শান্তি দিতে পারেন একটু। আর কিছু চাইনি, শুধু এমন ব্যবস্থা করেন, যাতে মানুষ মানুষকে ভালবাসতে পারে। স্বামী-স্ত্রী পুত্তকন্যার সুখের সংসার হয়। আর, মানুষ কাজকে ভালবাসে যেমন। আর কিছু লয়, আর কিছু লয়।'

পঁচিশ

দিনগুলি আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে। যেন তার কোন উদ্দেশ্য নেই লক্ষ্য নেই অর্থও নেই কোনো। এমনটি কিন্তু চিরকাল ছিল না। লখীন্দরের অসুখের পর থেকে এমন হয়েছে। কিন্তু কতো দিন তার জের চলবে? প্রথম প্রথম তার শরীর দুর্বল ছিলো বলেই হয়তো এমনটা হত। কিন্তু এখন তার শরীরে আগেকার মতো শক্তি ফিরে এসেছে, নানা-রকম কাজ-কর্মও সে করে। তবু বুকটা যেন তার কেমনভারী হয়ে থাকে। কী রকম একটা কষ্ট যেন বুকটা কুরে কুরে নেয়।

আগে গ্রামের অন্ত পাঁচজন লোকের সংগে সে আত্মীয়তা অনুভব করতে পারত। তাদের চারিত্রিক আর মানসিক দৈন্যের জন্যে সে ব্যথা বোধ করেছে, কষ্ট পেয়েছে। কিন্তু সে বেদনার যেন এক রকম কী আনন্দ ছিলো। এখন ওদেরকে কেমন ভয় হয়। মানুষগুলো যখন আপন মনে সুখ-দুঃখের কথা বিড়বিড় করতে করতে চলে যায়, তখন লখীন্দর অনেক সময় সত্যি সত্যিই সরে দাঁড়িয়েছে পথ থেকে। লোকগুলোকে দেখলেই ওর খ্যাপা কুকুরের মতো মনে হয়, যেন হঠাৎ কখন কামড়ে দেবে।

অর্থাৎ, বাইরে থেকে বা ভেতর থেকে তার শান্তি পাবার উপায় ছিল না কোথাও। সব জায়গা থেকেই যেন তাকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে। কেবলই তাকে যন্ত্রণা দিয়ে দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এই সময় রামের সংগে ওর দেখা হল। রাম তখন ঘাটাল থেকে ফিরে আসছে, কোর্টে হাজিরা দেবার পর। সেও জামিন পেয়েছে।

'অনেক দিন বাদে তমার সংগে দেখা হল, রাম।' লখীন্দরের কণ্ঠস্বরে একটা বিষণ্ণতা যেন লেগেই থাকে। একটা ক্লান্তি সে কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারে না।

রাম বললে, 'হ্যাঁ, লখীন্দদাদা, আমিও দেখা করতে পারিনি। আজ-কাল নানা ঝঞ্ঝাট এমন সব পড়েছে।'

'বেশ ভাই। হাতে উসব কী বল দিকিন—'

রাম যেন খানিকটে লজ্জিত হয়। বলে, 'বউটার অসুখটা যাচ্ছেনি গো, দাদা। ত ঘাটালে গেছলম, দুটা ল্যাসপাতি লিয়ে এলম। জ্বরে জ্বরে বউটার আর কিছু নাই।'

রামের কথার মধ্যে স্ত্রীর ওপর ভালোবাসা ঝরে ঝরে পড়ছে। লখীন্দর খানিকটে অবাকই হয়। তার স্ত্রীর ওপর সেই অপমানটা এত সহজে ভুলল কি করে রাম। একদিন সুধীর বলেছিলো, 'লোকটার কানা কড়ির মর্দানি নাই, শালা বেউশ্যকে লিয়ে ঘর করছে।' লোকটা বোধ হয় সত্যিই মেরুদণ্ডহীন।

রাম বলে, 'তমার কাছে এসেছিলম দাদা! একটিবার আমার ওখেনে যেতে হবে।'

লখীন্দর বিস্মিত হয়। কোন এক অতিশয় আনন্দের ভার রামের কথায়-বার্তায়, ভাবে-ভংগীতে।

এই দীর্ঘ-দিনের মধ্যে হঠাৎ লখীন্দর যেন একটি পুরোনো জগতের লোক খুজে পেল। আগেকার দিনের হাসি কান্না আশা-আনন্দ সব যেন অতি দ্রুত ওকে ছুঁয়ে যায়। লখীন্দর আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে।

'কেনে, কেনে বল দেখি—'

পরে ও আবার নিজেই বলে, রামকে কোন কথা বলতে না দিয়ে, 'যাব ভাই, যাব। তমাকে দেখে খুব আনন্দ পেলম। আমার উবকে যদিও বারণ রইছে, ত তবু আমি যাব। কাল সন্ধ্যে বেলা।'

'যাবে ত, লখীন্দ দাদা ? তমাকে বলি শুন। গেলবারে আমরা জংগলে পালি' গেছলম ত একটা গরু মরে গেছল, পরাচিত্তি (প্রায়শ্চিত্ত) করব একটি। ত তুমি যেয়ে একটু দেখবে। দুটা উপদেশ দিবে।'

'পরাচিত্তি করবে তুমি ?' লখীন্দর যেন বিশ্বাস করতেই পারছিলো না। অথবা, এ সম্বন্ধে ওর বোধ নষ্ট হয়েই গিয়েছিল। তাই ও অবাক হয়ে তাকিয়েই থাকে।

'হেলে মরলে তার পরাচিত্তি না করলে পাপের নিস্তার নাই। হেলে-গরু কথায় বলে গোহত্য—গলায় দড়ি ছিল লখীন্দ দাদা, চার পুরা পাপ হইছে, ই পাপে নিস্তার নাই।

লখীন্দর শুধোয়, 'তোমরা সবাই করবে ভাই ? যাদের তমারগে সব গরু মরেছে ?'

ওর প্রশ্নে একটি আগ্রহ ফুটে ওঠে। যেন, রাম যদি জবাব দেয় সবাই করবে না, তাহলে ও ক্ষুণ্ণ হবে।

'সবাইয়ের কথা বলতে পারবনি লখীন্দদাদা, তবে আমাদের শামু শুদ্দন করবে। ই হল গিয়ে ভগমানের মর্জি—যার যেমন পেরাণ চায়, সে সেইরকম করবে।'

লখীন্দর বেশ খানিকটে আনন্দ নিয়েই রামের বাড়ি গেল। তখন রাত্রি হয়ে এসেছে, বৃষ্টিও পড়চে টিপটাপ করে। অন্ধকারে জমিগুলো কালো হয়ে মিশে গেছে। কখনো কখনো বিদ্যুৎ চমকালে সমস্ত মাঠটা হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আলগুলোকে মনে হয় কতকগুলো সাপের মতো, জড়াজড়ি করে পড়ে আছে। এমনিতে মাঠের মধ্যে পথ ভুল হয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু লখীন্দর অভ্যস্ত বলে ও তাড়াতাড়ি হেঁটে এগোতে পারে।

পায়ে একটা কাঁটা ফুটল ওর। প্রায় একরকম হাঁটতে হাঁটতেই ও

কাঁটাটা নখ দিয়ে টেনে নেয়। একবার একটা চোরাগর্তে পা পড়ে। কিন্তু এ সব দিকে মনোযোগ দেবার মত অবস্থা নয় ওর, রামের কথা ও কেবলই চিন্তা করছিল।

লখীন্দর আনন্দ পেয়েছে। এতদিন ও প্রায় একলা ভেসে বেড়াচ্ছিল, আজ ওর একটা থিতু হল। রাম গোমাতার ওপর এখনো ভক্তি রেখেছে তাহলে? চারদিকে মানুষ তো সব হন্যে হয়ে গেছে, কেমন হয়ে গেছে, তার মধ্যে ভালবাসা পাপ-পুণ্যের বোধ কোথায়? ভালোই হল, যদি এমনি করেই সে মনে একটু শান্তি পায়।

সেদিন রামের বউটার অসুখ বেড়েছে। রোজ জ্বর হয় একটু একটু করে, আর তলপেটের নিচে কী একটা অসহ্য বেদনা। রাম গরম জল করে, তার মধ্যে ছেঁড়া কম্বল চুবিয়ে নিংড়ে সেঁক দিচ্ছিল। বউটা কেবলই কাতরাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পরে রাম সেঁক দেওয়া শেষ করে বাইরে আসে। লখীন্দরের পাশে চটটা টেনে নিয়ে বসে বলে, 'তমার কাছে লজ্জা নাই লখীন্দ-দাদা, বউটা মরতে চায়নি—বলে, তমার মতন সুয়ামী পায়নি কুন্ মেয়া। তমার পায়ের ধুলা দাও, আমি মাহাপাপী, তমার পায়ের ধুলার জন্যে আমি সরগে যাব—'

পরিষ্কার বোঝা যায় রামের চোখ জলে ভরে এসেছে। রাম তার কান্না গোপন করল না, গামছার খুঁট দিয়ে মুছে ফেলল।

'রাম, তুমি তমার ইস্তিকে ভালবাসতে পেরেছ। তুমি ভাগ্যিমন্ত পুরুষ।'

রাম কিছু বলে না। লখীন্দরও চুপ করে থাকে। ভেতর থেকে মাঝে মাঝে রামের স্ত্রীর কাতর শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ আর বাইরের ঝমঝম বৃষ্টির আওয়াজ শোনা যায়।

এক সময় রাম উঠে গিয়ে হুঁকো-কলকেটা আনে। চালের বাতা

থেকে তাল-পাতা পেড়ে লম্ফ জ্বালিয়ে অবিলম্বে তামাক ধরায়। 'লখীন্দ-দাদা লাও।'

লখীন্দর অন্যমনস্ক ভাবে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিল। 'লি ভাই'—বলে বাঁহাত দিয়ে হুঁকাটা নিলো লখীন্দর। কয়েকটা টান দিয়ে বললে, 'একটা সত্য কথা বলবে, রাম? তুমি আনন্দে আছ।'

রাম প্রথমটা কিছু বুঝল না। তারপর লখীন্দরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ই কথা কেনে শুধাচ্ছ, ই কথা তমার বুঝলম নি।'

লখীন্দর বললে, 'রাম, তুমি আগের কথা লিচ্চয় ভুলে যাওনি। তুমি কি রকম মানুষ ছিলে! তমার দুদ্দশা দেখলে কান্না পেত। তুমি একদিন বলেছিলে, তুমি আত্মঘাত (আত্মঘাতী) হবে। এখন তমাকে দেখলে মনে হয়, তুমি শান্তি পাচ্ছ, তমার মনে শান্তি হচ্ছে। তমাকে অনেকদিন দেখিনি, এখন তাই আশ্চয্য লাগছে।'

রাম আস্তে আস্তে বললে, 'একথা সত্যি। আমার পেরাণে আর কুনু দুঃখু নাই।'

তুমি একদিন বলেছিলে—'রাম, মনে রাগ-ঘেন্না রাখবেনি। মাথা ঠাণ্ডা রাখবে। সবাইকে ভালবাসবে। আমি অনেক ঠকে দেখেছি, ইটাই হল সাচ্চা কথা। আর সব শূন্যি। হঁ।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও আবার বললে, 'আমার জনমটা বড় দুঃখে কেটেছে, লখীন্দ-দাদা। কখনো সুখ বলতে পাইনি। ছেলাবেলায় মামার লাথ-ঝাঁটা খেয়ে কাটালম, বড় হয়ে দুটা পয়সার মুখ দেখলম নি, আর অসুখ-বিসুখ ত লেগেই ছিল। তার উব্‌রে ইস্তির জন্যে কী অপমান হল। বল দিকিন, একটা মানুষ সহ্য করে কি করে। এখন ইটা বুঝেছি, মানুষকে না ভালবাসলে শান্তি নাই।'

লখীন্দর যা জানতে চায়, এটা তার জবাব নয়। এসব কথাতো তার নিজেরই মুখের কথা। তারই কথা যেন তাকে শোনাচ্ছে। তাই আবার

ও শুধোয়, 'রাম, দেখ, চারদিকে একটা ঝড়ঝাপটা গেল। এত বড় একটা আন্দোলন হল। পুলিসে মেরে আর রাখেনি। তমার উব্‌রেও ত কম হয় নি। ত তুমি তবু কী করে মনে শান্তি পাচ্ছ। গাঁয়ের চারদিকে চাইলে আমার মনে হয়, গাঁটা খাঁ-খাঁ করছে। আমার গা ছম্‌ছম্ করে।'

'লখীন্দদাদা, তমাকে বলা হয়নি, আমি কিষক সমিতির লোক হইছি। সতীশ বাবুই আমাকে কিষক-সমিতির কাজে লিলে। ই কাজ আমার খুব ভাল লাগে। লোকে বলে, রাম, ভয় পায়নি তমাকে? আমি বলি, না ভয় আমার নাই। মানুষের পেরাণ-বাউ (প্রাণবায়ু) এই আছে, এ নাই, ত ভয় কিসের। ইটাও তমার শিক্ষা লখীন্দদাদা। সেই যে মনু-দিগারের জমিতে ধান তুলবার সময় তুমি শিক্ষা দিলে, সেটাই আমার মনে আছে। সতীশবাবু ভাল বলে লখীন্দদাদা। মানুষের এই দুঃখ-কষ্ট সব এই মানুষ মানুষে ভেদাভেদের জন্যে। যে লোক কষ্ট দেয়, সেও সুখী নাই, যে পায় সেও সুখী নাই। সেই যে লখীন্দদাদা, একদিন কেঁছকাপুরের মাঠে লাঙল করতে করতে ঐ কথা তুমি বলেছিলে, মানুষ এখন কেউ খুশি লয়। সতীশ বাবু বলে—'

লখীন্দর ওকে ঝটকা মেরে থামায়, 'উ সব কথা রাখ দিকিন, রাম।'

রাম থ' ব'নে লখীন্দরের মুখের দিকে তাকায়।

'উ সব কথা রাখ কেনে। উ সব কথা আমি ঢের শুনেছি—'

'তোমার মনে কষ্ট দিলম, লখীন্দদাদা ?'

'ই সব কথা আমি শুনে শুনে বুড়ো হয়ে গেলম। এই গেলবারের অসুখের আগে সতীশ আমাকে পড়ালনি? কত বই পুঁথি আমি পড়লম, তমার চেয়ে আমি খুব জানি, অনেক জানি। 'ত এত জেনে শুনে কিছু হলনি। উসব কিছু লয়, কিছু লয়।'

লখীন্দর অনেক কিছু বলতে চায়, কিন্তু বলতে পারে না। সহজে রাগ হয় না লখীন্দরের, কিন্তু রাগলে ও একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ে। ওর ভেতরের জ্বালাটা যেন ও বের করে দিতে চায়, কিন্তু সব কিছু গুছিয়ে বলা ওর দ্বারা হয়ে ওঠে না। তাই ও প্রায় এক রকম হাঁপিয়ে ওঠে। তারপর নিঃঝুম হয়ে পড়ে।

তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। কেমন একটানা নিস্তব্ধতা চারদিকে থম থম করে। কোথায় দূরে পুবদিকের জলাটায় উচ্চিংড়ে ডেকে চলেছে।

রাম হাত দুটি লখীন্দরের সামনে জড়ো করে বলে, 'লখীন্দদাদা, তুমি আমাকে মাজ্জনা কর। তমার কাছে ইটা আমি দোষ স্বীকার করলম।'

লখীন্দর ইতিমধ্যে শান্ত হয়ে এসেছে। নিজের অস্বাভাবিক আচরণ সম্বন্ধে ও একটু একটু করে সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করে। বলে, 'না রাম, উ কথা বলবে নি। দোষ তমার লয়। দোষ আমার। তা না হলে তমার উব্রে আমি বেরক্ত হব কেনে।'

রাম ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'লখীন্দদাদা, তুমি ই কথা বলবে নি। এই তমার পা ছুঁয়ে দিব্য করলম, তুমি আমার গুরু। তমার কাছ ঠিঙে আমি শিখেছি। আজ তুমি যদি ই-কথা বল ত আমি সগ্গে যেয়ে শান্তি পাব নি।'

লখীন্দর কিছু বলে না। ও নিজের মনের ভেতরে কী ফেলে নিয়ে মিলিয়ে দেখে। তারপর বলে, 'তমার অফমান করলম, রাম।'

'ই সব কথা কেনে বলছ লখীন্দদাদা। তমার কী দেহ ভাল নাই? আমাকে দুখী করছ কেনে।'

লখীন্দর বলে, 'মানুষ এত পাথর কেনে। জান রাম, আমি কাঁদতে পারিনি, আমার কান্না নাই। কাঁদলে আমার ছোট-মনটা একটু

ভাল হত। আমি একটু শান্তি পেতম।' তারপর রামের হাত ধরে বলে, 'রাম, তমার চেয়ে আমি বয়সে অনেক বড়, আমার মাথার চুল পেকে গেছে। তমাকে আমি আশিব্বাদ করলম, ভাই, তুমি সুখী হবে। পরের দুঃখ বুঝে তুমি পুণ্যবান হবে, ভগমান তমাকে শান্তি দিবে। শুধু আমি আর পারলম নি।' একটু থেমে ও আবার বললে, 'আমার আর কি। আমরা ডাক শুনতে পেইছি, ক'দিনের জন্মেই বা আছি আর। তাছাড়া জান রাম, আমি ছোট হয়ে গেছি। আমার স্ত্রি-পুত্তের উবরে আমার ভালবাসা নাই। আমার বেরক্ত এসেছে। আমি ছোট হয়ে গেছি।'

রাম মহা বিব্রত হয়ে রড়ে। জীবনে সে সব চেয়ে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে এই লোকটিকে। তারই সামনে লখীন্দর যখন এত কাতর হয়ে পড়ল, তখন ও নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে করে।

'লখীন্দদাদা, আমি কনেষ্ট ব্যক্তি, তমাকে আমি আর কি বলব। তুমি একদিন ঠিক হয়ে যাবে। তমার মনের সেই শক্তি আছে, তুমি ঠিক পারবে।'

এরপর আর বিশেষ কথা হয় না। টুকিটাকি দু'একটা কথা হয়, তারপর লখীন্দর যাবার জন্তে ওঠে। রাম বলে, 'দাঁড়াও লখীন্দদাদা, তমাকে একটুন পথ দেখি'দি। মণ্ডল বেড়ের পাশ দিয়ে যাবে ত? একটা শিয়াল খেপেছে ওখেনে, আর সাপখোপের দিন আজকাল।' একটা হ্যারিকেন, আর বাঁশের লাঠি নিয়ে বেরোল রাম।

পথে প্রায় ওরা কথা বলল না। যে সময় ওরা বিদায় নেবে, তখন রাম বললে, 'থালে বল তুমি লখীন্দদাদা, কিষক-সমিতির লোক হয়ে কি আমি ভাল করিনি? সতীশবাবুরা যা করতে বলে, থালে কি অতে কিছু হবেনি?'

'না, ভাই, উ কথা আমি বলব কেনে। সতীশকে আমি জানি,

গোবিন্দকে আমি জানি। অমন ছকরা আমি দেখিনি ভাই। ত কি জান, তমাদের সব আশ (আশা) আছে, তমরা তাই আনন্দ পাচ্ছ। যে মানুষের আশ নাই, সে বাঁচবে কী করে। তমরা তবে কাজ করতে পারছ। তমরা পারবে ভাই তমরা পারবে।

'হ্যাঁ, ঠিক। এই আমার ছেলে সুধীরের কথা ধর। উ এখন গোবিন্দর কাছে গেছে। সুধীর এখন বুঝে কম। কিন্তু কখন অর মন ত খারাপ হয়নি। ত অরা পারবে। আমি আর পারলমনি। আমি যে এত বুঝি ত তাতে কি হল। কিছু হলনি।'

…গ্রামের এই নিঃঝুম অবস্থাটা একটু একটু করে কেটে আসে। দীর্ঘকাল রুগ্ন রক্তহীন শরীরে একটু একটু করে রক্তের সঞ্চার হয়। কৃষক সমিতি আবার উঁকি ঝুঁকি মারে এখানে ওখানে। কৃষকরা একটু চঞ্চল হয়। ওরে, একটু চোখ মিলে দেখ, চোখ মিলে দেখ—কেউ যেন বলে বলে যায়।

দুজন, তিনজন, পাঁচজন, সাতজন…জড়ো হয়। শামুর বাড়ির কাঁদালে তেঁতুল গাছটার আড়ালে। দুটো ঝাঁটালো লম্বা আনারসের গাছ পশ্চিমদিকে। দক্ষিণ দিকে পুকুর। হ্যাঁ, এই জায়গাটাই ভালো। প্রথম দিন, দ্বিতীয় দিন। তৃতীয় দিনে আর চলে না। আবার অন্য একটা জায়গা ওরা খুঁজে বের করে। তারপর আবার অন্য পাড়ায়।

শুধু এই নয়। ছেলে ছোকরারা লাঠি নিয়ে রাত্রে ঘোরা ফেরা করে। মাঠের আলের ওপর দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকায়। তারপর অতি ফিসফিসিয়ে কী বলে এখানে ওখানে দাগ কেটে রাখে। মনে মনে অবিশ্যি।

মাঝে মাঝে রাম লখীন্দরের কাছে আসে। অতি উৎসাহের সংগে

তুচ্ছতম ঘটনা পর্যন্ত বর্ণনা করবে ও। প্রত্যেকটি জিনিস সম্বন্ধে লখীন্দরের মতামত জানতে চাইবে।

একদিন ও বললে, 'জান লখীন্দদাদা, আমার এখন কী মনে হয় জান। আমি এখন অনেক কিছু কাজ করতে পারব। আমি মরবনি। আমি মরতে চাইনি।'

লখীন্দরের অতি স্পর্শ কাতর মন এ উৎসাহ সইতে পারে না। চিরকাল তো সে এরই স্বপ্ন দেখে এসেছে। আজ সে নিজে যোগ দিতে পারছে না বলে বেদনার ওর সীমা নেই। ও শুধু বলে, 'ভাল, ভাই, ভাল।'

'আচ্ছা, লখীন্দদাদা, তুমি কি ইটাকে ঠিক বলনি, ইটার দ্বারা কিছু হবেনি—এই তমারগে কিষক সমিতি দিয়ে?'

লখীন্দর বললে, 'সে কথা ত আমি কুনুদিন বলিনি।'

'তবে তুমি এমন করে কষ্ট পাচ্ছ কেনে। আমার ইটা মনে হয় লখীন্দদাদা, তুমি চিরকালটা পরের দুঃখ কষ্ট দেখে এসেছ, পর হলেগ তমার আপন। আজ তুমি আমাদের সংগে এমনি বলে তমার এমন মন খারাপ।'

'তবে তমাকে বলি শুন রাম। তুমি ঠিক বলেছ। কিন্তু কাদের কাজ আমি করব কি কাজ আমি করব। তমরা কিষক-সমিতির কাজ করছ। কিন্তু কিষক-চাষারা কি করছে দেখ। রাম তুমি আমার সংগে চল। সমস্ত গাঁটা তমাকে আমি দেখাব। চাষীরা মা লক্ষ্মীর যত্ন লেয়নি। খামার ভেঙে পড়ে যাচ্ছে, বলে, কি হবে মেরামত করে। ধান ভিটায় উঠবে কিনা কে জানে। বলে, কবে, রাম রাজা হবে, আজ তার অধিবেস। চালে খড় নাই। দিন রাত ঝগড়া লেগে আছে। চাষারা মদ খাবে। দেখছ ত একটা লোতন তাড়ি দকান হইচে আমধেড়ায়। তার ইদিকে তুলসী তলায় মুথাঘাসের বন হইচে, ত আর কি কিছু আছে ভাই। গাঁয়ে আর কিছু নাই।'

'তুমি কি জাননি, লখীন্দদাদা, ই সব কেনে হইচে। আগে কেনে এমন ছিলনি? এখন বা এমন হচ্ছে কেনে? আমাদের শত্তুকে যতদিন না আমরা মারলম, ততদিন আমাদিকে ইটা ভোগ করতে হবে।'

'কি হবে শত্তুকে মেরে? ঘরেই কাল সাপ পুষে রেখেছ ভাই। মা লক্ষ্মীর উবরে ভক্তি নাই চাষীর। চাষীর যদি মা লক্ষ্মী না থাকে তাহলে সে চাষী মরে যাউ, তার ক্ষেতি নাই।' একটু থেমে দম নিয়ে ও আবার বললে, 'জান রাম ই সব কথা আমি সবাইকে বলতে চাই! আমার ই বুকটায় অনেক কথা জমা আছে, ভাই। সবাইকে যদি আমি বলতে পারতম, থালে আমি বাঁচি যেতম। কিন্তু জান, মানুষ দেখলে আমার কেমন যেন হয়। আমি চুপ করে যাই, আমি বলতে পারিনি। বলতে গেলে আমার ছাতি যেমন শুকি' যায়। বুক ধড়পড় করে।'

রাম লখীন্দরের জন্যে দুঃখ বোধ করে। ও বলে আস্তে আস্তে, 'তমাকে আর কি বলব, তুমি জ্ঞানী লোক। তবে তমার কথা শুনবার জন্যে লোকে হাঁ করে আছে। তমাকে ভালবাসে সবাই।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি। তাই আমার আরও দুঃখ হয়। আমার একটু অভিমান আছে, রাম। তুমি একদিন বলেছিলে, আর কেনে লখীন্দদাদা, তমার ত বয়স হল, মানুষের উবগাড় তুমি করেছ। এখন শান্তিতে কা'টি দাও।—ইটা আমার পেরাণে কতটা যে লেগেছিল তা তুমি জাননি। আমি অনেক কিছু করতে চাই, রাম, আমি চুপ করে থাকতে চাইনি।'

'সব পারবে, লখীন্দদাদা, তুমি সব পারবে।'

'তাই যেন হয়, ভাই। মনে শান্তি লিয়ে আমি যেমন মরতে পারি। তমাকে আশীর্বাদ করছি রাম, তমার কথা যেমন ঠিক হয়। হে ভগমান তুমি দয়া কর আমাকে। আমাদের উবরে মুখ তুলে চাও।'

ছাব্বিশ

ইতিমধ্যে হরির জীবনে বিপর্যয় আসে। প্রথম আঘাত করে নবীন আর, দ্বিতীয় আঘাত করে মালতী। আর এই দুটি আঘাতেই সে ধরাশায়ী হল। দৈহিক ভাবে বেঁচে থাকলেও মাঝে মাঝে কারো জীবনে সে বেঁচে থাকার অর্থ একেবারে শূন্যে গিয়ে পৌছায়। হরিরও হয়েছে সেই অবস্থা।

দীর্ঘ চার মাস নবীনের কোন পাত্তা ছিল না। কবে সে তার চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল। মাঝে খোঁজ নিয়েছে তার হরি। মা মারা যাবার পর নাকি কোথায় চলে গেছে সে। অনেকদিন পরে গ্রামে ফিরে এসে দিন-মজুরী করছে।

হরি তাকে ডেকে পাঠাল। প্রথম বার না, দ্বিতীয় বার না, তৃতীয় বার নবীন এসে দেখা করল ওর সংগে।

'কি হে নবীন, তোমার যে পাত্তা নাই কী ব্যাপার। শুনছিলম, কোথায় নাকি চলে গিছলে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। গড়বেতায় গিছলম, একটা চা-দকানে পেয়েছিলম চাকরী। তা উ আমার পষাল নি, এখন দেখে মুনিষ খাটি।'

'তা, বেশ—' পরিষ্কার বোঝা যায় নবীনের চেহারায় হাবভাবে একটা অদ্ভূত পরিবর্তন এসেছে। হরি বললে, 'তা এতদিন হল, একবারও দেখা করলেনি, এঁ্যা ? ওহে মাথা নিচু করে কেনে, মুখটা তুলেই কথা বল না হে।'

নবীনের মাথাটা আরো নিচু হয়ে পড়ে।

হরি তার স্বভাবসিদ্ধ বাণ ছোঁড়ে: 'চেহারাটা মরদের মতন করেছ। পারবে দেখছি। তাই বলি, নবীন এতদিন ডুব দিলে কেনে। শরীর ভালো করছিলে তাহলে' এ্যাঁ? তা এটা ঠিক, শরীর যদি ভাল না থাকে, তাহলে কিছুটি হবেনি। বস না হে—'

নবীন তথাপি দাঁড়িয়ে থাকে।

'একদিন তুমি আমি একটা কথাবত্তা কইছিলম, মনে আছে? সেই যে মালতী-মাগিটে—'

এই সময় মুখ তুলে হরির দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে নবীন বললে, 'আজ্ঞে, আমাকে আর উ সব কথা বলবেনি। আমি আর উ সবের মধ্যে নাই। ছেড়ে দিয়েছি। ইটা আমি বুঝেছি, লোভ করতে নাই, পাপ করতে নাই, থালে মানুষ ছোট হয়। মানুষ কষ্ট পায়।'

বলে আস্তে আস্তে চলে গেল।

মালতীকে চায় না নবীন? নবীন,—তারই প্রিয়তম শিষ্য, যাকে সে নিজের প্রতিরূপ বলে জানে? হয় সে জেগে স্বপ্ন দেখছে, নয়তো নবীন পাগল হয়ে গেছে।

কিন্তু নিজের মনকে চোখ ঠেরে লাভ নেই। হরি খবর নিয়ে জেনেছে, নবীন এখন সম্পূর্ণ সুস্থ আছে, আনন্দে আছে।'

লোকে জানে হরির গায়ের চামড়া অসম্ভব পুরু। ওর লজ্জা নেই অপমান বোধ নেই। কিন্তু সেটা ভুল কথা। অসম্ভব রকমের অপমান বোধ ওর আছে। দুদিন ও কারো সংগে কথা বলতে পারল না। মুখ দেখাতে পারল না কারো কাছে।

তৃতীয় দিন কালু সেখ, মধু ডোম আর কিশোরী বাগ্দীকে ডেকে বললে, 'আমধেড়ের নবীনকে চিনিস? ওকে একটু শিক্ষা দিও। তবে আজ নয়, দেখি আর একবার চেষ্টা করে যদি কিছু হয়।'

এ প্রতিহিংসা নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কিন্তু তারপরের দিন স্বয়ং অজয় রায় তার বাড়িতে এসে বললে, 'মামা গো (এই প্রথম) তোমার মালতী সাবাস মেয়ে। তুমি তাকে আচ্ছা জুটিয়েছিলে।'

হরি সতর্ক হয়ে অপেক্ষা করে। এমন ভাবান্তর অজয়ের কখনো দেখেনি। আনন্দে ও যেন ঝক ঝক করেছে।

'জানো তো, এখানে আন্দোলনের রুই-কাৎলা একটাও ধরা পড়েনি। অত কড়াকড়ি সত্ত্বেও। তার রহস্য ধরা পড়েছে। তুমি তো পুলিসের সংগে মালতীর আলাপ করিয়ে দিলে। আর পুলিসের তুচ্ছতম গতিবিধির খবর পর্যন্ত মালতী গোবিন্দর হাতে পৌঁছে দিয়েছে। সাবাস মেয়ে।'

পুরো আধঘণ্টা চুপ করে রইল ওরা দু'জনেই—হরি অতি শান্ত ধীরে অতি স্থিরভাবে বসে থাকে, আর অজয়ও শান্ত হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে কিন্তু ওর প্রত্যেকটি শিরায় যেন অতি মিষ্টি অতি লঘু, অতি সুন্দর রক্ত দোল খেয়ে খেয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে!

হরি বললে, 'কখন খবর পেলেন?'

'এই মাত্র—'

'তাহলে দোহাই, কোন রকমে মালতীকে একবার এখানে পাঠিয়ে দিতে হবে। যেমন করে হোক।'

'নিশ্চয়ই, তোমার মালতী, তোমার কাছে পাঠাব না?'……

মাথার মধ্যে আগুনের হল্কা ছুটছিলো। লোকে খুব আঘাত পেলে বলে, ওগো আমার বুকটা জ্বলে যাচ্ছে। কিন্তু সর্বাংগ জ্বলে গেলে কেমন যন্ত্রণা হয় সেটা হরি অতি পরিষ্কার করে অনুভব করে।

হরি প্রতারিত হয়েছে।

এতদিন অন্যকে ঠকিয়ে এসেছে সে। সুখের ঘর ভেঙে দিয়েছে। ওর বেশ মজা লাগে, যখন কোন লোক হঠাৎ তার স্বামীভক্তিপরায়ণা স্ত্রীর-

কীর্তিকলাপ জানতে পেরে সহসা আর্তনাদ করে ওঠে। স্ত্রী অবিশ্বাসিনী হলে যে আঘাত লাগে অতো আঘাত বোধ হয়, কোন কিছুতেই নেই। হরি সেটা জানে, ওই হতভাগ্য লোকগুলির ওপর অনুকম্পার সীমা নেই তার। কিন্তু তবু তার কেমন এক ধরনের তৃপ্তি বোধ হয়। ও যেন ওদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, 'ওহে, মেয়েদিকে বিশ্বাস কোরো না। তারা অমনিই।'

মদের বোতলটা খুলল হরি। ঢকঢক করে গলায় ঢালল খানিকটে। আঃ, গলাটা পুড়ে যাবার সময় কী আরাম লাগে। ঝাঁ করে মাথাটা ঘুরে গেল যখন। দূরে বনটার দিকে তাকিয়ে রইল হরি। অন্ধকার হয়ে গেছে, দুএকটা জোনাকি মিট্‌মিট্ করছে গাছের পাতার ফাঁকে। একটা শেয়াল খামারের পাশ দিয়ে চলে গেল।

ওই সামনের বনটা পেরিয়ে মাঠ। একেবারে গ্রামের প্রান্তে ঘর হরির। আর একবার গলাটা পোড়াল হরি।

কালু শেখ, মধু ডোম, আর কিশোরী বাগ্‌দী এসে নমস্কার করে দাঁড়াল। খুব তাড়াতাড়ি যাবি, আর তাড়াতাড়ি এসবি। নেশায় চুরচুর করবি, গা দিয়ে নেশা বেরোবে—আর আনবিও কিছু।

হাতকাটা ফতুয়ার পকেট থেকে কয়েকটা টাকা বের করে দিল হরি।

'খুব তাড়াতাড়ি। খবরদার, যেন দেরী না হয়।'

ওরা বিগলিত হয়ে পড়ে।

'আইগ্যাঁ, আজকে কি আমধেড়ে যাব না কি?'

'আইগ্যাঁ, না,' হরি ক্রুদ্ধ হয়, 'যা বলা হচ্ছে তাই কর।'

ওরা চলে যাবে বলে পা বাড়িয়েছে, হরি ওদের থামাল।

'বল দিকি অপমান বেশি লাগে, না কেউ যদি ঠকায় থালে বেশি লাগে?'

'আইগ্যাঁ?' বলে ওরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

'শালা, মুখ্যুর বাচ্চা।' হরি গর্জায়, 'নবীন না হয় একটা অপমান

করেছে। কিন্তু…কখনো আমি ঠকিনি। অপমান পাইনি তা নয়, কিন্তু, সে গায়ে মাখিনি আমি। কিন্তু আমাকে কেউ ঠকাতে পারে'ন এর আগে—যা, যা, তোরা আবার দাঁড়িয়ে রইলি কেনে।'

প্রায় এক ঘণ্টা পরে ফিরে এল ওরা। নির্দেশ মতো তো বটেই, তারও বেশি করে এসেছে।

থ হয়ে দাঁড়াল হরির সামনে। অবিশ্যি, জ্ঞান ওরা হারায় নি। কর্ম-ক্ষমতা তখনও আছে। কারণ, হরি যদিও ওদের একরকম প্রতিপালক, তবু এত অনুগ্রহ যে এমনিই নয়, তার বদলে একটা কিছু কাজ করতে হবে সেটা ওরা জানত। তাই সেইটের অপেক্ষা করতে লাগল।

'য , ওই দরজাটা খুলে ফেল—'

দরজা খুলে মালতীকে দেখে ওরা।

'যা; ওইটেকে লিয়ে যা। ভাগ করে লিবি—'

ওরা একটা অব্যক্ত শব্দ করলে : বিস্ময়, অবিশ্বাস আর লোভের।

'শালারা ঐ খামারে ধানগাদাটার পাশে লিয়ে যা—তোদের জন্যে কি সোনার পালংক করে দুব নাকি ?'

হরির নেশাটা টিকছে না। যত রাত হচ্ছে, সমস্ত ব্যাপারটা ওর কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠ্ছে। কোন মেয়ে যে এই ব্যাপার করতে পারে, সে তো কল্পনার অতীত। কিন্তু আপাতত সে কথা নয়, ও ভাব্ছে ও মরে যাবে। এত বড় আঘাত ও সইতে পারবে না। শিকার যখন শিকারীকে ধরে তখন তার অবস্থা যা হয়, হরির অবস্থাও তাই।

কিন্তু ওই মোষ তিনটে বড় বেশি বিদকুটে শব্দ করছে। ও হাঁকে, 'মেধো—'

মধু আসতেই ধমকায়, 'শালা, মাগি কখনো দেখু'নি ? শালারা চুপ করে কাজ কর একটু।'

আবার একবার নেশা কাটল।

হঠাৎ ওর মাথায় একটা বুদ্ধি আসে।

'না এটা আমি ঠিক করলম নি। ও মাগি তো আর পূজোর ফুলটি নেই যে, ওর এতে অপমান হবে। ওকে শাস্তি দেওয়া হবে। অবিশ্যি পুলিসে নির্ঘাৎ লিয়ে যাবে ওকে। কিন্তু তাতেই বা কি? ওর রূপ তো দিন দিন বাড়ছে, আর বাড়বেই বা না কেনে, কলাগাছ বর্ষার জল পেইছে—তো পুলিস কি করবে ওকে? কিছুই না, মধু যদি পায় ওর কাছ থেকে—'

মধ্যরাত্রি পেরিয়ে রাত্রি শেষের দিকে এগোচ্ছে। ও আর মদ খেল না। নেশা তো হচ্ছেই না, এখন শুধু জলের মতো মনে হচ্ছে। প্রথম দিকে একটু যা লেগেছিল।

'হ্যাঁ, ওর দেমাক ভাঙত যদি ওর ভাঙত রূপের গুমোর, ওর দেহের গুমোর। কী করে ভাঙা যায় সেটা?···এঁ্যা গ্রামে কেউ নেই তেমন লোক। ওঃ হোঃ, হয়েছে, হাতের কাছেই তো আছে, আমাদের গাঁয়েই তো আছে। বাছাধন—তোমাকে এতক্ষণে পেলম আমি ঠিক মতন।' ওর কল্পনায় ভাসছে, মালতীর অমন দেহখানা গলে শুকি'য় গেছে, সর্বাংগে গুটিগুটি বেরিয়েছে কী সব। মুখে মাছি ভন্‌ভন্‌ করছে, তাড়াবার জন্যে হাতে বল নেই। ওর দিকে চোখ পড়ে গেলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে লোকে।

একটা হ্যারিকেন নিয়ে খড়গাদাটার পাশে গেল হরি।

'এই শালারা, ভাগ, ভাগ শালারা। হইছে, খুব হইছে—'

ওরাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো।

'হ যাই বাবু, হ যাই—আমরা পেরাণটা দুব আপনার জন্তে।' কৃতজ্ঞতায় মৃত্যুপণ করে যায় ওরা।

একটি উলংগ নারী-মূর্তি। রক্তে মাটি ভিজে, পাশে শাড়িটার খানিকটেও

ভিজেছে। ছেঁড়া ব্লাউজের একটা অংশ ওর পায়ের কাছে আর একটা অংশ বাঁহাতে জড়ানো।

হরি দেখে। মেয়েটা গর্ভবতী হয়েছিলো, স্রাব হয়ে গেছে।

কিন্তু বেঁচে আছে তো? হ্যাঁ, আছে। ডান হাতটা তুললো একবার। ঠোঁট দুটো একটু নাড়লো। বোধহয় জল খাবে।

হরির পরিকল্পনা সার্থক করতে হলে আপাতত মেয়েটাকে সুস্থ করা দরকার। আর মরে গেলে তো সব ফুরিয়েই গেল। অতএব হরি জল এনে ওর চোখে একটু দেয়।

চোখ মেলে তাকাল মেয়ে। হাঁও করল্ জল খাবে বলে। কিন্তু কে ও?

ওই অবস্থাতেই ঘৃণা করতে পারে মানুষ? চিনতে পারে তার শত্রুকে? মুখ বন্ধ করল মেয়েটা। পড়ে রইল মড়ার মতো।

কি হতে কি হয়ে গেল। অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো হরি। মালতীর ঠোঁটের সেই আশ্চর্য ঘৃণা লক্ষ্য করল। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ। 'হ্যাঁ, অজয় ঠিক বলেছে। সাবাস মেয়ে তুমি। সাবাস!'

খড়গাদার পাশে পুরণো কোদাল পড়েছিল একটা। আগে হারিকেনটা নিবোলে হরি, তারপর সেই কোদালটা সজোরে চালাল, ঠিক ব্রহ্ম-তালুতে। অনেকক্ষণ মাংসপিণ্ডটা নড়ে নড়ে থেমে গেল।

জীবনে কোনদিন কাউকে শ্রদ্ধা করে নি হরি। মেয়ে মানুষ তো নয়ই। তুচ্ছতম সম্মান পর্যন্ত দেখায়নি কাউকে সে। কিন্তু যদি তার কোনো সম্মান-বোধ থেকে থাকে, তাহলে সে এই প্রথম দেখালে।

সাতাশ

ছেলেবেলার বইয়ে অজয় পড়েছিলেন, সময় চলে যায় আপন মনে। তার চলার তালের সংগে তাল রেখে মানুষ ঘড়ির কাঁটা আবিষ্কার করেছে। অর্থাৎ কম নয়, বেশি নয়, মাত্রা নির্ভুলভাবে ঠিক রেখে চলেছে।

কিন্তু সেকথা ঠিক নয়। সময় কখনো চলে অতি ধীরে, যখন বছরের পর বছর কেটে গেলেও মনে হবে না তোমার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। আবার, কখনো সময়ের গতি অতি দ্রুত, কয়েক মাস, এমন কি কয়েকদিন পরে তোমার মনে হবে, তুমি যেন এক যুগ পেরিয়ে এলে। আগেকার সংগে এখনকার কোন মিল নেই তোমার।

অজয়েরও হয়েছে তাই।

একটি বছর আগে যা ছিলো তাঁর রক্তমাংস, এখন তা স্বপ্নের মতো বলে মনে হয়। স্মৃতির ভাণ্ডারে হাত বাড়ালে নানারকম জিনিস হাতে ঠেকে, সেগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। ছেলেবেলায় খেলবার পুতুল যেন, সেগুলো দিয়ে কাজ হবে না কিছুই তবু কেমন যেন ভালো লাগে।

অজয় তাঁর প্রিয় জানালার ধারে একটা চৌকী টেনে বসেন। সামনে পুব দিকের মাঠ, সেই মাঠের শেষ প্রান্তে আবার অন্য গ্রাম শুরু হয়েছে। এতদূর থেকে কোনটা কী গাছ বোঝা যায় না, কিন্তু মাঝে মাঝে উঁচু হয়ে উঠেছে কোন নারিকেল গাছের মাথা, সেগুলোর নড়াচড়া পর্যন্ত দেখা যায়।

আষাঢ় মাসের প্রথম তখন। কয়েক দিন মাত্র বৃষ্টি পড়েছে। তাতেই মাঠ সবুজ ঘাসে ছেয়ে গেছে। বাতাসটা অনেক বেশি স্নিগ্ধ। সমস্ত মাঠটার ছোঁয়া তাঁর কপালে অনুভব করেন তিনি।

মাঠ প্রিয় তাঁর। মাঠের শস্য তাঁর প্রিয় বস্তু। মাঠের মানুষগুলি তাঁর প্রিয় বস্তু ছিলো। এদের কেন্দ্র করে আকাশচুম্বী কল্পনা ছিলো তাঁর। সে কল্পনা গত বছর পর্যন্ত ছিলো। অবিশ্যি, ছেলেবেলায় কল্পনার যে-রূপ ছিলো, সে-রূপ গিয়েছিল বদলে। কিন্তু অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের সংগে মিশে সে কল্পনা আরো বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছিল।

মানুষকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন তিনি। মানুষকে উন্নত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারলেন না। স্বার্থপরতা, নীচতা, তাঁকে অধিকার ক'রে বসল। তিনি নষ্ট হয়ে গেলেন।

অথচ স্বার্থপরতা, নীচতা, বা লোভ এগুলোকেই ঘৃণা করতেন সব চেয়ে বেশি। নিজের স্ত্রীকেও ক্ষমা করেন নি সেজন্যে। সাবিত্রী যখন অতিশয় আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠ্‌ল তখন ভালোবাসতে পারেননি তাকে। অবশ্য অতি বাস্তবদৃষ্টি তাঁর ছিলো বলে বুঝতে পেরেছিলেন যে, সংসারে এগোতে হলে এসবকে নাড়াচাড়া করতেই হবে। নিজের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারলে সে নাড়াচাড়া করাতে দোষ নেই। কিন্তু সেই নীচতা তাঁকে পেয়ে বসল।

পেছনের দিকে ফিরে তাকান অজয়। প্রথম পাপ তিনি করেছিলেন, সাবিত্রীর বোনকে নিজেকে কাজে লাগিয়ে। অদ্ভুত ভালোবাসত তাকে মেয়েটা। তাঁর সব কথাই বেদবাক্য বলে মেনে নিতো সে। সেই মেয়েকে যখন নষ্ট করল হরি, তখন হরিকে খুন করতে পারতেন না তিনি? কেবল স্বার্থপরতা, কারণ হরি না বাঁচলে তাঁকে টাকা যোগাবে কে? কে তাঁকে নানারকম বুদ্ধি দিয়ে রক্ষা করবে? তারপর ঘর করতে গেল মেয়েটা, কত আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিলো।

কিন্তু তাকে চিরদিনের জন্য নষ্ট করলেন তিনি। মরবার সময়ও ভালোবেসে গেছে মেয়েটা তাঁকে। আর তিনি? তিনি সেই ভালোবাসাকে কাজে লাগিয়েছেন নিজের সম্পত্তি রক্ষার কাজে।

আর হরির কথাই যদি ধরা যায়, তাহলেই বা তাঁর রেহাই কোথায়? স্বীকার করতেই হবে হরির মতো নীচ লোক কল্পনা করা যায় না, হরি তাঁকে প্ররোচিত করে অনেক হীন কাজে লাগিয়েছে সত্যি, কিন্তু সেটা কী তার দোষ? কোনদিন কী হরিকে সে জন্যে বাধা দিয়েছেন? কই, নাতো।

তিনি দাঁড়িয়ে দেখেছেন, হরি মালতীকে ঘুষ দিয়েছে। সমর্থন করেছেন তিনি, কারণ ভালো কাজ পাওয়া যাবে বলে। সেই পাপ অবিশ্যি দ্বিগুণ হয়ে ফিরে এসে তাঁকে আঘাত করেছে, তাঁরই ভ্রাতৃবধূ আর ভাগ্নীকে উচ্ছিষ্ট করেছে ওরা।

কেন এমন হল?

পরের ওপর দোষ চাপিয়ে লাভ নেই। তাঁর নিজের মধ্যেই গলদ ছিলো নিশ্চয়ই, তা না হলে এমন ফল হবে কেন। আজ অনুসন্ধান করলে বোঝা যায়, কোন-কালে সাধারণ মানুষের অনিষ্ট তিনি চাননি। কৃষিকে উন্নত করে তার মাধ্যমে মানুষকেও উন্নত করা তাঁর আদর্শ ছিলো। তার জন্যে জমি কিনেছেন, জমিকে ভালোবেসেছেন। কিন্তু সেই জমিই তাঁকে পেয়ে বসল। সেই জমি রক্ষা করবার জন্যে গুপ্তচরও নিয়োগ করেছেন তিনি, পুলিসও ডেকেছেন। কাদের বিরুদ্ধে? না, যাদের বিরুদ্ধে কোনদিন তিনি ভাবেন নি। আশ্চর্য! আর একটি মানুষের সংগে পরিচিত হয়েছিলেন তিনি। লোকটি শিরষের জমিদার অমৃতোষ সিংহ। অমন শান্তভাবে নৃশংস হতে কোন মানুষকে দেখেন নি অজয়।

এসেছিলেন শান্তি-অভিযানের প্রস্তাব নিয়ে। সে-সম্বন্ধে আলোচনা

করলেন। বলেছিলেন কাজে নামতে। কিন্তু মেনে নিতে পারেন নি ব্যাপারটা। যে কয়েকটা মিটিং অনুতোষ বাবু করেছিলেন একটাতেও যাননি তিনি। যেখানে চাষীদের ন্যায্য দাবী স্বীকার করা হচ্ছে না, যেখানে তারা যদি খেপে যায় তাহলে তাদের দোষটা কী হল। তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের এখন কী করা উচিত জানেন? সরকারের এই কার্যক্রমের বিরোধিতা করা। এক-একটা কার্যক্রম তাঁরা নেবেন, আর তার ফলে আমাদের ধনপ্রাণ বিপন্ন হবে, এ আমি চাইনে। এই যে পুলিসের জন্যে আমাদের ছোটাছুটি করতে হচ্ছে, সেটার জন্যে কী আমাদের সত্যিই কোন গরজ ছিল। গরজটা আমাদের ঘাড়ে চড়ানো হয়েছে। ফলটা দাঁড়ালো কী, আমরা আরো বেশি করে সরকারের গলগ্রহ হলাম, আর কৃষকদেরও শত্রু হয়ে দাঁড়ালাম।'

অনুতোষ বাবু বোঝাতে চাইলেন যে, সরকার বাধ্য হয়েই এই নীতি গ্রহণ করেছেন।

'স্বীকার করিনে। কৃষকেরা যদি ঐ দামে ধান বিক্রী না করতে চায়, তাহলে সে বিষয়ে তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। আমি ফ্রীডম অব এণ্টারপ্রাইজে বিশ্বাস করি।'

অনুতোষ বাবুর বক্তব্য ছিলো, সেটা এখন সম্ভব নয়। নানাকারণে বাইরের অন্য জাতি, বিশেষ করে ইংরেজদের সংগে আমাদের ভাগ্য জড়িয়ে ফেলতে হয়েছে। সাধারণ স্বার্থের খাতিরেই অবিশ্যি করা হয়েছে সেটা। তার জন্যে অনেক কিছুই ক্ষতি স্বীকার করতেই হবে। না করে উপায় নেই। আশ্চর্য! অতি আশ্চর্য! নিজের হাতের তাস অপরকে দেখাবার কী অর্থ থাকতে পারে? তোর ঘরের ক্ষতি হলেও পরের মোষ তাড়াবি? ইংরেজকে তাড়ালি কেন তাহলে?

'ব্যাপারটা তুমি বুঝছ না অজয়। সময় অতি দ্রুত বদলে গেছে।

আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতাই ধরো। জমিতে দিনমজুর খাটিয়ে চাষ-করা আজকাল কত বেশি লাভের, নয় কী? যে জন্যে যে-কোন মূল্যে তুমি জমি বাড়িয়ে চলেছ, সেই কারণেই আমি সুযোগ পেলেই জমি খাস করে নিই। কিন্তু তাওতো সম্পূর্ণরূপে করতে পারিনে, কারণ প্রজা রাখতেই হবে। নানা শ্রেণীর প্রজা তোমার রাখা চাই-ই।'

'মানে?'

'সমস্ত কৃষকই যদি ভূমিহীন হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে ওরা কী হয়ে দাঁড়াবে বুঝতে পারছ!'

ইতিমধ্যেই তো ওরা ভয় লাগিয়ে দেয়। জমির মায়া বড়ো মায়া, সেটা নষ্ট করতে নেই। আর জমিও যদি কেড়ে নাওতো, বাস্তুভিটে কাড়বে না, কিছুতেই না।

'আমি হলে সব—অবিশ্যি কেড়ে নয়, ন্যায্য দাম দিয়েই নিতুম। তারপর ওদের থাকবার জন্যে তৈরী করে দিতুম ভাড়াটে বাড়ি।'

'ফলটা ভেবে দেখো, সারা দেশ জুড়ে সর্বস্বান্ত কৃষকরা কিলবিল করছে। তাদের পেছনে কোন টান নেই। কল্পনা করতে আমার ভয় হয়।'

শুধু বেঁধে রাখা। মানুষকে পাকে পাকে জড়িয়ে নিজের কাজ করিয়ে নেওয়া। ওরা বোঝে না যে, ওদের বেঁধে রাখলে নিজেদেরও কোন লাভ নেই। পরিণামে নিজেদেরই ক্ষতি।

কিন্তু কই, নিজেও তিনি কিছু করতে পারেন নি তো।...

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। এ অঞ্চলটার মধ্য দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেল।

মালতীর ব্যাপারটা নিয়ে কী জানি কেন তিনি স্বস্তি বোধ করেছিলেন। হয়তো, ভেবেছিলেন যে, ভালোই হয়েছে ওরা একটা উচিত শিক্ষা পাবে। নীচে নামলে মানুষের এই রকম শাস্তি পেতে হয়। সেই জন্যেই

হরিকে তিনি নিজে গিয়ে সানন্দে খবরটা জানিয়ে এসেছিলেন। আর হরি কি করলো? খুন করে ফেলল মালতীকে।
ভালোই হয়েছে। ও মেয়ে শাস্তি পেয়েছে মরে গিয়ে।

কিন্তু, এই অত্যন্ত বেদনার মধ্যেও হাসি পায় অজয়ের। অবিশ্যি, এ রকমই একটা কিছু আশংকা তিনি করেছিলেন। আশুতোষ বাবু তাঁর মতামত যে ভালো চক্ষে দেখেননি, আর, সেটা যে পুলিসের কান পর্যন্ত পৌঁছবে সেটা তিনি আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু আর ভালো লাগছিল না তাঁর যে কোন রকমে নিজেকে নিরাপদ করতে। ফলে, ওরা মালতীর জন্যে তাকে দায়ী করল: মালতীর সমস্ত কার্য-কলাপের সংগে যোগ ছিল তাঁর। তিনিই না অফিসারদের প্রলুব্ধ করেছেন মালতীর সংগে যৌন-ব্যাপারে লিপ্ত হতে? তাছাড়া, ব্যাপারটা ধরা পড়লে যাতে নিজের সম্বন্ধে কোন কিছু প্রকাশ না হয়ে পড়ে, সে জন্যে মালতীকে গুণ্ডা দিয়ে খুনও করিয়েছেন।
হ্যাঁ তো। এই অভিযোগের কোনটাই মিথ্যে নয়। মালতী প্রসংগের আগাগোড়া তিনিই জড়িত, তিনিই দায়ী।
অতএব? যদি বাঁচতে চাও, তাহলে ছোটাছুটি করো: আশুতোষ সিংহ থেকে শুরু করে চন্দ্রকোণা থানা, সদর, দরকার হলে প্রাদেশিক দপ্তর পর্যন্ত। সংগে হরিকে নিয়ে নাও। হরি তোমায় নানা-রকম বুদ্ধি বাতলে দিতে পারবে, অন্তত-, কর্তাদের হাত করবার সমস্ত বুদ্ধি।
অজয় আবার হাসলেন।......

অনেকদিন সাবিত্রীর সংগে কথা বলেননি অজয়। তাই উঠে গিয়ে ওর ঘরে বিছানায় বসলেন।

তখন রাত্রি হয়ে গেছে। সাবিত্রীর মাথার কাছে চাকরানী পিদিম দিয়ে গেছে একটা।

'তোমার সংগে দেখা করতে এলাম। কেমন আছ?'

সাবিত্রী শুধু শান্তভাবে তাকিয়ে রইল। ওর চোখ দুটি একেবারে ফাঁকা, তার মধ্যে কোন অনুভূতির প্রকাশ নেই।

'ভালো হতে চাও, সাবিত্রী? শান্তি চাও? আর একবার চেষ্টা করে দেখব আমি।'

সাবিত্রী হঠাৎ বললে, 'তুমি সরে যাও, সরে যাও। তোমাকে সহ্য করতে পারব না আমি। তোমাকে আমি ঘেন্না করি।' বলে পাশ ফিরে দেয়ালের দিকে মুখ লুকিয়ে নিলে। অজয় বেরিয়ে আসে। ওর ঘরে অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ড্রয়ার থেকে রিভলবারটা বের করে সাবিত্রীর ঘরে আবার গিয়ে দাঁড়ায়। না, শান্তিই দেবেন ওকে। হরিকেও।

সাবিত্রী বোধ হয় ঘুমোচ্ছে। কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে ও। কত ছোট মানুষ ওই মেয়েটি। মনটা কতো নীচু ওর।

হঠাৎ তাঁর অতি তীব্র আত্মপ্রত্যয় ফিরে আসে। না, এতদিন যা তিনি ভেবেছেন বা করেছেন তাতে কোন গলদ ছিল না। শুধু ওদের মতো ছোট জীব তাঁকে টেনে নামাবার চেষ্টা করেছে মাত্র: ওরা অতি তুচ্ছ জীব, ওদেরকে ক্ষমা করো। ক্ষমা করো।

আঃ, কী আনন্দ। কী আশ্চর্য আনন্দ।

অজয় নিজের কণ্ঠনলীর কাছে চিবুকে রিভলবারের মুখটা রাখলেন, তারপর ট্রিগারটা টেনে দিলেন।

আটাশ

ধীরে ধীরে এলাকাটা উজ্জীবিত হয়ে উঠছে। আস্তে আস্তে মরা গাছপালায় প্রাণসঞ্চার হচ্ছে বলতে হবে।

এই দীর্ঘ দিন গোবিন্দের কোন অবসর ছিল না। কোথায় কেমন করে কেটেছে সে জানে না। জানতেও হয়নি। তার নিজের জন্যে ভাবনা চিন্তা অন্যে ভাগ করে নিয়েছিলো। তার খাওয়া-পরা, থাকা শোয়ার জন্যে অতি যত্ন সহকারে অন্যে দেখছে।

জনসাধারণের সংগে সংযোগ কাকে বলে, সেটা এখন অতি প্রত্যক্ষ অতি বাস্তব হয়ে দেখা দেয় তার কাছে। এই সময় কেউ তাকে সমীহ করে চলেনি, ভয় করেনি, কিন্তু তাকে রক্ষা করেছে, আশ্রয় দিয়েছে। কতবার গুলির সামনে বুক পেতে দিয়ে তাকে বাঁচিয়েছে কোন কৃষক! কত কৃষক-রমণী নানা ছলনা করে পুলিস ভাগিয়েছে, তাকে পালাতে সাহায্য করেছে।

আন্দোলন এবং দমননীতি তো পুরো মাত্রায় চলেছে। মানুষের এ হচ্ছে চরম পরীক্ষা। মানুষের স্নেহ ভালোবাসা চুরমার হয়ে যায়, আবার নতুন করে গড়েও ওঠে। আশ্চর্য, এ অভিজ্ঞতা অতি আশ্চর্য। সমস্ত অনুভূতিকে এক নতুন পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে পৌঁছায়।

মানুষের জীবনের সব তুচ্ছতা সব অভিমান কোথায় ভেসে যায়। জীবনটা কী এক আশ্চর্য সৌন্দর্যে ঝলমল করে ওঠে। তখন মৃত্যুও কতো সুন্দর হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, এই জন্যেই তো মৃত্যুকে সুন্দর বলেছেন কবিরা, জীবনদ্রষ্টারা।

গোবিন্দ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

একটা প্রস্তাব এসেছিল একবার যে, গোবিন্দ সাময়িক ভাবে অন্যত্র চলে যাক। তা হয় না। তাছাড়া তার দায়িত্ব আছে, কর্তব্য বোধ আছে। কেমন যেন মায়া বসে গেছেও। এদের মধ্যে অনেকদিন কাজ করছে গোবিন্দ, এখন ছেড়ে যেতে কেমন লাগে। ও ভাবে, যা হবার হোক। এত লোকের যা হচ্ছে তাই হবে, আমি থাকবই। কিন্তু এটা ব্যক্তিগত ভালো লাগা না-লাগার প্রশ্ন নয়, কাজটাই বড়। তার এখন ধরা পড়া চলবে না। তাছাড়া এদের ছেড়ে যাবে কোথায় সে? এদের মধ্যে না থাকলে সে বাঁচবে কী করে।

একটা কথা ছিল, মানুষের হৃদয়-বৃত্তিগুলি যদি স্বাভাবিক অবস্থায় বাড়তে না পারে, নানা কারণে ব্যাহত হয়, তাহলে সেটা সংকটকালে প্রকাশ পায়। গোবিন্দের এই অভিজ্ঞতা অনেক বারই হয়েছে। কিন্তু এবারে সে আশ্চর্য হয়ে গেছে।

একটি কৃষক ধরা পড়লে, তার জন্যে অন্য কৃষকদের ভাবনার অন্ত ছিল না। এমন কি ছোট ছোট ছেলেরা পর্যন্ত সে নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে। যত রকম করে পারে, সেই কৃষকটির পরিবারকে সাহায্য করেছে। নানা কারণে এমনিতে কতখানি স্বার্থপর ওরা, কিন্তু সবার দুঃখকে এমন করে নিজের করে দেখতে এর আগে এত ব্যাপকভাবে সে দেখেনি।

কিন্তু এইবারে গোবিন্দর এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেটা মর্মন্তুদও বটে।

মানুষের হৃদয় অতি বিচিত্র, নানা খাতে নানারকম করে তার গতি। অতি ভালোবেসে সেই হৃদয়কে বুঝতে হয়। ছোট্ট শিশুটির মতো অতি সাবধানে নাড়া-চাড়া করতে হয় সেটিকে। নইলে তা তোমার ওপর মর্মান্তিক প্রতিশোধ নেবে।

মালতী আর গায়ত্রীর কথা মনে পড়ে তার। এই দুটি মেয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করে গেছে। একজনকে দশ-জনে ঘেন্না করবে, আর একজনকে পূজো করবে।

তাদের পরিণতি হল কী করে এমনতর? তার জন্যে তিনিই দায়ী। ব্যক্তিগতভাবে এর সংগে তিনি জড়িত।

মা মারা যাবার কিছুদিন পরে মালতী তার বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলো গোবিন্দকে। সেবারে কী এক কাজে ওই পাড়ায় গিয়েছিলো গোবিন্দ। রুটি সেঁকে বেগুন ভাজা দিয়ে খাওয়ালে। তারপর গোবিন্দ উঠতে চাইলে বলেছিলো, 'বস না গোবিন্দদা একটু।' তখন শীতের রাত্রি, রাতও হয়েছিল। বাইরে শীতে বাতাসটা ভারী হয়ে আসছিলো।

'কি বলবি বল, আমাকে আবার কতদূর যেতে হবে জানিস তো। তুই তো এখন লেপের মধ্যে ঢুকবি।'

'বড় ভাগ্যি আমার, রাজ্যের লেপ বালিশ আমার ঘরে গিজগিজ করছে।' বলে ওর সামনে এসে পিঁড়ি পেতে বসল মালতী।

কী যেন ও বলবে, অথচ বলতে পারছে না। চোখ নিচু করে নখ খোঁটরাচ্ছে। সেটা লক্ষ্য করে গোবিন্দ বললে, 'কি রে, কিছু বলবি?'

'তোমরা খুব ভাল লোক, নয় গোবিন্দদা? তোমরা খুব ভালো লোক।' বলে হঠাৎ ওর মুখের দিকে একবার চাইলে, আবার হঠাৎই চোখ নামিয়ে নিলে। ওর ঠোঁট দুটো কাঁপছে।

'তার মানে? মানে কি হল তোর কথার?' অতি তীক্ষ্ণ সকৌতুক একটি হাসি গোবিন্দর ঠোঁটে ঝকঝক করে।

মালতী আরো ঘাবড়ে যায়।

কিন্তু মনের কথাটা বলতেই হবে যে কোন রকমে। এই সুযোগ

ছাড়লে তো হবে না। কতোদিন ধরে ভেবেছে সে। আজ না বললে মরে যাবে।

'আমি খুব খারাপ মেয়ে, নয়? আমি, মুখ্যু, নয়? তমার পায়ের নখের যুগ্যি নয়।' বলে একবার হাসবার চেষ্টা করলে, তাতে ও আরো অসহায় হয়ে পড়ল।

'না হয় তুই আমার পায়ের নখের যোগ্য নস, তাতে হল কী। সেইটে বল।'

এর পর গম্ভীর হয়ে গেল মালতী। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। ও কী ভাবলে বোঝা গেল না, কিন্তু বললে, 'লোকে আমাকে খারাপ মেয়ে বলে, গোবিন্দদা আমি খারাপ নয়। তমার পা ছুঁয়ে বলতে পারি।'

গোবিন্দ এবার হো-হো করে হেসে দিল: 'লোকে বলল বা না বলল তাতে কি। তুই যখন খারাপ নস, তখন আরো ভাল।'

এরপর আর কী বলা যেতে পারে। অতএব, মালতী, গোবিন্দ চলে যাবার সময় প্রণাম করল শুধু, পায়ের ধুলো নিলে।......

একটি অতি দুঃখী মেয়ের অতি নরম ভালোবাসা ফুলের পাপড়ির মতো ছিঁড়ে কুঁচি কুঁচি করে ফেলেছে। আর তার প্রতিশোধও নিয়েছে মালতী। একেবারে নিঃশেষ করে দিয়ে গেছে গোবিন্দর কাছে।

কিন্তু কিছুতেই সান্ত্বনা পায় না গোবিন্দ। তার হৃদয়হীনতার জন্যেই তো এই শোচনীয় কাণ্ড ঘটেছে। কোন মতেই সে ক্ষমা করতে পারবে না নিজেকে।

শুধু এই নয়। তার স্ত্রী গায়ত্রীর পরিণতিও তারই জন্যে হয়েছে। কোনদিন সে গায়ত্রীকে স্ত্রীর আদর দেয়নি, একটি মেয়ে স্বামীর কাছ থেকে যে ভালোবাসা চায় তার এতটুকু পায়নি সে। শুধু ক্ষমা

পেয়েছিলো। কুমারী অবস্থায় যে অপরাধ তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সে অপরাধের ক্ষমা। ছোঃ। আর গোবিন্দ মানুষের মত তৈরী করতে চেয়েছিলো মেয়েটাকে। লেখাপড়া শিখিয়ে, তার কাজের মধ্যে টেনে আনতে চেয়েছিল।

না, এ অপরাধের ক্ষমা হয় না।

মর্মান্তিক বেদনা তাকে অভিভূত করে ফেলে। ও বুক চেপে কেবলই পড়ে থাকত। অহরহ জ্বালা করছে যেন।

কবিগুরুর কোন কবিতা সে যেন পড়েছিলো। লাইনগুলো মনে নেই তার: 'আমার বক্ষে যে তুমি অমন আঘাত করছ, যদি পাথর ফেটে উৎস না বেরোয় তাহলে তুমি কী করবে।'

হ্যাঁ, আমাকে সফল করো। পাষাণ গলিয়ে দাও। আমার বেদনা আমার অলংকার করো।

উনত্রিশ

এরপর দীর্ঘদিন বিরতি।

এমনিতেই আষাঢ় মাসের শেষ হয়ে গিয়েছিল। কৃষকরা ধান-বোনা, জমি তৈরী করা ধান রোয়া ইত্যাদিতে ব্যস্ত রইল প্রায় সারা বর্ষা-কালটা। কোনদিকে নজর দেবার অবকাশ ছিল না কারু। এমন কি নিজের সুখ-দুঃখ, ভবিষ্যতের ভাবনা পর্যন্ত না। রোজকার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বা খাওয়া-দাওয়ার মতো যন্ত্রবৎ ব্যাপারটা শেষ করে দিলে।

শরৎকালে ওরা জমির বাড়ন্ত ধানগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। বা খালে বিলে কোঁচ নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো বকের মতো।

হেমন্তে ওদের বুকের ভেতরটা নড়ে উঠল যেন। ধানশীষ দেখে দেখে জেগে উঠল ওরা। জৈবিক নিয়মেই রক্ত চলাচল ওদের আরো সতেজ হয়। ওরা আশা করতে শুরু করে। এতদিন তাকালেই ওদের চোখে একটা ফাঁকা ফাঁকা ভাব ছিল, সেখানে স্নিগ্ধতা দেখা দিল। মুখের টান টান রেখাগুলো নরম হয়ে এল একটু।

লখীন্দর আর থাকতে পারল না। ও দেখা করল গোবিন্দের সংগে।

ত্রিশ

তখনও ভোর হয়নি। লখীন্দর বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। আস্তে আস্তে আবৃত্তি করতে থাকে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। এ অভ্যেস তার চিরদিনের। ঘুম থেকে উঠেই এটা স্বপ্নের মতো আবৃত্তি করবেই লখীন্দর। তার বাবাও করতো, বাবার কাছ থেকেই সে শিখেছে। চোখে মুখে জল দিয়ে পুবদিকে মুখ করে দাঁড়ালো লখীন্দর। সামনের মাঠটায় অন্ধকার পাতলা হয়ে এসেছে। নারিকেল গাছটা আর অশথ গাছটার মাঝখানের আকাশটা একটু পরিষ্কার। ওটা ক্রমে লালবর্ণ হয়ে উঠবে। সূর্যদেব আসছেন। লখীন্দর হাত জড়ো করে প্রণাম করে। মোটা শাদা চাদরটা বুকের ওপর পাক দিয়ে দিয়ে ভালো করে জড়িয়ে নেয় লখীন্দর, এখনই মাঠে যেতে হবে। যাতে ঠাণ্ডা না লাগে তার জন্যে চাদরের নিচে একটা ফতুয়াও এঁটে নিয়েছে সে। তবুও রাস্তায় নেমেও কাঁপতে থাকে।

চালের বাতা থেকে কাস্তেটা পেড়ে নিয়েছিলো সংগে। সেটা কোমরে গুঁজতেই ছ্যাঁৎ করে লাগে। যাক, ও ঠাণ্ডাটা একটু পরেই সয়ে যাবে। বাঁহাতে বিচালি দিয়ে পাকানো রসি আর ডান হাতে হুঁকোটা টান্‌তে টান্‌তে এগোয়। এমনিতে পথের ধুলো ঠাণ্ডা বরফ, রক্ত জমে যাবার উপক্রম। কিন্তু হেঁটে হেঁটে ওদের অভ্যাস হয়ে গেছে। একটু পরেই লখীন্দরের সয়ে যায়।

এখন ধান কাটার খামারে ওঠানোর সময়। তাই কাজের চাপ খুব বেশি। লখীন্দর একটা মুনিষ অবিশ্যি করেছে, সে আবার কখন আসে।

লখীন্দর ভেবেছিলো সেইই বোধহয় সবার আগে মাঠে গিয়ে পৌছোতে পারবে। কিন্তু রাস্তায় আরো অনেকের সংগে দেখা হল।

'কি লখীন্দদাদা, ভাল আছ ?'

'তমরাও বেরিছ দেখছি। ভাল ভাল।'

'না বেরোলে চলবে কেনে ; কাজত আর কম নাই।'

মাঠে গিয়ে লখীন্দর অবাক হল। ওর আগেই অনেক লোক এসেছে। তারা ধান কাটতে শুরু করে দিয়েছে কখন।

ভাল, ভাল। লখীন্দর আনন্দিত হয়। এখনকার লোকেরা এইটে বোঝে না যে, সূর্য ওঠার আগেই কাজ এগিয়ে রাখলে কত 'সুসার' হয়। আগে এটা ছিল বটে। তাছাড়া এই ভোর বেলা মাঠে কাটাতে পারলে যত বেলা হবে, তত তোমার জোরু বাড়বে। তা কুঁড়েমি করলে হবে কী করে।

লখীন্দর কাজ শুরু করে। এক-'দম' কাজ করবার পর ও যখন মুখ তুলে তাকায়, তখন বেশ চারদিক আলোয় ভরে গেছে। শিশিরগুলো ঝলঝল করছে ঘাসের ডগায়। ওর তখন চার ল্যাচাড়ি (সারি) ধান কাটা হয়ে গেছে।

কলকেটায় আগুন ধরাবে বলে বসেছে এমন সময় রতন এসে হাজির। বলে, 'আন লখীন্দদাদা, তমার জমিএ কাজ করব আমি।'

লখীন্দর ওকে মুনিষ ডাকেনি। কিছু বলেও নি ওকে। তবু যে ও কাজ করবে বলছে তাতে অবাক হয় সে।

রতন বলে, 'তুমি আমাকে খেতে দিও চারটি। আর যা হয় দু-চারটে পয়সা দিও। না থাকে দিবে নি। কিন্তু কাজ আমি করলম।' বলে সে ধান কাটা শুরু করে দেয়।

লখীন্দর হেসে বলে, 'বেশ, কর কর।'

লখীন্দর এতক্ষণে সারা মাঠটার দিকে তাকিয়ে দেখে। আঃ, একি !

চোখ যে জুড়িয়ে যায়। কতদূর কতদূর গেছে…ওটাতো রামের জমি, তারপর রঘু খাঁ-এর, তারপর মেঠেনীর যদুবাবুর…তারপর, তারপর, তারপর! কিন্তু সেকথা নয়। প্রত্যেকটি জমিতে ধান কাটতে লেগেছে মেয়েরা, পুরুষেরা। বসে বসে ধান কাটা যায় না, দাঁড়িয়ে শরীরের উপরার্ধ ঝুঁকিয়ে দিয়ে কাটতে হয়। বাঁহাতে ধানগোছের গোড়া ধরে ডান হাতে কাস্তে চালায়। তারপর ঝুঁকে পড়া শরীরটা একটু ওপরের দিকে ওঠে, বাঁহাতটা ডানদিক থেকে বাঁদিকে টেনে ধানের গোছাটা দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনা হয়, তারপর আবার আগেকার মতো। বাঁহাত ভরে উঠ্‌লে 'এক হালা ধান হবে, সেটা মাটিতে রেখে আবার এক হালা, দু'হালাতে এক আঁটি। এক আঁটি ধান। মেয়েদের হাতের মুঠি ছোট বলে, তাদের তিন হালা লাগে এক আঁটি হতে।

কিন্তু আশ্চর্য। কেউতো কাজ থামাচ্ছে না। লখীন্দর একাই কাজ বন্ধ করে দেখছে। ও একটু লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি কাজে লাগে আবার। রতনকে বলে, 'আজকে মাঠের বাহারটা হইছে দেখেছ।'

'হ্যাঁ, তাইত দেখি।'

কিছুক্ষণ কাজ করার পর লখীন্দর আবার দাঁড়িয়ে দেখে। আবার কিছুক্ষণ কাজ করে। আবার দেখে। দেখে দেখে ওর চোখ দুটি সতৃষ্ণ হয়ে ওঠে।

রতন তাড়া লাগায়, 'কাজ বন্ধ করে দিলে যে গো, লখীন্দদাদা।'

'এই ভাই, এই লাগি—'বলে কিছুক্ষণ হন্তদন্ত হয়ে কাজ করে। তারপর বলে, 'রতন কী বললে তুমি তখন তমার কাজ ছিলনি বলে তুমি ধান কাট্‌তে এলে?'

'হাঁ গো, দাদা। সবাই গাঁ ছেড়ে চলে এল দেখলম। তা আমার ত জমি নাই তুমি জান। তা নাই থাক। চাষীর বেটা ত আমি।

ত আমি ঘরে বসে থাকব ? তাই ধান কাটতে এলম। ধান কাট্তে ভাল লাগে গো দাদা। তাছাড়া সবাই কাটছে, আর আমি কাটবনি, ইটা কেমন দেখায় ? মনটা থালে খারাপ হয়।'

'ই কথা বললে তুমি ? তুমি বললে ? তুমি যে আমাকে আনন্দ দিলেরে ভাই।'

'আমি সেই ভোর বেলা উঠে ভাবছিলম কি করব, আমাকে ত কেউ আজ মুনিষ ডাকেনি। তাই ভাবলম যার হোক জমিএ যেয়ে লেগে পড়ব।' ওরা কাজ করতে করতে কথা বলে।

আস্তে আস্তে মাঠের শিশির শুকিয়ে আসে। ক্রমশ গায়ের চাদর গরম বোধ হয়, তখন ওরা সেটা খুলে ফেলে। এক সময় ওরা অল্প-সল্প ঘামতেও শুরু করে।

প্রহর দুই বেলা হলে, কৃষকরা খেতে বসে। প্রথমে দুএকজন শুরু করে, তারপর হাঁক-ডাক করে সবাইকে বসায়। এদিক-ওদিক করে সমস্ত মাঠটায় একই রকম দৃশ্য ফুটে ওঠে। 'জলখাবার' বেলা হয়ে গেছে। যাদের দূরে দূরে ঘর, তারা মুড়ি-পেঁয়াজ কলাই শুঁটি বেঁধেই এনেছিলো, পাশাপাশি গাঁ থেকে ঘরের ছেলেমেয়ে 'হাতলুড়কাত' (যারা ফাইফরমাস খাটে, কিন্তু বড় কাজ যাদের দিয়ে হয় না) জল-খাবার নিয়ে হাজির হয়।

গামছার খুঁটে কোঁচড় তৈরী করে মুড়ি খেতে শুরু করে। জাম্বাটিতে ভিজিয়ে নেয় কেউ। খেতে খেতে গল্প-সল্প চলে, যারা এখনো কাজ করছে, তাদেরকে ডাকে 'ও খুড়া আর কেনে, শরীলে একটুন জোর করে লাও কেনে, বেলাত কম হলনি—'

মাঠে ভাত কিংবা রাঁধা কোন জিনিস আনা বারণ, মা-লক্ষ্মী তাহলে বেরাগ হবে। তাই, যাদের বাড়ি সেদিন মুড়ি নেই, তারা একছুটে গিয়ে পান্তা ভাত খেয়ে আসে।

লখীন্দরের মুড়ি আনবে টুকী। কিন্তু কী জানি কেন সে দেরী করছে। পাশের জমির হারাণ লক্ষ্য করছিল সেটা, সে ওকে ডাকলে, 'লখীন্দদাদা, এস গো, আমাদের সংগে বসে যাও।'

'না ভাই না তমরা বস, এই টুকি এখন এল বলে—'

তাছাড়া লখীন্দরের কিন্তু এই নেমন্তন্নটা ভালোই লাগে। ওদের সংগে এক সাথে বসে খেতে তার খুবই ইচ্ছে যাচ্ছিলো। কতোদিন সে এমন করে খায়নি। কিন্তু সে তো একা নয়, রতনও আছে।

হারাণ কিন্তু ছাড়ে না, লখীন্দরের হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়। বলে, 'আচ্ছা, আচ্ছা, মা টুকি যখন আসবে' তখন লয় আমরাও ভাগ পাব। তমার দাদা রাজার ঘর, তমার ঘর ঠিঙে কত কী আসবে, গরীবের শুধু লঙ্কা মুড়ি, তা এস কেনে। রতন, তুমি এসগো—'

লখীন্দর কোঁচড় পেতে মুড়ি, খেঁসারির ডাল সেদ্দ, আর কাঁচা লংকা নেয়। 'দাও, দাও, লখীন্দদাদাকে দুটা পিঁয়াজ দাও গো—'

খেতে খেতে নানারকম কথাবার্তা হয়।

'লখীন্দদাদা, টুকি মায়ের বিয়া দাও এবারে—'

'তাই ভাবছি। হাতে তেমন থাকেত বলবে ভাই।'

হারাণ বলে, 'আমাদের মাকে দেখেছ? অ মা, বড মা, তমার লখীন্দ-দাদাকে পন্নাম কর মা—' লখীন্দর সম্পর্কে সবারই দাদা (দাদু), সবারই ঠাট্টার লোক।

একটু দূরে হারাণের বড বিধবা মেয়ে, আর নব পুত্রবধূ এদিকে পিঠ করে মুড়ি চিবোচ্ছিল। বউটির উল্লেখে সে লজ্জায় এত বড় ঘোমটা টানে। ঘটির জলে হাতটা ধুয়ে পায়ে পায়ে এসে লখীন্দরকে প্রণাম করে একটা।

'অ লাত বউ, মুখটা একটু দেখি গো। আমি তমার বর হই যে—'

মেয়েটি আরো লজ্জা পেয়ে ত্রস্ত হয়ে পালায়। হারাণের বড় মেয়ে বলে, 'হঁ, তুমি ঠিক বলেছ, লখীন্দরদাদা। কিন্তু তুমি যে বুড়া হইচ গো—'

লখীন্দর বলে, 'বুড়ো বলেই ত আদর বেশি ভাই, আর তুমি বললে কি হবে, লাত-বৌ-এর ঠিক আমাকে পছন্দ হইচে, দেখলে কেমন মান করে তিড়িং করে পালি' গেল—হুঁ।' 'তিড়িং' কথাটা এমন ভংগী করে লখীন্দর উচ্চারণ করলে, যে সবাই হেসে ফেলে। নতুন বউটি থামতে পারে না, ফিক্‌ফিক্ করে হেসে ও ননদের হাতটা ধরে। ননদ বলে, 'আ মল্ল, একবারে গেলি যে গো—'

লখীন্দর রতনকে বলে, 'তুমি একলা এখন একটু কাজ কর ভাই, আমি মাঠটা একটু ঘুরে দেখে লিই—'

রতন বুঝতে পারে না, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। লখীন্দর বলে, 'অনেকদিন এমনটি দেখিনি ভাই, আজ আমার পেরাণটা খুব শান্তি পেল—'

সব জমিতেই ধান কাটা হচ্ছে না। অনেক জমিতে ধানের আঁটি বাঁধা হচ্ছে। এই আঁটি, বইতেও শুরু করেছে কেউ কেউ। সেই ধান খামারে নিয়ে গিয়ে ফেলা হবে, তারপর গাদা দিতে হবে। যতদিন না ধান ঝেড়ে খামারে তোলা হয়, ততদিন খামারে রোজ ন্যাতা দিয়ে পরিষ্কার করা চাই, তুলসীতলার মতো রোজ সন্ধ্যা দেখাতে হবে। প্রণাম করতে হবে।

ধানের আঁটি বাঁধা দেখতে লখীন্দরের খুব ভালো লাগে। প্রথমে কয়েক গাছি ধান শুদ্ধ খড় দুহাত দিয়ে ধরতে হবে, যেন দুহাতের মুঠোর মাঝখানে কিছু ফাঁক থাকে। সেই ফাঁকের অংশটুকু দিয়ে চেপে ধরতে হবে আঁটির তাড়া, তারপর কৌশলে বেড় দিয়ে জমি থেকে তুলে নিতে হবে, প্রথমে ডানদিক্ থেকে বাঁদিকে তারপর সামনে,

ধানের আঁটিগুলিকে বেশ দোলা দিতে হয়। তবেই শক্ত করে বাঁধা হবে।
লখীন্দর কিছু বেশি দূর এগোয় না। ওযে কাজ ছেড়ে এসেছে, এবং আর সবাই কাজ করে চলেছে, তাতে ওকে পেছনে টানে। ও শুধু কয়েকজনের সংগে কথা বলে আসে।

'জান ভাই রতন, এই মা লক্ষ্মীর সেবা করতে পাই বলেই এখনো বেঁচে আছি। তা নালে কবে মরে যেতম।'

'ই কথা ঠিক বলেছ, লখীন্দদাদা, ইকথা ঠিক বলেছ।'

পাশে হারাণের জমিতে ধানের বোঝা বাঁধা হচ্ছে, রাম, রামে রাম দুই, রামে দুই তিন……।

একটা গরুর গাড়ি এসেছে, সেটাতে যা ধরে বোঝাই করা হল। কিন্তু সেটা চলে গেলেও কিছু বাকি থাকে। সেগুলো ওরা চারজনে মিলে মাথায় করে বয়ে নিয়ে যাবে।

বিকেলের শেষ হয়ে এসেছে। আবার শীত পেতে শুরু করে। লখীন্দর আজ আর কাজ করবে না, বাকিটা কাল করবে। তাছাড়া ওর এখনো অনেক বাকি, ধান 'এঁটোতে' হবে, বইতে হবে।

'রতন, তুমি এ-ক'দিন আমার একটু লেগে পেতে দাও। পরশু থেকে সে-মাঠে লাগব, তখন আরও কটা মুনিষ চাই—'

এই সময় একটা ব্যাপার ঘটে। হারাণের নতুন-বৌটি বোঝা মাথায় করে এগোচ্ছিল। বোঝাটা তার পক্ষে একটু বড়ই হয়েছিল বলতে হবে। ননদ হেসে হেসে কেবলই বলছিল, 'এই পড়ল, এই উলটি পড়ল গো—' উদ্দেশ্য, যাতে যার মাথায় বোঝা সে আরো সতর্ক হয়ে উঠ্‌বে, বোঝা বইবার ক্ষমতা বাড়বে। কিন্তু বেচারী বউটি একটা উঁচু আল ডিঙোতে গিয়ে পায়ে শাড়ী জড়িয়ে পড়ে যায়। সবাই ছুটে আসে। শ্বশুর, স্বামী, ননদ, আরো দুএকজন লোক। লখীন্দরও যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায়, কাছে এগিয়ে আসে।

'আহা, পড়ে গেল—'

ধান অনেকগুলি শিস্ থেকে ঝরে ঝরে পড়ে গেছে। বোঝাটাও একরকম খুলে ঢিলে হয়ে গেছে।

কেউ কোন কথা বলছিল না। হঠাৎ এমন সময় ননদটি হেসে ফেলে, 'দাদা দেখ দেখ, বউএর মুখটা দেখ।'

ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছল বউটি। এতগুলি ধান ঝরে পড়ে গেল, ওকে না জানি কী বলবে।

ওর মাথার কাপড় খুলে গেছল, এমনভাবে মুখটা ফাঁক করে ও দাঁড়িয়ে ছিল যে, হাসি চাপা দুষ্কর। ননদের সংগে সবাই যোগ দেয়, প্রথমে ওর স্বামী, তারপর লখীন্দর, তারপর হারাণ। লখীন্দর কিছুতেই হাসি চাপতে পারে না, ফ্যাক্ ফ্যাক্ করে কেবলই। ওর মুখ দিয়ে দাঁতের ফাঁক দিয়ে থুতু ছিট্‌কে ছিট্‌কে বেরোয়, ও কোমরে হাত দিয়ে ঠাঠা করে হাসে। অনেক কষ্টে অনেকক্ষণ পরে বলে, 'বাহা রে লাতবৌ, বাঃ—'

হারাণ কিন্তু তারপর খানিকটা ভয় পেয়ে গেল। বলে, 'লখীন্দদাদা, ধান ঝরে পড়ে গেল, ইটা অমংগল হলনি?' আবার সবাই গম্ভীর হয়ে ওঠে। লখীন্দর কিছু আশ্বাস দেয়, 'না ভাই, ই ত রাস্তায় পড়েনি যে অমংগল হবে। জমিএ পড়লে দোষ নাই। তা ছাড়া ই তমার নিজের জমি। এক কাজ কর, ই ধানগুলি তুমি তুলে লাও খুঁটে খুঁটে, ভাত রাঁদবেনি, লক্ষ্মীর পেসাদ করে পৌষপাব্বণ করবে।' যাক্। ওরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, আর মেয়ে দুটি তৎক্ষণাৎ কোচড়ে করে ধান খুঁটতে থাকে।

গ্রামের পথ দিয়ে মাথায় করে ধান নিয়ে নিয়ে আস্‌ছে কৃষকেরা, মজুরেরা। ঝম্‌ঝম্ করে অতি মৃদু শব্দ হচ্ছে, অতি মিষ্টি। ওদের চলবার কেমন একটা ছন্দ আছে, কী সুন্দর লাগে দেখতে। লখীন্দর

খুশি হয়। কত দিন কতো দিন ও এমনি শব্দ শুনে আসছে। সেই ছেলেবেলায় বাবার হাত ধরে যখন মাঠে যেত তখন থেকে। আশ্চর্য। ও চোখ বুজে একবার।

'ও আমার গাঁয়ের লক্ষ্মী মাগো—'

বৈরাগী গান গেয়ে ভিক্ষা সেরে বাড়ি আসছে। আশ্চর্য সুন্দর ওর গলা, গ্রামের লোকেরা ওকে ডেকে গান শুনবে, ভক্তি করবে। সব চেয়ে ওর চরিত্রের গুণ, লোকের সংগে কী ব্যবহার, কোন দোষ নাই। 'ও আমার গাঁয়ের লক্ষ্মী মাগো, তুমি আমার প্রণাম লও—'

বৈরাগী কাছে আসতে লখীন্দর দুহাত জড়ো করে নমস্কার করে।

একত্রিশ

'গোবিন্দ, ভাই, এই সময় কিছু একটা কর।'

বোঝা গেল লখীন্দর কথায় ঠাসা হয়ে এসেছে। অতি শান্তভাবে কথাও বলছে, কিন্তু সে যেন কানায় কানায় ভরা নদী। জলে টই-টই, কিন্তু হুড়াহুড়ি নেই।

'তাই করব।' গোবিন্দেরও কথা কিছু কম আছে বলে মনে হয় না।

ওরা পরস্পর পরস্পরকে পেয়ে আনন্দিত হয়েছে।

'কি করবে ভাই, বল আমাকে।'

'আমরা ছাব্বিশে জানুয়ারী পালন করব কৃষক-সভার পক্ষ থেকে। ছাব্বিশে জানুয়ারী কী জানো? তবে শোন—'

'তাই কর। তমার উবরে আমার খুব বিশ্বাস হইছে, ভাই। আমার মন বলছে, তুমি ছাড়া ই কাজ কেউ পারবেনি। কেউ পারবেনি।' আবার বললে, 'হ্যাঁ, কি করবে বলছিলে? কবে করবে?'

'ছাব্বিশে জানুয়ারী। সে এখনো একমাস দেরী আছে।'

'এ-ক-মা-স—! সে যে অনেক। অতদিন কী চাষারা অমনটি থাকবে—' বলে সে কি যেন চিন্তা করলে, তারপর বললে, 'আমি কি দেখলম জান। চাষা জমিতে পড়ে আছে। আনন্দ করে ধান কাটছে, এঁটাচ্ছে,···জান ভাই, ই হচ্ছে আনন্দের কথা। চাষার বউ এবৃরে কাপড় চাইবে, চুড়ি চাইবে।'

নিজের মনেই মাথা নাড়ল লখীন্দর। মিলিয়ে নিল কিছু যেন।

'না, তাকে অন্ত জায়গায় পাঠানো হয়েছে। লড়াই করবার কায়দা-কানুন শিখতে গেছে সে। আমরা আর দাঁড়িয়ে মার খাব না, আমাদের মার দিলে আমরাও দেব।'

'হ্যাঁ? কিন্তু সুধীরের হাতে ঐ ভার দিলে কেন। সে যে পাগলা, তার মাথা ভীষণ গরম। মারামারি খুব খারাপ জিনিস, গোবিন্দ—' খবরটাকে লখীন্দর এত সহজে নেবে গোবিন্দ ধারণা করতে পারেনি। ওর ধারণা ছিল মারামারির কথা উঠলে লখীন্দর ঘাবড়ে যাবে। কিন্তু একটু পরে আরো খানিকটে ভেবে ও বললে, 'কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথা বলেছিল: আমি আগেই সব মেরে রেখেছি, তুমি শুধু উপলক্ষ। তবে, সুধীর বড় ছেলেমানুষ। ই কাজে খুব মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। দেখ, তমার হাতে একটা লাঠি আছে, তা সেই লাঠি দিয়ে তুমি সাপও মারতে পার' নিজের মাথাও ভাঙতে পার। তা সেই রকম মাথা চাই—'

গোবিন্দ ওকে সান্ত্বনা দেয়। 'তোমারই ছেলেতো। সব ঠিক হয়ে যাবে। তাছাড়া, মানুষ শিক্ষার গুণে সব কিছু করতে পারে।'

কথাবার্তা শেষ হবার পর গোবিন্দ বললে, 'চল তোমাকে বনটা একটু পার করে দিয়ে আসি।'

'না, না। আমি যেতে পারব ঠিক। তমার আবার রান্না-বান্না আছে।'

'ও কিছু না। আমি এই চাল চড়িয়ে দিলাম, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে ফিরে আস্‌তে আস্‌তে ফুটে উঠবে।' গোবিন্দ হাঁড়িতে চাল চড়াতে থাকে।

লখীন্দর এতক্ষণ কথাবার্তায় মগ্ন ছিল বলে খেয়াল করে নি। এতক্ষণে ঘরটা চোখে পড়ল। ডোমের তৈরী চাঁচ দিয়ে দেয়াল তোলা। তার ওপর মাটির প্রলেপ পড়েছে। তালপাতা আর খড় মিশিয়ে চাল ছাওয়া।

মেঝের ওপর দুটো ত্যালাই বিছানো। দুটো কম্বল, একটা দড়িতে কয়েকটা জামা সার্ট ঝুলছে। 'গোবিন্দ-ভাই, এ্যাবারে সংসার করে ফেলেছ।'

'তাই। মহাভারত পড়েছ লখীন্দদাদা? এ হচ্ছে আমাদের বনবাস। জনপাঁচেকই থাকি আমরা। তার মধ্যে বেঁধে মরি আমি আর সতীশ। বাকিরা জালন কাটে, জল আনে।'

'সবই আছে ভাই, একটি দ্রৌপদী থাকলে হত।'

হঠাৎ যেন পায়ের অতি নরম জায়গায় কাঁটা ফোটে। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নেয় গোবিন্দ।

'কে, পাঞ্চালী? হবে, হবে। একদিন হবে।'

'মহাভারতের কথা যদি বললে ভাই ত আমি একটা কথা বলি। ধম্মরাজ যুধিষ্ঠির অর্জুনকে পাঠি ছিল অস্ত্র শিক্ষা করতে। ত তুমিও সুধীরকে পাঠিছ।'

'এ তুমি ঠিক বলেছ। পাণ্ডব কৌরবের সংগে একদিন শক্তিপরীক্ষা তো হবেই।'

কুটির থেকে বেরোতেই ঘুটঘুটি অন্ধকার। এতক্ষণ পিদিমের আলোতে ছিল, তাই কিছুই দেখা যায় না।

এদিক ওদিক দিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটবার পর গোবিন্দ বললে, 'লখীন্দদাদা, একলা ত চলে যাবে বলেছিলে। যাও দেখি।'

লখীন্দরের ইতিমধ্যেই ধাঁধা লেগেছিল। বললে, 'হার মানলম ভাই। এই পাশের গাঁয়েই থাকি বটে, ত ই আমি নিশান পেলমনি।'

কোন কোন গাছ লম্বা, কোন কোন গাছ ঝাঁকড়া হয়ে জড়াজড়ি করে রয়েছে। কোনটাকেই চেনা যায় না।

'লখীন্দদাদা, এই যে এত ঝোপ দেখছ, যদি কেউ তমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে ওখান থেকে?

'না, আমার ঘাড়ে পড়বেনি কেউ।'

'পড়বে, পড়বে। যদি কোন দিন আমাদের পিছু ধাওয়া কর, তাহলে দেখবে, ওই ঝোপগুলোই ভূত হয়ে ঘাড়ে পড়বে। বন্দুকই আন, আর কামানই আন, এখানে হল ভূতের রাজত্বি।'

ওরা দুজনেই হাসল।

বত্রিশ

২৬শে জানুয়ারী অতি প্রত্যুষে উঠেই কৃষকেরা অবাক হয়ে গেল। ছেলেরা, ব্যাপারটার সমস্তটা বুঝল না, তবু আনন্দে লাফিয়ে, হাততালি দিয়ে ছোটাছুটি করতে লাগল ওরা।

প্রথম মল্লিকা দেখলে, একটা লাল পতাকা তাদের উঠোনের পাশে শিরিষ গাছটায় উড়ছে। ও ছুটে গিয়ে মাকে বললে। ওর মা দেখে ছুটে গিয়ে জাগালে কৃষকটিকে। 'ওগো, দেখবে এস, দেখবে এস, আমাদের শিরিষ গাছে, বলি, উঠ না গো—'

কৃষকটি উঠে এসে দেখলে। ঘুম তখনো তার ছাড়েনি, পুবদিকে লালবর্ণ হতে শুরু করেছে। বোধহয় ওর মুখে একটু হাসি ফুটে উঠেছিলো, ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু তারপরে ও গম্ভীর হয়ে গেল। কী করতে হবে বুঝতে পারল না।

মল্লিকা ইতিমধ্যে আর একটা পতাকা আবিষ্কার করেছে। 'ঐ যে গো, ঐ অশথ গাছটায়, একটা নয় মা, তিনটে,। হি-হি।'

পাশের বাড়ির গয়লাদের খোঁড়া ছেলে মুকুন্দ ডাকছে, 'মল্লিকা, ও মল্লিকা, দেখ, দেখ আশ্বত গাছে, পতাকা দেখ।'

'ওমা, আমাকে দেখায় দেখ। আমি আগে দেখলমনি ?'

'ও আমার আহ্লাদী মেয়ে, আমি সেই কখন ঠিঙে দেখছি।'

ছেলে মেয়েরা রাস্তায় নামল। এখান থেকে ওখানে। সব পতাকা-গুলো দেখবে ওরা।

'ঐ রে, ঐ একটা। চল দেখি।'

গ্রাম ছেড়ে অন্যগ্রামে ওরা গেল। সেখানেও ঐ ব্যাপার। কিন্তু ওরা আর কতদূর যাবে? যদি হারিয়ে যায়?
সেই খোঁড়া মুকুন্দ ফড়িঙের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে এগোচ্ছিল, সে বললে, 'জানু মল্লিকা, সমস্ত পিথিমিতে পতাকা উড়ছে, বুঝলি। কত আর দেখব। চল ঘুরে যাই।'

পতাকা হাতে নিয়ে কৃষকেরা বেরোল একটু পরে। পাড়ার থেকে চার পাঁচজন মাত্র, রমানাথ, কালু, কানাই আর অনিরুদ্ধ, আর সেই মুকুন্দ। মুকুন্দ মল্লিকাকে ডেকেছিলো, কিন্তু মল্লিকা যায়নি বলেছে, 'আমি যে খুব ছোট। তোর মত বড় হলে যেতম। ওখেনে কি হয় এসে আমাকে বলবি।'
বাগ্‌দি পাড়ার তিনজন বেরোল। অবিশ্যি পাড়াটা খুব ছোট। 'ওগো দক্ষ-পিসী যাবে নাকি গো।'
'হ্যাঁ, বাবা, তরা সব কি করু দেখব।' 'এস বাবু এস।' এ পাড়া-ওপাড়া করে সমস্ত গ্রামটাতে জন চল্লিশেক লোক বেরোল। ছোট্ট গ্রাম, ওই যথেষ্ট।
'বল ভাই বল—স্বাধীনতা দিবস—'
জিন্দাবাদ।'

অতি শান্ত নির্জীব মাঠগুলিতে এই আওয়াজ স্বাভাবিক নয়। কতদিন ধরে পড়ে আছে ওগুলি। একটি গ্রাম্য মেয়ের মতো অতি শান্ত, কোন রকমে দিনগুলো নিশ্চুপ হয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। আজ তাকে ঘা-মারা হচ্ছে যেন।
চারিদিক থেকে লোক আসছে দেখতে। মাঠের এদিকে-ওদিকে ছুটে ছুটে আসছে ওরা।

'কতদূর যাবে গো—'
'ঝাঁক্‌রা।'

সবার আগে পৌঁছল বালা-কিল্লাগড়ের দল। ওদের দলটাই বড় সব চেয়ে, ওরা অনেকদূর দিয়ে ঘুরেও এসেছে। তারপর শাওড়া-শ্যামগঞ্জ। ধানগাছিয়া। শীরষে-কেঁচকাপুর। ওহে শোন, শোন, আমনপুর থেকে লোক এসেছে, দেখনি ?
'নমস্কার।' পন্নাম নিও ভাই।'
'আর ইদিকে দেখ। কেশপুর ঠিঙে এসেছে।' এদের দল আসেনি, কয়েকজন এসেছে মাত্র।
'এ্যা ? তাই বুঝি ? কত আনন্দ পেলম। তমাদের মত কিছু কত্তে পারিনি আমরা। তমরা আমাদের গুরু, উ কথা বলতে গেলে।'
'উঁটি বলবে নি, ভাই। একদিনে কি সব হয়। গত বছর তুমরা যা করেছ. কেউ কখনো ভুলবেনি।'

শহর ঠিক বলা যায় না, একটা বড় গঞ্জের মতো জায়গাটা। ঝাঁকরা তবে কাজ-কর্ম আমদানী-রপ্তানীর জায়গা। ধানের ব্যবসাই বেশি। এখান থেকে সমস্ত অঞ্চলটার ধান রপ্তানি হয়। দু'সারি দোকান-পাট আছে। মাটির কাঁচের দেওয়াল টিনের ছাওয়া, অনেক খড়ের ছাওয়াও আছে। কাপড়-চোপড় মনোহারী দোকান। মাল আসে প্রধানত ঘাটাল, নয়তো খড়গপুর থেকে। ক'লকাতা থেকেও আসে, তবে খুব কম।
সেইখানে এসে দলগুলো বসে পড়ল। একটা মোড়ের মতো রয়েছে।

একটা কৃষকের জ্বর হয়ে গিয়েছিলো। খুঁজে খুঁজে তার ভাইপোকে বের করা হল। 'লাও বাবু, তমার খুড়াকে দেখ একটু।'

'লাও ঠেলা। আমি এখন ওই ঝামেলা লিয়েই থাকি। কত করে, বললম, খুড়া, তমার কাল জ্বর হইছিল, আজ বেরাও নি। তা শুনা হল নি।'

অন্যত্র একটি কৃষক বললে, 'বলি ও নকুলের মা, তুমি কথা চললে ?'

'নোকলা মাঠে যাবে বলেছে, একটু ঘুরি' লিএসি।,

'তাড়াতাড়ি এস বাবু, কাছে-পিছে থেক। সব সময় দেখতে পারবনি—'

বাধু দলুই মুড়ি এনেছিলো বেঁধে। সংগে পেঁয়াজ কড়াইশুটি ছিলো। ও খুলে বললে, 'মামা, খাই এস।'

'এই দেখ, যদি খাবি ত, শুনবি কি।'

'তা তুমি যাই বল, খিদায় পেট গেল। খেতে খেতে শুনি বাবু।'

সতীশ বলতে উঠেছিল।

'আমরা এই পবিত্র দিনে ঘোষণা করছি, আমাদের ভালো-মন্দ ইষ্ট-অনিষ্ট আমরা বুঝব। আমাদের নিজেদের কথা বলবার অধিকার আমাদের সবারই আছে। যারা আমাদের মুখের ভাত কেড়ে নেয়, আমাদের জীবন দুঃখপূর্ণ করে তোলে, তারা আমাদের দুশমন, তাদের আমরা ক্ষমা করব না।'

তারপর উঠল লখীন্দর! একটা ছোট্ট ঢিপির মতো ছিল জায়গাটা, সেইখানে উঠে দাঁড়াল ও। দূরের লোকগুলো চিৎকার করে ওঠে, 'শুনতে পাচ্ছি নি, শুনতে পাচ্ছি নি—'

লখীন্দর ডান হাতটা নাড়লে, কি বললে বুঝতে পারা গেল না।

'আমরা শুনতে পাচ্ছিনি গো—' বলে ওরা নিজেরাই ঘন হয়ে এল।
লখীন্দর মহা বিব্রত হয়ে পড়লে। কপালের ঘাম মুছলে একবার, ডান কাঁধের গামছাটা বাঁ কাঁধে ফেললে। লাঠিটা হাতে তুলল একবার, তারপরে মাটির ওপর রেখে ভর দিয়ে দাঁড়াল।
'হ্যাঁ, প্রবীণ লোক বটে! বাপ-ঠাকুদ্দাকে অমন দেখতম বটে, কিন্তু এখন অমন লোক দেখিনি' দুটি কৃষকের চোখ লখীন্দরের দিকে, কিন্তু ঘাড় দুটি ওদের কাছাকাছি হয়ে আসে।
'হ্যাঁ, ভাই। অত বয়স হইছে, তবু দেহটা দেখেছ একবার। পুণ্যের জোর আছে ভাই। আমরা ই-কালের পাপে-তাপে ভুগছি, অমন হবে কি করে। ই একটা কিসেন বটে।'
ওদিকে গোবিন্দ ওকে উৎসাহিত করছে, 'বল, লখীন্দদাদা, বল।'
সহসা অতি জোরে শুরু করল লখীন্দর। প্রায় চিৎকার করে। প্রথমটা অতি বিকট শোনায়, তারপর ঠিক হয়ে আসে।
তৃতীয়বার একই কথা বলল ও: 'আপনারা পঞ্চজন এখেনে আছেন, আপনারা নারায়ণ।' হ্যাঁ, একথা বলতে হয়। কৃষকেরা সব মজলিসে ওই কথা বলে। যেখানে পাঁচজন, সেখানে নারায়ণ। 'আমি ই সবের কিছু জানিনি। অত্যন্ত অধম লোক আমি। আমার ভুল আপনারা নিজগুণে ভাল করে লিবেন।'
'বাহবা, বাঃ। ইকথা ভাল বলেছ লখীন্দর। ভাল বলেছ।'
'সতীশ ভাই বলল, আমাদের সব জিনিস আমরা দেখব। ই অতি উত্তম কথা। আমাদের ধান আমরা দেখব বই কি। আমাদের জমি আমরা দেখব বই কি। আমাদের মান-ইজ্জত ভাল-মন্দ সব আমাদিকে দেখতে হবে। কিন্তু ভাই, আমার ক্ষুদ্দ বুদ্ধিতে এই লেয়, যে অতে অহংকার করলে চলবেনি। লোভ করলে চলবেনি। সবই আমরা করলম, তবু, আমরা করলম এই কথা বললে চলবেনি। ভাত

খাবার সময় কি করতে হয় মনে কর, ভাই, চারটি ভাত পাতের নিচে দিতে হয়, আর একটু জল। কি, না, মা ভূমাতা, তমার ঠিঙে আমি চাষ করে ফসল লিই নি, তুমি আমাকে পেসাদ দিচ্ছ। সেই পেসাদ আমি খাচ্ছি।'

'লখীন্দর, এ তুমি কি বলছ ভাই। আর। তারপর? আবার বল।'

'ইটি পবিত্ত দিন, ইটি আনন্দের দিন। ত আমার ঐ এক কথা, আনন্দ। ভগমানের আনন্দের লীলাখেলায় এই পিথিমী, ভাই। ত আনন্দ রাখবে মনে। আনন্দ যদি মনে না থাকে, থালে তুমিই নরক হবে, আর আনন্দ যদি রাখতে পার তাহলে তুমিই স্বগ্‌গে যাবে।'

নিজের মনে তারপর ও কী মিলিয়ে নিলে। বললে, 'আর ভালবাসা রাখবে, ভাই। মানুষকে ভালবাসবে, পুত্ত-কন্যাকে ভালবাসবে। এই আমাদের দেহেই ভগমান আছেন। পুত্ত-কন্যা-স্তী ভগবান দিয়েছে কেনে? না তমাকে পরীক্ষা করতে। তুমি যদি তাদিগে ঘেন্না কর, দুরছিঃ কর থালে ভগমান তমার উব্‌রে বেরাগ হবে। আর একটা কথা, এই সংসার, তমার পরিবার অতি পবিত্ত, এখেনে পাপ করতে নাই, পাপ করবেনি এখেনে—' বলে ও মাথা নিচু করে হাত জোড় করে সবাইকে নমস্কার করল, তারপর নেমে গেল।

নকুলের মা কাঁদছিল। ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমা খেল একটা। ভালবেসে ওকে এখন ভরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

রাধু দোলুই মামার হাতটা সজোরে চেপে রেখেছিলো। তার কোঁচড়ের মুড়ি কখন মাটিতে পড়ে গেছে।

আর বলবেনি লখীন্দ? আর বলবেনি? বল, তুমি আবার বল।'

'চুপ কর, চুপ কর।'

গোবিন্দ বলতে উঠেছে। ও লখীন্দরের কথার স্বের ধরে বললে, 'আর, পাপ যেমন আমরা করব না, পাপকে সহ্যও করব না তেমনি। লখীন্দদাদা

আনন্দের কথা বলেছেন, সেই আনন্দের শত্রু হচ্ছে পাপ। পাপকে যদি প্রশ্রয় দিই, তাহলে আনন্দ নষ্ট হবে। অতএব ধ্বংস করব আমরা।'

কি, কি বললে। একটু পরিষ্কার করে বল। আমরা মুখ্যু মানুষ, সব বুঝতে পারবনি।

'অর্থাৎ আনন্দ যদি পেতে হয়, তাহলে পাপের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। এ লড়াই আমাদের পূর্বপুরুষরা করে গেছেন, আমরা করছি, আমাদের পরে যারা আসবে তাদেরও করতে হবে। এই লড়াইয়ের শেষ নাই কোন দিন। যারা করবে না, তারা এর ধারে কাছে ঘেঁসতে পারবে না কখনো!

কৃষকেরা একটু গম্ভীর হয়ে ওঠে। কারো মুখ একটু বা ফাঁক হয়ে যায়।

'অবিশ্যি, এরও পরিবর্তন আছে। আজ আমাদের কাছে যা আনন্দ, কাল সেটা নাও থাকতে পারে। আজ যেটা পাপ, পরশু দিন সেটা থাকবে না। কিন্তু আর একটা এসে যাবে।'

হাঁা, একথা বোঝা যায়। এই রকমই দেখা যায় বটে।

'একেই আমরা বলি আনন্দ। আমরা বলি স্বাধীনতা।'

তেত্রিশ

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বাতাসটায় কেমন কুয়াশা-কুয়াশা মনে হয়। জংগলটার প্রান্তে একটা কুঁড়ে ঘরের ধারে হরিদাস বৈরাগী গান গাচ্ছে একতারা বাজিয়ে।

'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না, পথের শুক্‌নো ধুলি যত।'

'আশ্চর্য তো—' এ গান তো বৈরাগীরা গায় না। গোবিন্দ অতি আগ্রহে থেমে পড়ল। একটু পরে না হয় বনটাতে ঢোকা যাবে। আস্তে আস্তে কাছে এসে ও গলা মেলাল বৈরাগীর সংগে। বৈরাগী একটু হেসে স্বীকার করল ওকে।

লখীন্দর অবাক হয়। গোবিন্দও গাইতে জানে তাহলে। 'কে জানিত আসবে তুমি গো, অনাহূতের মত।'

আশ্চর্য। লখীন্দরের জীবনে এটাতো হঠাৎই এসেছে। একটি অতি নিবিড় আনন্দে ও পুলকিত হয়ে ওঠে।

একটু পরে বৈরাগী থামল। 'এই পর্যন্ত জানি ভাই, আর শিখতে পারিনি—'

'বল কী। এ গানের সবটা জান না, শিখে নাও, শিখে নাও।'

তোমার পথে তো ছায়া তরু নেই, মরুভূমি অতিক্রম করে তুমি এসেছ। তোমাকে পথের কষ্ট দিলাম, আমার মতো ভাগ্য হত কে আছে।

গান শেষ হল। লখীন্দর বললে, 'খুব ভাল গান ভাই।'

'কার গান জান? রবীন্দ্রনাথের গান।'

'হ্যাঁ? ঈশ্বর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। হ্যাঁ, তার পদ্য অধীরের বইয়ে দেখেছি আমি। কিন্তু তুমি থালে গান জান?'

'জানি না, জানতাম এককালে। ভালোই জানতাম।'

বলে ও একটু হাসল, তারপর নিজেই বললে, 'সে এক মজার ব্যাপার। আমার এক গানের ছাত্রী ছিলো, বয়েসে আমারই মতো কি দু'এক বছরের বড়ো হবে। ওর বিয়ে হবার পর ও একদিন নেমন্তন্ন করলে আমাকে। বিকেলে গান শোনালে: আজি বিজন ঘরে নিশীথ রাতে, আসবে যদি শূন্য হাতে...। ভক্ত তার প্রিয়তমের কাছে আপনাকে নিঃশেষে সমর্পণ করছেন। একেবারে নিজেকে ভুলে, নইলে তার থেকে পাবার ইচ্ছে হবে যে। তাঁর শূন্য হাত দেখে তাই ভক্তের কোন খেদ নেই।

এই সময় ওর স্বামী ঘরে ঢুকলেন। কোন ব্যাংকের যেন বড় অফিসার। অনেক টাকা মাইনে পান। তিনি মুখের চুরুটটা হাতে নিয়ে স্ত্রীর সামনে ধরে বললেন, কই, শূন্য হাতে তো আসিনি এইতো চুরুট নিয়ে এসেছি।

'সে মেয়ে কেঁদেছিলো তারপর আমার কাছে: গোবিন্দদাদা, আমি একতিল তিষ্ঠোতে পারিনে। না, না, সেকথা বলিনে আমি। শুধু গান গাইনে আমি। তুমি এসেছিলে বলেই গেয়েছিলাম।

'আমার প্রাণে লেগেছিলো বড় বেশি। সেই থেকে আর গাইতাম না। তাছাড়া জড়িয়ে পড়েছি কত কাজে। এখন কি আর সে মন আছে।'

ওরা সবাই চুপ করে থাকে। তারপর গোবিন্দ বলে, 'কিন্তু হরি ভাই, তুমি এগান শিখলে কোথা থেকে, বৈরাগীরা তো এগান গায় না।'

'শারদের বাবুদের রেডিওতে এই গানটা হচ্ছিল একদিন, তো ঐ শুনাইন

আমার মনে ছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিখেছিলম, বাকীটা শিখতে পারিনি।

'কোথা থেকে শিখেছ বললে—'

'শীরষের বাবুদের রেডিঅতে দূর ঠিঙে শুনেছিলম।'

'হ্যাঁ, সব ভাল জিনিসগুলো ওদেরই।'

লখীন্দর ওকে এগিয়ে দিতে এসেছিল। সে খানিকটা এসে বলে, 'ওই মেয়েটার কি গান বলছিলে ভাই, ভগমানের কাছে নিজেকে ভুলে সব দিতে হয়। হ্যাঁ, ভাই, এর চেয়ে বড় কথা আর নাই। এখন আমার মনে হয় আমার সব কিছু দিয়ে দি'।

গোবিন্দ ফিরে দাঁড়িয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। 'তোমার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ, লখীন্দদাদা। কিন্তু তোমার হৃদয় অত্যন্ত বড়।'...

বাড়ি ফিরে হাত-পা ধুয়ে উঠোনে কাঠের চৌকীর ওপর বসল লখীন্দর বেশ শীত আছে বলে ভালো করে চাদর মুড়ি দিয়ে নিয়েছে সে। কিন্তু আজকের শীতটা তার ভালোই লাগে। কপালের ওপর ঠাণ্ডা বাতাসটা লেগে তার একটা আশ্চর্য সুন্দর অনুভূতি হয়। ও ঠিক বুঝতে পারে না। শুধু চুপ করে বসে থাকে।

রাত্রিটা অন্ধকার। একটু সামনের গাছপালাগুলোও ভালো করে দেখা যায় না। ঐ অন্ধকারের দিকে [illegible] তাকিয়ে থাকলে মনে হয়, যেন আকাশ থেকে অন্ধকার [illegible] ঝুরে [illegible]ড়ছে। অতি ধীরে ধীরে নেমে মাটিকে আলতো ভাবে ছুঁয়ে চুপ করে থাকে যেন। বাঁ হাত বুলিয়ে দেয় আস্তে আস্তে।

আকাশটা অত্যন্ত পরিষ্কার। তারাগুলি ঝক্‌ঝক্ ঝক্‌মক্ করছে। সারা আকাশময় কে যেন পিদিম জেলে জেলে সন্ধ্যা দিয়েছে। সেগুলি সস্নেহে তাকিয়ে আছে মাটির দিকে।

এক সময় লখীন্দর উঠে ভেতরে যাবে বলে উঠেছে, এমন সময় আস্তে আস্তে গোবিন্দ এসে হাজির। 'লখীন্দদাদা।'

লখীন্দর প্রথমটা অবাক হয়, তারপর শংকিত হয়ে ওঠে। কোন কিছু খারাপ খবর এনেছে ভেবে ও উদ্বিগ্ন হয়। গোবিন্দ কিন্তু ওকে আশ্বস্ত করে। না, সে-রকম কিছু নয়।'

'তোমার সংগে এর পরে আর দেখা হবে না বোধ হয়, তাই একটু কথা বলতে এলাম। তুমি অন্তরীণ-আদেশ ভংগ করেছ, তোমাকে ওরা নিয়েই যাবে।'

লখীন্দর চুপ করে থাকে।

'আমি কী বলছিলাম জানো, তুমি বাইরে থাকলেই ভালো করতে। কাজ-কর্ম ভালো হত তাহলে।'

লখীন্দর প্রতিবাদ করে, 'না ভাই না। উকথা বলবে নি। আমি অতি নগণ্য জীব। আমার মত সবাই, কত লোক আছে। উটি তুমি বলবে নি।'

আবার ওরা চুপ করে থাকে। ইতিমধ্যে একটা ত্যালাই পেতে ওরা দুজনে বসেছিল।

অনেকক্ষণ পরে গোবিন্দ বললে, 'ওরা তোমাকে কষ্ট দেবে খুব। জেলে আজকাল অত্যাচারের চরম হচ্ছে।'

লখীন্দর সামনে মাঠের দিকে তাকিয়ে ছিল। অন্ধকার তেমনি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে মাটিকে। ওর চোখ-মুখকে। আচ্ছা, অন্ধকারের কী শব্দ আছে? বোধহয় একটি অতি মৃদু শব্দ, যেন অনুভব করা যায়।

লখীন্দর বললে, 'একথা কেনে বলছ ভাই। আমার কী মিত্যু ভয় আর আছে। মিত্যু যাহা শাস্তি, মাহা পরিণাম।'

আবার ওরা কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে। তারপর গোবিন্দ বলে, 'তোমার কাছে কেন এসেছিলাম জানো লখীন্দদাদা, তোমার সাহচর্যে এসে আমি

শক্তি পেয়েছি, সেকথা স্বীকার করবার জন্তে। তোমার চরিত্র অতি সুন্দর. আরো কি জানো, সুন্দর হলেই শক্তি। আমাদের শক্তি যে অপরাজেয় তা আগে বুদ্ধি দিয়ে জেনে ছিলুম, আজ হৃদয় দিয়ে অনুভব করছি।'

'লখীন্দদাদা, আজ হরিদাস বাউল কী বললে মনে আছে? সে তার গানটা শিখেছে সিংমশায়দের রেডিও থেকে। জানো, এ সমস্ত আমাদের। ওরা তো অনুভব করতে জানে না, এ-গান তো তুমিই ভালো করে বুঝেছ লখীন্দদাদা। তোমার সমস্ত জীবনটাই তো তাই।'

'পৃথিবীর প্রথম থেকে মানুষের কত সম্পদ জমা হয়ে আছে জানো লখীন্দদাদা, সে সব আমাদের। এই শক্তিকে ঠেকাবে কে। আমরা আজ ধন্য হয়ে গেলাম।' ধীরে ধীরে কথাগুলি বলল গোবিন্দ। তারপর এক সময় কথা বন্ধ করে চুপ করে রইল।

লখীন্দর ওর হাতটা ধরে ডান হাত দিয়ে: 'তমাদের মতন ছেলে দেখে মরতেও আনন্দ আছে ভাই।'

ওরা খুব কম কথা বলল। সারা রাতটাই পাশাপাশি বসে রইল দুজনে। মাঝে মাঝে গোবিন্দের নিরাপত্তার কথা স্মরণ করিয়ে চলে যেতে বলেছিলো লখীন্দর। কিন্তু গোবিন্দ অস্বীকার করেছে, 'না, আমাকে ধরতে পারবে না।'

কিন্তু এক সময় উঠতে হয়। সকাল হয়ে আসছে।

যাবার সময় গোবিন্দ লখীন্দরকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলে। তারপরে চলে গেল।

ভোর হয়ে আসছে। শুকতারা দপ দপ করছে পুবদিকে।

লখীন্দর সেদিকে তাকিয়ে ঠায় বসে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল। ওর সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। আঃ, এত আনন্দও আছে পৃথিবীতে।...

সেদিন নয়, তার পরের দিন সকালে নিয়ে গেল ওকে।